সেবা
প্রকাশনী
Banglapdf.net
তিন গোয়েন্দা
রকিব হাসান
ভলিউম
১৪

ভলিউম ১৪

তিন গোয়েন্দা

৫২, ৫৩, ৫৪

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
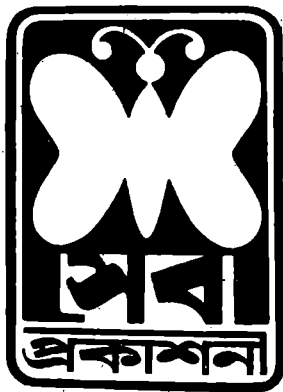
বিয়াল্লিশ টাকা

ISBN 984-16-1267-4

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আসাদুজ্জামান

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume-14
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

পায়ের ছাপ

প্রথম প্রকাশঃ নভেম্বর, ১৯৯১

কোস্ট হাইওয়ে ধরে আসছে ট্রাকটা, শুনতে পেলো কিশোর। কুপারের ট্রাক, কোনো সন্দেহ নেই।

ইয়ার্ডের খোয়া বিছানো পথে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলো সে, 'এদিকেই আসছে।'

ফুলগাছ লাগিয়েছেন মেরিচাচী। পানি দিতে দিতে থমকে গেলেন। পথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেন?'

ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর। কুপারের ট্রাকটাই আসছে। দেখা যাচ্ছে এখন।

'আসতে পারবে না,' মেরিচাচী বললেন। 'তার আগেই এঞ্জিন বিগড়ে যাবে।'

হেসে ফেললো কিশোর। কুপার তার চাচীর জন্যে একটা জীবন্ত অস্বস্তি। প্রত্যেক শনিবার সকালে পুরনো ঝরঝরে ট্রাকটা নিয়ে শহরে আসে লোকটা, বাজার করার জন্যে। ইয়ার্ডের পাশের রাস্তা দিয়ে চলে যায় রকি বীচ সুপারমার্কেটের দিকে। বিকট শব্দ করে এঞ্জিন, কাশতে থাকে ক্ষয়-রোগীর মতো, সেই সাথে বিচিত্র ফটফট শব্দ বেরোয় সাইলেন্সার দিয়ে। নড়বড়ে শরীর নিয়ে চলার সময় একনাগাড়ে গোঙাতে থাকে বেতো রোগীর মতো। মেরিচাচীর আশঙ্কা, কিছুতেই মার্কেটে পৌছতে পারবে না ওই গাড়ি, তার আগেই বিগড়ে যাবে। কিন্তু প্রতিটি বারেই তাঁর আশঙ্কাকে ভুল প্রমাণিত করে ট্রাকটা।

এই শনিবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না। বনেটের ফাঁক দিয়ে এমন ভাবে ধোঁয়া বেরোচ্ছে ট্রাকটার যেন আগুন লেগে গেছে। তবে ইয়ার্ডের পাশ দিয়ে চলে গেল না আজ, ঢুকলো এসে ভেতরে। ব্রেক কষে থামলো। লাফ দিয়ে নামলো কুপার। হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বললো, 'কিশোর, কেমন আছো, মাই বয়? এই যে মিসেস পাশা, খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু আজকে আপনাকে। জুনের সকালটার মতোই সুন্দর।'

এতো প্রশংসার পরেও হাসি ফুটলো না মেরিচাচীর মুখে। লোকটাকে পছন্দ করবেন কিনা ঠিক করতে পারছেন না। এটা নতুন সমস্যা নয় তাঁর জন্যে। কুপারকে দেখলেই অমন হয়। একটা কথা ঠিক, ওয়েস্ট কোস্টের সব চেয়ে দক্ষ কুমোর এই হেনরি কুপার। অনেক দূর থেকে তার জিনিস কিনতে আসে লোকে। চীনামাটি দিয়ে চমৎকার সব পাত্র, জার আর ফুলের ভাস বানায় লোকটা। চেয়ে

থাকার মতো। ভালো জিনিস যে বানায় একথা স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা নেই মেরিচাচীর, মেনে নিতে পারেন না শুধু লোকটার পোশাকআশাক। যে কোনো লোকেরই, অন্তত কুপারের মতো লোকদের প্যান্ট পরা উচিত, তাঁর ধারণা। অথচ লোকটা কি পরে? ঢোলা এক আলখেল্লা। দেখলেই মেজাজ খিঁচড়ে যায় চাচীর। লোকটার ঘাড়ে নেমে আসা লম্বা শাদা চুল, আঁচড়ে রাখা শাদা দাড়িও তাঁর অপছন্দ। আর গলায় চামড়ার ফিতে দিয়ে ঝোলানো বড় মেডেলটা রীতিমতো বিরক্তিকর। জিনিসটা চীনামাটির তৈরি। তা হোক, তাতে কোনো আপত্তি নেই তাঁর। আপত্তি হলো ডিজাইনটা নিয়ে। লাল রঙের একটা ঈগল। তা-ও যদি একটা মাথা হতো, নাহয় মেনে নেয়া যেতো। কে কবে শুনেছে এক ঈগলের দুটো মাথা থাকে?

লোকটার পায়ের দিকে তাকিয়ে নাকমুখ কুঁচকে গেল মেরিচাচীর। সেই একই অবস্থা। আবারও খালি পায়ে চলে এসেছে কুপার।

'পেরেক ফুটবে,' গম্ভীর কণ্ঠে হুঁশিয়ার করলেন তিনি।

হাসলো কুপার। 'কখনো আমার পায়ে পেরেক ফোটে না, মিসেস পাশা, আপনি জানেন। যাকগে, একটা দরকারে এসেছি আপনাদের কাছে। আমার...' হঠাৎ থেমে গেল সে। ইয়ার্ডের অফিসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'ওটা কি?'

'কেন, দেখেননি আগে? কয়েক মাস হয়ে গেল লাগিয়েছি।' অফিসে ঢুকে দেয়ালে ঝোলানো ফ্রেমে বাঁধানো একটা ছবি নামিয়ে আনলেন মেরিচাচী, কুপারের অনুরোধে। তার হাতে দিলেন। উজ্জ্বল রঙের কয়েকটা ফটোগ্রাফ, নিচে ক্যাপশন। বোঝা যায়, ম্যাগাজিনের পাতা কেটে ছবিগুলো বের করে সাজিয়ে বাঁধানো হয়েছে। এমনভাবে ঝোলানো ছিলো দেয়ালে, অফিসের কাঁচের দেয়ালের ভেতর দিয়েও চোখে পড়ে।

একটা ছবিতে ইয়ার্ডের বেড়ার কাছে রাশেদ পাশাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। আরেকটা ছবিতে মিস্টার কারম্যান, রকি বীচে ছোট একটা রূপার জিনিসের দোকান আছে তাঁর। রূপা দিয়ে নানারকম জিনিস খুব ভালো তৈরি করতে পারেন। তৃতীয়জন একজন আর্টিস্ট, সাগরের একটা দৃশ্য আঁকছেন। তাঁর নাম এরিক হিমলার। আর চতুর্থ ছবিটা হলো স্বয়ং হেনরি কুপারের। চমৎকার একটা ক্লোজআপ। বাজার থেকে বেরোচ্ছে কুপার। শাদা দাড়ি আর চুল চকচক করছে। গলায় ঝোলানো দুইমাথা ঈগল। পরনে চিরকালের শাদা আলখেল্লা। হাতে আর বগলের নিচে প্যাকেট আর ব্যাগ। ছবির নিচে ক্যাপশন রয়েছেঃ রকি বীচের বিচিত্র পেশার কয়েকজন মানুষ।

'ওয়েস্টওয়েজ ম্যাগাজিন থেকে কেটেছি,' জানালেন মেরিচাচী। 'বিচিত্র পেশার মানুষদের ওপর একটা আর্টিকেল করেছে ওরা।'

ভ্রূকুটি করলো কুপার। 'জানতাম না। তবে একদিন বাজার থেকে বেরোনোর

সময় ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে দেখেছি একটা লোককে। পাত্তা দিইনি। কতোজনেই তো ওভাবে ছবি তোলে। যদি জানতাম...'

'কি জানতেন?'

'না, কিছু না। বলে আর এখন লাভ নেই।' ছবিটা মেরিচাচীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে কিশোরের দিকে ফিরলো কুপার। 'কয়েকটা জিনিস কিনতে এলাম। মেহমান আসবে বাড়িতে। আসবাবপত্র কিছু নেই তো...'

'মেহমান!' অবাক হলেন মেরিচাচী। 'আপনার বাড়িতে?'

হাসিখুশি এই মানুষটাকে রকি বীচে সবাই চেনে। তার কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে বলে জানে না। মেরিচাচীর আকাশ থেকে পড়া দেখে পুলকিত হলো কিশোর। মুখ দিয়ে আরেকটা প্রশ্ন বেরিয়ে যাচ্ছিলো মেরিচাচীর, কিন্তু সামলে নিয়ে কিশোরকে বললেন, 'এই যা তো, মিস্টার কুপারকে জিনিস দেখা। তোর চাচা গেছে লস অ্যাঞ্জেলেসে। আসতে ঘণ্টাখানেক দেরি হবে।' বলে তিনি আবার ফুলগাছে পানি দেয়ায় মন দিলেন।

খুশি হয়েই দেখাতে গেল কিশোর। কিছুটা কৌতূহলীও হয়ে উঠেছে কুপারের ব্যাপারে। জিজ্ঞেস করলো, 'কি জিনিস চান?'

'খাট। দুটো।'

'দেয়া যাবে।'

একজায়গায় কয়েকটা পুরনো খাট রাখা আছে। কিশোর আর রাশেদ পাশা মিলে ওগুলোকে মেরামত করে রঙ লাগিয়ে ব্যবহারের যোগ্য করেছে।

গদি আছে কিনা জানতে চাইলো কুপার।

আছে, জানিয়ে, জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'মেহমানেরা কি অনেক দিন থাকবে?'

'বলতে পারি না। আসুক আগে। ওই খাটটা তো ভালোই মনে হচ্ছে। ওপরে তামার কারুকাজ করা।'

'বেশি পুরনো আমলের তো।'

'হোক। আমিও তো পুরনো।' খাটের একটা ধার তুলে ধরে জোরে ঝাঁকিয়ে দেখলো কুপার।

'শক্ত। বেশ ভারি। ভালো। আজকাল আর এরকম বানায় না। কতো?'

অবাকই হয়েছে কিশোর। হলিউডের একটা পুরনো বাড়ি থেকে এক হপ্তা আগে রাশেদ পাশা কিনে এনেছেন ওটা। দামটা কতো হতে পারে, আন্দাজ করতে পারলো না সে। কতো দিয়ে কিনেছেন তার চাচা, জানে না।

'ঠিক আছে,' কুপার বললো, 'এখুনি বলার দরকার নেই। রেখে দাও। বিক্রি কোরো না আর কারো কাছে। তোমার চাচা এলে জেনে নিও।'

এদিক ওদিক তাকালো সে। 'আরেকটা খাট দরকার, সিঙ্গেল। একটা ছেলের

জন্যে। এই তোমার বয়েসী হবে। আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। শাদা রঙ করা একটা কাঠের খাট টেনে বের করে আনলো। মাথার কাছে বুককেসও লাগানো রয়েছে। 'পড়ার অভ্যেস থাকলে খুব ভালো হবে। কাঠ তেমন ভালো না, তবে কাজ চলবে। পছন্দ হয়?'

খুশি হলো কুপার। 'রঙটা ভাল্লাগছে না। তবে জিনিসটা চমৎকার। চলবে, খুব চলবে। পড়ার অভ্যেস না থাকলেও ছেলেদের ব্যক্তিগত অনেক জিনিস থাকে। ওগুলো রাখতে পারবে ওতে।'

'হ্যাঁ, তা পারবে। আর কিছু দরকার?'

খাট পছন্দ হয়েছে। আর কি লাগবে, বুঝতে পারছে না যেন কুপার। দ্বিধায় পড়ে গেছে। বললো, 'আর যে কি লাগবে...কিছুই তো নেই ঘরে। হ্যাঁ, দুটো চেয়ার হলে মন্দ হয় না।'

'এখন ক'টা আছে বাড়িতে?'

'একটা। একটার বেশি কখনোই দরকার হয়নি আমার। তাছাড়া বেশি জিনিসপত্রও আমি পছন্দ করি না। ঝামেলা কম হলেই ভালো।'

পিঠখাড়া দুটো চেয়ার বের করে দেখালো কিশোর। দেখেই পছন্দ হয়ে গেল কুপারের।

'টেবিল?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

মাথা নাড়লো কুপার। 'আছে। কিশোর, একটা টেলিভিশন অবশ্যই লাগবে। আজকাল সবাইই দেখে। আমি অবশ্য দেখি না। তবে ছেলেমানুষ, সে তো দেখতে চাইবেই। তোমাদের এখানে কি...'

'সরি, মিস্টার কুপার, নেই। পুরনো একআধটা এলে মেরামত করতে না করতেই বিক্রি হয়ে যায়। নতুন একটা কিনে নিন না কেন?'

দ্বিধা দেখা দিলো কুপারের চোখে।

'নতুনগুলোর গ্যারান্টি থাকে,' তাকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করলো কিশোর। 'খারাপ হলে শুধু একটা খবর দেবেন ডিলারকে। বদলে দিয়ে যাবে। সেটা অনেক ভালো হবে না?'

হবে, স্বীকার করলো কুপার। 'ঠিক আছে, দেখবো পরে। আপাতত এগুলো কিনি, তারপর...' থেমে গেল কুপার। বাইরে তীক্ষ্ণ শব্দে বেজে উঠলো একটা গাড়ির হর্ন। পর পর কয়েকবার বাজলো।

আসবাবপত্রের ছাউনি থেকে বেরোলো কিশোর। কুপারও বেরিয়ে এলো। ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা চকচকে কালো ক্যাডিলাক। আরেকবার হর্ন বাজিয়ে গাড়ি থেকে নামলো লোকটা, অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নেড়ে এগোলো অফিসের দিকে।

দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল কিশোর। 'কিছু লাগবে?'

দাঁড়িয়ে পড়লো লোকটা। কিশোর আর কুপারের কাছে আসার অপেক্ষা করছে। লোকটা লম্বা, ছিপছিপে, বয়েস খুব বেশি না, চুলের এখানে ওখানে রূপালী হতে আরম্ভ করেছে সবে। বাকি চুল কালো, কোঁকড়া।

'কিছু লাগবে, স্যার?' আবার জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'হিলটপ হাউসটা খুঁজছি আমি। হাইওয়েতে খোঁজাখুঁজি করেছি, পাচ্ছি না।' শুদ্ধ ইংরেজিতে বললো লোকটা, তবে ব্রিটিশ নয়, ইউরোপের কোনো দেশের লোক।

'উত্তরে, মাইলখানেক দূরে,' বললো কিশোর। 'হাইওয়েতে উঠে কিছুদূর গিয়ে ডানে মোড় দেখতে পাবেন। ওটা ধরে চলে যাবেন সোজা। একটা বাড়ি দেখতে পাবেন, "কুপারস প্লেস"। ওটার পরেই হিলটপ হাউসের গলি। চোখে পড়বেই। কাঠের গেট আছে, খিল লাগানো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে, কাঠখোট্টা একটা ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে ফিরে গেল লোকটা। এই প্রথম লক্ষ্য করলো কিশোর, গাড়িতে আরও একজন রয়েছে। পেছনের সীটে বসে আছে সে, গাট্টাগোট্টা শরীর। লম্বা লোকটা ঢুকতেই সামনে ঝুঁকে তার কাঁধ ছুঁয়ে কিছু বললো, বুঝতে পারলো না কিশোর, ভাষাটা অপরিচিত। দ্বিতীয় লোকটার বয়েস অনুমান করা কঠিন, বোঝা যায় না। যেন বয়েসই নেই তার। কারণটা হয়তো তার টাকমাথা, কিশোরের মনে হলো। এমনকি ভুরুও নেই। রোদে পোড়া চামড়া দেখে মনে হয় ছাড়িয়ে নিলেই স্যুটকেস বানানো যাবে।

কিশোরের দিকে তাকালো একপলক লোকটা, তারপর নজর ফেরালো কুপারের দিকে। চোখের তারা কালো। সেদিকে তাকিয়েই যেন মৃদু হিসহিস করে উঠলো কুপার। ঝট করে ফিরে তাকালো কিশোর। মাথা সামান্য কাত করে লোকটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কুপার। গভীর আগ্রহে কান পেতে রয়েছে যেন কিছু শোনার জন্যে। হাত চলে গেছে মেডেলটার ওপর।

আবার সীটে হেলান দিলো টাকমাথা লোকটা।

গীয়ার বদলালো ড্রাইভার। মসৃণ গতিতে পিছিয়ে নিয়ে গেল গাড়িটাকে। গাড়িপথের শেষ মাথায় পৌঁছেছে, বেরিয়ে যাবে রাস্তায়, এই সময় ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। দেরি করলো না গাড়িটা। বেরিয়ে গেল।

কিশোরের বাহুতে হাত রাখলো কুপার। 'কিশোর, এক গেলাস পানি খাওয়াবে? হঠাৎ কেমন যেন মাথাটা ঘুরে উঠলো।'

একটা চেয়ারে বসে পড়লো কুপার। অসুস্থ লাগছে তাকে।

'নিশ্চয়ই। এখুনি এনে দিচ্ছি,' বলে তাড়াহুড়ো করে ঘরের দিকে রওনা হয়ে গেল কিশোর।

'লোকগুলো কে?' মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন।

'হিলটপ হাউস খুঁজছে,' কিশোর জানালো। রান্নাঘরে ঢুকে ফ্রিজ থেকে পানির বোতল বের করে একটা গেলাসে ঢাললো।

'আশ্চর্য!' পেছন থেকে বললেন মেরিচাচী। 'বহুবছর ধরে হিলটপ হাউসে কেউ থাকে না।'

'জানি।' বলে গেলাসটা নিয়ে বেরিয়ে এলো কিশোর।

কিন্তু কোথায় কুপার? কোথাও তাকে দেখতে পেলো না কিশোর। ইয়ার্ডে নেই।

দুই

রাশেদ পাশা যখন ফিরলেন, তখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল কুপারের ট্রাকটা। বোরিসকে নিয়ে গিয়েছিলেন মাল কিনতে। বাগানে বসার কতগুলো চেয়ার-টেবিল কিনে নিয়ে এসেছেন। রাস্তার মাঝখানে ট্রাকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জানালা দিয়ে মুখ বের করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা এখানে কেন?'

'ওখানে রেখেই গায়েব হয়ে গেছে কুপার,' কিশোর জানালো।

'কি হয়ে গেছে?'

'গায়েব।'

ট্রাক থেকে নেমে পা-দানীতে বসলেন রাশেদ পাশা। 'কিশোর, মানুষ কখনও গায়েব হতে পারে না।'

'কিন্তু কুপার হয়েছে। খাট আর চেয়ার কিনতে এসেছিলো। মেহমান নাকি আসবে। একসময় বললো, মাথা ঘুরছে, পানি খাবে। আনতে গেলাম। নিয়ে এসে দেখি, গায়েব।'

বিশাল গোঁফে পাক দিতে লাগলেন রাশেদ পাশা। 'কুপারের বাড়িতে মেহমান? বলিস কি? আর গায়েব হয়ে গেল? কোথায়?'

'জানি না। খালিপায়ে এসেছিলো, তার পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে কষ্ট হয়নি। চাচী পানি দিয়েছে গাছে, পানি জমে ছিলো। তাতে পা দিয়েছে লোকটা। গেট দিয়ে বেরিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেছে মোড় পর্যন্ত, তারপর গেছে কোল্ডওয়েল হিলের দিকে। পথের ওপর কয়েকটা স্পষ্ট ছাপ দেখেছি। পঞ্চাশ গজ মতো এগিয়ে আবার উত্তরে মোড় নিয়েছে। তারপর থেকেই তার ছাপ গায়েব। জায়গাটা খুব শক্ত আর পাথুরে বলে পায়ের ছাপ পড়েনি।'

উঠে দাঁড়ালেন রাশেদ পাশা। গোঁফ ধরে টানলেন একবার। 'হুঁ। এটা সরানো দরকার। যখন আসে আসুক কুপার, নিয়ে যাবে তখন। এটার জন্যে কাজ বন্ধ রাখা যায় না।'

কুপারের ট্রাকে গিয়ে উঠলেন তিনি। কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। স্টার্ট নিতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না পুরনো এঞ্জিন।

'আশ্চর্য! এঞ্জিনেরও কি বুদ্ধি আছে নাকি?' আনমনে বিড়বিড় করলেন রাশেদ পাশা। 'মানুষ চেনে! নইলে কুপারের কথা শোনে কিভাবে?'

আরও কয়েকবার চেষ্টা করে নেমে এলেন তিনি। কিশোরকে ড্রাইভিং সীটে উঠে স্টীয়ারিং ধরতে ইশারা করলেন। তারপর তিনি আর বোরিস মিলে ঠেলতে শুরু করলেন গাড়িটাকে। অফিসের পাশের একটা খালি জায়গায় সরিয়ে নিয়ে রাখলেন ওটাকে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী। 'কুপারের খাবারগুলো ফ্রিজে রেখে দিই। কখন আসে না আসে। নষ্ট হয়ে যাবে। লোকটার যে কি হলো! এই কিশোর, ওর মেহমানরা কে রে?'

'বলেনি।'

'কখন আসবে?'

'তা-ও বলেনি।'

ট্রাকের পেছন থেকে একটা ব্যাগ নামিয়ে আনলেন মেরিচাচী। 'কিশোর, সাইকেলটা নিয়ে চট করে কুপারের বাড়ি চলে যা তো। ওখানে হয়তো পাবি। মেহমানরাও চলে আসতে পারে। এলে, সাথে করে নিয়ে আসবি। খালি বাড়িতে মেহমানরা অসুবিধেয় পড়ে যাবে।'

গায়ে পড়ে এই মেহমানদারীতে মেরিচাচীর সুনাম আছে। তর্ক করে লাভ হবে না। মুচকি হাসলো শুধু কিশোর। রওনা হলো ওয়ার্কশপের দিকে, যেখানে সাইকেলটা রেখেছে।

'দেরি করবি না কিন্তু,' পেছন থেকে ডেকে বললেন মেরিচাচী। 'অনেক কাজ পড়ে আছে। তুই তো একবার বেরোতে পারলেই হয়...'

এবার জোরেই হাসলো কিশোর। সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। হাইওয়ের কিনার ঘেঁষে সাইকেল চালালো, যাতে দ্রুতগতি গাড়িগুলোর সাথে ধাক্কা না লাগে। উত্তরে এগোলো সে। আপনমনেই হাসছে নীরবে। ইয়ার্ডে অনেক কাজ। মেহমান হোক আর যাই হোক, মেরিচাচীর খপ্পরে একবার পড়লে কাজ না করে আর পারবে না। কপাল খারাপ হয়ে থাকলে ইতিমধ্যেই এসে পড়েছে ছেলেটা। অবশ্য ইয়ার্ডে মেহমান হতে না এলে বেঁচে যাবে।

ইভানস্টন পয়েন্টের কাছে এসে বাঁক নিয়েছে পথ। কুপারের বাড়িটা দেখা যায় এখান থেকে। কালচে-সবুজ পাহাড়ের পটভূমিকায় ধবধবে শাদা, যেন লাফিয়ে এসে নজরে লাগে। ঢালু পথ এখন। প্যাডাল ঘোরানো থামিয়ে দিলো কিশোর, আপনাআপনি ছুটছে সাইকেল।

একসময় বেশ ভালো বাড়ি ছিলো কুপারস প্লেস, এখন আর সেই জৌলুস নেই। ভিকটোরিয়ান ধাঁচে তৈরি বাড়িটার মুমূর্ষু দেহটা পড়ে পড়ে যেন এখন ধুঁকছে নিঃসঙ্গ সৈকতের ধারে।

গেটের কাছে থামলো কিশোর। ছোট একটা নোটিশ ঝোলানো রয়েছে গেটের ওপরে। তাতে লেখা, কুপার নেই, তবে শিগগিরই ফিরে আসবে। ভেতরে নেই তো? ভাবলো সে। অসুস্থ হয়ে হয়তো শুয়ে আছে ভেতরে। খদ্দেররা এসে যাতে বিরক্ত না করে সে-জন্যেই ঝুলিয়ে রেখেছে নোটিশটা।

বেড়ার গায়ে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে গেটের ভেতরে ঢুকে পড়লো কিশোর। বাড়ির সামনে বাগানে পাথর বসানো চত্বর। তাতে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে চীনামাটির তৈরি নানারকম জিনিস। বড় বড় কলস, চীনামাটির ফলকে আঁকা ফুল কিংবা ফল, মস্ত ফুলের ভাস—গায়ে আঁকা উড়ন্ত পাখি।

'মিস্টার কুপার?' ডাকলো কিশোর।

সাড়া নেই। লম্বা, সরু জানালাগুলো শূন্য লাগছে। যে ছাউনিটাতে রসদ রাখে কুপার, সেটায় তালা দেয়া। নীরব হয়ে আছে। রাস্তার অন্য পাশে, সৈকত যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ধুলোমাখা ফোর্ড গাড়ি। মালিক নিশ্চয় পানিতে নেমে মাছ ধরছে কিংবা সার্ফিং করছে।

হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে সরু একটা পথ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে গেছে ওপরে, ওটা ধরেই উঠতে হয় হিলটপ হাউসে। কুপারের সীমানা থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে রাস্তাটা। এখান থেকে পাহাড়ের ওপরের বাড়িটা দেখা যায় না, তবে পাথরের দেয়াল চোখে পড়ছে কিশোরের। দেয়ালে পেট ঠেকিয়ে ঝুঁকে রয়েছে একটা লোক। এতো দূর থেকে বুঝতে পারলো না কিশোর, লোকটা কি ক্যাডিলাকের সেই ড্রাইভার, না টাকমাথা লোকটা?

টেবিলে আর মাটিতে রাখা চীনামাটির জিনিসগুলোর পাশ দিয়ে দ্রুত এগোলো কিশোর। সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠলো দুই ধাপ। দুই পাশে দুটো বিশাল কলস রাখা, এতো বড়, প্রায় তার সমান উঁচু। প্রতিটি কলসের গায়ে একসারি করে ঈগল আঁকা। সেই ঈগল, দুই মাথাওয়ালা, যেরকম গলায় পরে থাকে কুপার। জ্বলছে পাখিগুলোর চোখ। ঠোঁট ফাঁক করে রেখেছে চিৎকারের ভঙ্গিতে, যেন প্রাণ পেলেই ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়বে একটা আরেকটার ওপর।

পায়ের তলায় মচমচ করে উঠলো কাঠের সিঁড়ি। আবার ডাকলো কিশোর, 'মিস্টার কুপার, বাড়ি আছেন?'

এবারও জবাব নেই। ভ্রূকুটি করলো কিশোর। সামনের দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। সামনের বাগানের জিনিসপত্রের জন্যে চিন্তা নেই কুপারের, জানে কিশোর, কারণ অতো বড় বড় জিনিস সহজে চুরি করা সম্ভব নয়। কিন্তু ঘরের ভেতরে যেসব জিনিস রাখে কুপার, সেসব তালা দিয়ে রাখে। সামনের দরজা

যেহেতু খোলা, তার মানে ভেতরেই রয়েছে সে।

সামনের দরজা দিয়ে হলঘরে ঢুকলো কিশোর। ছাত সমান উঁচু সারি সারি তাক রয়েছে দেয়াল ঘেঁষে। কাপ, প্লেট, বাসন আর চীনামাটির নানারকম জিনিসে বোঝাই তাকগুলো। সুন্দর সুন্দর জিনিস। ঝকঝকে পরিষ্কার। এক কণা ধুলো নেই কোনোটাতে।

'মিস্টার কুপার?' চিৎকার করে ডাকলো কিশোর।

'মিস্টার কুপার?' দরজায় থাবা দিলো কিশোর।

জবাব এলো না। কোনো শব্দও নেই, শুধু রান্নাঘর থেকে ফ্রিজের গুঞ্জন ছাড়া। সিঁড়ির দিকে তাকালো কিশোর। দোতলায় উঠবে? ফিরে এসেই হয়তো বিছানায় গিয়ে পড়েছে কুপার। বেহুঁশও হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

খুট করে একটা শব্দ হলো। কোথাও কিছু একটা নড়লো বলে মনে হলো। বাঁয়ে তাকালো কিশোর। একটা বন্ধ দরজা। ওটা কুপারের অফিস, জানে সে। শব্দটা ওদিক থেকেই এসেছে।

'মিস্টার কুপার?' দরজায় থাবা দিলো কিশোর।

জবাব নেই। ডোরনব চেপে ধরে মোচড় দিতেই খুলে গেল, ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা। কেউ নেই। কোণের কাছে একটা ডেস্ক, তাতে উঁচু হয়ে আছে ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। ভেতরে ঢুকলো সে। ডাকেও জিনিস বিক্রি করে কুপার, ইনভয়েস দেখেই বোঝা যায়। দামের তালিকা রয়েছে কিছু। কতগুলো অর্ডার ফর্ম পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দেয়া। শেলফের তাকে একটা বাক্সে রয়েছে চিঠি পাঠানোর খাম।

তারপর এমন একটা ব্যাপার চোখে পড়লো কিশোরের, ক্ষণিকের জন্যে নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল সে। তালা ভেঙে ডেস্কের ড্রয়ার খোলা হয়েছে। একটা ড্রয়ার একেবারে খালি। সমস্ত কাগজ আর ফাইল ফোল্ডার ছড়িয়ে আছে মেঝেতে।

কেউ একজন কিছু খুঁজছিলো এখানে!

দরজার দিকে ঘুরতে গেল কিশোর। ঠিক এই সময় থাবা পড়লো কাঁধে। তাকে ঘোরার সুযোগ দেয়া হলো না। পিঠে জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হলো সামনের দিকে। ডেস্কের কিনারে মাথা ঠুকে গেল তার। উঁচু হয়ে থাকা কাগজের স্তূপ থেকে কিছু কাগজ এসে পড়লো মাথায়।

দড়াম করে বন্ধ হলো দরজা। চাবি লাগানোর শব্দ শোনা গেল। ছুটে চলে গেল পদশব্দ।

কোনোমতে উঠে বসলো কিশোর। মাথা ঝাড়া দিলো। আপনাআপনি হাত চলে গেল কপালের কাছে, যেখানে বাড়ি লেগেছে।

টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। ছুটে গেল জানালার কাছে। কেউ নেই বাগানে। পালিয়ে গেছে লোকটা।

তিন

দরজার নব ধরে মোচড় দিলো কিশোর। ঘুরলো না। পুরনো আমলের ডোরনব, চাবির ফুটো দিয়ে ওপাশ দেখা যায়। তাতে চোখ রেখে ওপাশে তাকালো সে। অন্ধকার। তার মানে চাবিটা তালার ফুটোয় আটকে রেখে গেছে লোকটা।

ডেস্কের কাছে ফিরে এলো কিশোর। চিঠি খোলার একটা ছুরি খুঁজে বের করলো। সেটা নিয়ে এসে তালা খোলার চেষ্টায় লাগলো।

ইচ্ছে করলে জানালা দিয়ে বেরোনোর উপায় করতে পারে। কিন্তু সেটা উচিত হবে না। রাস্তা থেকে দেখা যায় জানালাটা। যে কারো চোখে পড়তে পারে। সন্দেহ করবে। চোর-টোর ভেবে আজেবাজে কিছু করে বসতে পারে তখন।

তালা খোলার চেষ্টা করছে সে, এই সময় বাইরে একাধিক পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। পাথর হয়ে গেল যেন কিশোর।

'নানা!' চেঁচিয়ে ডাকলো একটা কণ্ঠ।

খিড়ড়ড় খিড়ড়ড় করে বেজে উঠলো রান্নাঘরে লাগানো কলিং বেলটা।

আবার ডাক শোনা গেল, 'নানা, আমরা!'

দরজায় থাবা দিলো কেউ।

তালা খোলার চেষ্টা বাদ দিয়ে জানালার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। ওটাতেও লক লাগানো। খুললো লকটা। তারপর পাল্লা খুলে মুখ বের করলো। চত্বরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ছেলে। সুন্দর চুল। দরজায় থাবা দিচ্ছে সে-ই। পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলা। বয়েস বেশি না। সোনালি চুল উষ্কখুষ্ক হয়ে আছে, বোধহয় জোর বাতাস লেগেই। চোখ থেকে খুলে হাতে নিয়েছে সানগ্লাসটা, আরেক হাতে বাদামী চামড়ার একটা বড় ব্যাগ।

'গুড মরনিং!' জানালো কিশোর।

তার দিকে তাকিয়ে রইলো মহিলা আর ছেলেটা। জবাব দিলো না।

এবার আর জানালা গলে বেরোতে দ্বিধা করলো না কিশোর। অন্যের চোখে পড়েই গেছে, এখন আর রাস্তা থেকে কেউ দেখলেও কিছু এসে যায় না।

'তালা দিয়ে আটকে রেখে গেছে আমাকে,' বললো সে। জানালা দিয়ে বেরিয়ে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলো আবার। ঘুরে এসে খুলে দিলো অফিস ঘরের তালা।

একবার দ্বিধা করে কিশোরের পেছন পেছন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো মহিলা আর ছেলেটা।

'অফিসে কেউ খোঁজাখুঁজি করছিলো,' বললো কিশোর। 'আমি ঢুকতেই আটকে রেখে পালালো।'

ছেলেটাকে দেখছে সে। তারই বয়েসী হবে। জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি নিশ্চয়

মিস্টার কুপারের মেহমান?'

'আমি···আঁ···তুমি কে? আমার নানা কোথায়?'

'নানা!' প্রতিধ্বনি করলো যেন কিশোর। চেয়ারের জন্যে তাকালো এদিক ওদিক। একটাও নেই। তাই সিঁড়িতে গিয়েই বসে পড়লো।

'মিস্টার হেনরি কুপার,' ঝাঁঝালো গলায় বললো ছেলেটা। 'এটা তো তারই বাড়ি, নাকি? ফিলিং স্টেশনে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওরা তো এটার কথাই বললো···'

হাঁটুতে কনুই রেখে হাতের ওপর থুতনির ভর রাখলো কিশোর। কপাল ব্যথা করছে, যেখানে বাড়ি লেগেছে। 'নানা?' আবার বললো সে। 'তুমি বলতে চাইছো, কুপারের একজন নাতিও আছে?' মাটির তলার ঘরে একটা ডাইনোসর পুষছে কুপার, কেউ যদি এসে একথা বলতো, তাহলেও এতো অবাক হতো না কিশোর।

সানগ্লাসটা চোখে লাগালো মহিলা। কিন্তু ঘরটা বেশি অন্ধকার মনে হওয়ায় আবার খুলে ফেললো।

মহিলা সুন্দরী, ভাবলো কিশোর। বললো, 'মিস্টার কুপার যে কোথায় বলতে পারবো না। আজ সকালে দেখেছি। তার পর কোথায় গেছেন জানি না। এখানে নেই।'

'সে-জন্যেই চুরি করে ঘরে ঢুকেছিলো,' গম্ভীর হয়ে বললো মহিলা। 'ডরি, পুলিশকে খবর দে তো!'

সমস্ত ঘরে চোখ বোলালো ছেলেটা। বিস্ময় ফুটেছে চোখে।

'হাইওয়েতে গেলে পাবলিক টেলিফোন পাবে,' ডরির মনের ভাব বুঝে বললো কিশোর। 'বেশি দূরে না।'

'তার মানে আমার আব্বার টেলিফোন নেই?' মহিলাও অবাক হয়েছে।

'আপনার আব্বা যদি কুপার হয়ে থাকেন, তাহলে নেই।'

'ডরি!' পার্স খুলে পয়সা খুঁজতে আরম্ভ করলো মহিলা।

'আম্মা, তুমি গিয়ে ফোন করো। আমি এটাকে আটকে রাখছি এখানে।'

'নিশ্চিন্তে যেতে পারো,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'পালানোর কোনো ইচ্ছেই আমার নেই।'

ধীরপায়ে দরজার কাছে গেল মহিলা। বাইরে বেরিয়েই প্রায় ছুটতে লাগলো। দেখে মুচকি হাসলো কিশোর। ডরিকে জিজ্ঞেস করলো, 'তাহলে কুপার তোমার নানা?'

'তাতে অবাক হওয়ার কি আছে? সবারই নানা থাকে, থাকে না?'

'তা থাকে। তবে সবার নাতি থাকে না। অন্তত কুপারের···আমি বলতে চাইছি, ওরকম একজন আজব মানুষের!'

'আজবের কি দেখলে? একটু খামখেয়ালি বলতে পারো, আম্মার কাছে

শুনেছি। প্রায়ই জিনিসপত্র পাঠায় আমাদেরকে।'

খবরটা হজম করতে সময় লাগলো কিশোরের। কতো দিন ধরে রকি বীচে আছে কুপার? বিশ বছর? তিরিশ? মেরিচাচীও সঠিক বলতে পারেন না। অথচ প্রায় জন্মের পর থেকেই আছেন তিনি এখানে। তিনি আর রাশেদ চাচা মিলে ইয়ার্ডের ব্যবসা শুরু করার আগে থেকেই রকি বীচে কুপারের ব্যবসা জমজমাট। ওই মহিলা কুপারের মেয়ে হতেই পারে, কিন্তু এতো দিন কোথায় ছিলো ওরা? কেন তার কথা একবারও বলেনি কুপার?

ফিরে এলো মহিলা। হাতের পার্সটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে খবরটা দিলো, 'পুলিশ আসছে।'

'ভালো,' কিশোর বললো।

'ভালো কথাগুলো বলো ওদেরকে!'

'নিশ্চয়ই বলবো। আপনি মিসেস···মিসেস···'

'মরগান।'

উঠে দাঁড়ালো কিশোর। 'আমি কিশোর পাশা, মিসেস মরগান।'

'হাউ ডু ইউ ডু!' কাটা কাটা গলায় বললো মহিলা।

'আপাতত খুব একটা ভালো না। কপালের এই গোল আলুটা দেখছেন? মিস্টার কুপারকে খুঁজতে এসেছিলাম। অফিসে ঢুকতেই দিলো ধাক্কা মেরে ফেলে। টেবিলে লেগে ফুলেছে।'

প্রমাণ দেখিয়েও মহিলাকে কথা বিশ্বাস করাতে পারেনি, মিসেস মরগানের মুখ দেখেই বুঝতে পারছে কিশোর। রাস্তায় পুলিশের সাইরেন শোনা গেল।

'খুব একটা গণ্ডগোল হয় না রকি বীচে,' বললো কিশোর, 'পুলিশ প্রায় বসেই থাকে। সাইরেন বাজানোর সুযোগ পাওয়ায় খুশিই হবে ওরা।

'সাংঘাতিক সাহস!' খুব অবাক হয়েছে ডরি। 'পুলিশ আসছে, তা-ও ভয়ডর নেই!'

বাড়ির বাইরে এসে থেমে গেল সাইরেন। খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল শাদা-কালো পেট্রোল কারটা। দু'জন অফিসার নেমে এগিয়ে এলো দরজার দিকে।

আবার সিঁড়িতে বসে পড়লো কিশোর। মিসেস মরগান, যার ডাক নাম এলিজা, নিজের পরিচয় দিলো পুলিশের কাছে। কথার ফোয়ারা ছোটালো কিছুক্ষণ। তাতে জানা গেল, ইলিনয়ের বেলিভিউ থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছে সে, বাবার সঙ্গে দেখা করতে। আপাতত বাড়িতে নেই বাবা। এই দুষ্টু ছেলেটাকে (কিশোরকে দেখালো সে) অফিসের জানালা গলে বেরোতে দেখেছে। তাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত পুলিশের।

সারা জীবন ধরেই রকি বীচে বাস করছে অফিসার ম্যাকেনা। সার্জেন্ট রিকার্ডোর পনেরতম পুলিশে-চাকুরি-বৎসর পেরিয়েছে এই দিন কতক আগে। তা-ও এই রকি বীচেই। ভালো মতো চেনে কিশোরকে। মহিলার কথাগুলো নোট করে নিলো সার্জেন্ট। বললো, 'মিস্টার কুপারের মেয়ে আপনি, এটা প্রমাণ করার জন্যে তৈরি আছেন?'

লাল হয়ে গেল এলিজার মুখ। 'মা-মানে!'

'আমি বলছি, আপনি কি…'

'কি যা তা বলছেন!'

'যা তা নয়, ম্যা'ম। দয়া করে যদি বলেন…'

'কি বলবো! বললামই তো, এসে দেখি এই চোরটা…'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো সার্জেন্ট রিকার্ডো। 'ছোঁক-ছোঁক করার স্বভাব আছে কিশোর পাশার, কোনো সন্দেহ নেই, তবে সে চোর নয়।' কিশোরের দিকে তাকালো সে। 'কি হয়েছে, পাশা? এখানে কেন এসেছিলে?'

'গোড়া থেকে বলবো?'

'বলো। সময়ের অভাব নেই আমার।'

সুতরাং গোড়া থেকে শুরু করলো কিশোর। স্যালভিজ ইয়ার্ডে গিয়েছিলো কুপার। মেহমানদের জন্যে আসবাব কিনতে।

কিশোর এই পর্যন্ত আসতে মাথা ঝাঁকালো সার্জেন্ট। রান্নাঘর থেকে গিয়ে একমাত্র চেয়ারটা নিয়ে এলো ম্যাকেনা, যাতে মিসেস মরগান বসতে পারে। বসলো এলিজা।

তারপর কিশোর জানালো, কিভাবে গায়েব হয়ে গেছে কুপার। বললো, 'এখানে তাকে খুঁজতে এলাম। দেখি সামনের দরজাটা খোলা। ভেতরে ঢুকলাম। কুপারকে পেলাম না। তার অফিসের দরজা খোলা দেখে ভেতরে ঢুকলাম। দেখি, তালা ভেঙে ডেস্কের ড্রয়ার খোলা হয়েছে। দরজার আড়ালেই বোধহয় দাঁড়িয়ে ছিলো লোকটা, দেখতে পাইনি। পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে আমাকে ডেস্কের ওপর ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে তালা আটকে দিয়ে পালালো। তালাটা খোলার চেষ্টা করছি, এই সময় বেল বাজালো ডরি। জানালা দিয়ে না বেরিয়ে আর তখন উপায় ছিলো না আমার।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে রইলো রিকার্ডো। তারপর শুধু বললো, 'তাই?'

'কুপারের অফিসে খোঁজাখুঁজি করেছে লোকটা,' আবার বললো কিশোর। 'দেখুন গিয়ে, মেঝেতে কাগজপত্র কেমন ছড়িয়ে রয়েছে।'

অফিসে গিয়ে ঢুকলো সার্জেন্ট। মেঝেতে ছড়ানো কাগজ আর ড্রয়ারের ভাঙা তালা দেখলো।

'অগোছালো অফিস পছন্দ করে না কুপার,' কিশোর বললো। 'কাগজপত্র

ওভাবে এলোমেলো করে রাখতে কখনও দেখিনি।'

হলের দিকে ফিরে তাকালো রিকার্ডো। 'আঙুলের ছাপ আছে কিনা দেখা দরকার। লোক পাঠানোর জন্যে খবর দিচ্ছি। মিসেস মরগান, এই সময়টা আপনি...'

কাঁদতে শুরু করলো এলিজা।

'আরি, আম্মা, কাঁদছো কেন!' মায়ের বাহুতে হাত রাখলো ডরি। 'পাগল নাকি! কাঁদার কি হলো?'

'তুই কি বুঝবি? ও আমার বাবা ছিলো। এতোটা পথ গাড়ি চালিয়ে এলাম বাপকে দেখার জন্যে, এসে দেখি এই অবস্থা! আসতে দেরি করলাম না, গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে পর্যন্ত থামলাম না...'

'আম্মা, চুপ করো! শান্ত হও!'

ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে রুমাল খুঁজতে লাগলো এলিজা। 'আমি ওর মেয়ে, প্রমাণ তো করতে পারবো না! আব্বা থাকলে দেখে চিনতো। এখন কি করবো? আমি কি আর জানতাম রকি বীচের পুলিশ বার্থ সার্টিফিকেট চাইতে আসবে!'

'মিসেস মরগান,' শান্ত কণ্ঠে বললো রিকার্ডো, 'আপাতত এ-বাড়িতে না থাকাই উচিত আপনাদের।'

'কিন্তু হেনরি কুপার আমার বাবা!'

'হয়তো। সেটা তিনি থাকলে বলতে পারতেন। নেই যখন...আরেকটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে, চুরি করে এখানে ঢুকেছিলো কেউ। বেআইনী ভাবে। মিস্টার কুপার যেখানেই গেছেন, ফিরে আসবেনই। তখন শনাক্ত করতে পারবেন আপনাকে। কিন্তু না আসা পর্যন্ত...এখানে ভালো একটা সরাইখানা আছে, ওশনসাইড ইন। খুব ভালো...'

বাধা দিয়ে ফস করে বললো কিশোর, 'আপনারা গেলে খুব খুশি হবেন আমার চাচী।'

তার দিকে ফিরেও তাকালো না এলিজা। রুমাল চেপে ধরে আছে মুখে। হাত কাঁপছে।

'এখানে থাকতে পারছেন না এখন আপনারা কিছুতেই,' আবার বললো রিকার্ডো। 'ফিঙ্গার প্রিন্ট নিতে আসবে পুলিশের লোক। তাছাড়া জিনিসপত্র যেভাবে যা আছে এখন সেভাবেই থাকা উচিত।'

'ওশনসাইড ইনটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো এলিজা.

'এখান থেকে দেড় মাইল দূরে।'

উঠে দাঁড়িয়ে সানগ্লাস পরলো মহিলা।

'চীফ হয়তো আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন,' রিকার্ডো বললো। 'তাঁকে বলবো, আপনি ওশনসাইডেই আছেন।'

আবার কাঁদতে লাগলো এলিজা। তাড়াহুড়ো করে তাকে ঘর থেকে নিয়ে গেল ডরি। এগোলো রাস্তার দিকে, যেখানে পথের পাশে পার্ক করা রয়েছে ওদের নীল কনভারটিবল গাড়িটা। ইলিনয়ের লাইসেন্স প্লেট লাগানো রয়েছে তাতে।

'অবাক কাণ্ড!' বিড়বিড় করে বললো রিকার্ডো। 'হেনরি কুপারের মেয়ে!'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' ম্যাকেনা বললো, 'হেনরি কুপারের মেয়ে আছে!'

'মেয়ে না হলে এসে বলতে যাবে কেন? কুপার মানুষটা অদ্ভুত, ঠিক, কিন্তু অদ্ভুত মানুষের মেয়ে থাকতে পারবে না এমন কোনো কথা নেই।'

'তা নেই। আরেকটা ব্যাপার অবাক লাগছে। কি এমন লুকিয়ে রেখেছিলো কুপার, যেটা খুঁজতে বেআইনী ভাবে লোক ঢুকেছে তার অফিসে?'

'নিশ্চয় কিছু একটা রেখেছে,' মুখ খুললো কিশোর। 'নইলে আসবে কেন? কষ্ট করে ড্রয়ারের তালা ভেঙে খুঁজতেই বা যাবে কেন লোকটা?'

চার

কিশোরকে গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব দিলো ম্যাকেনা। ধন্যবাদ দিয়ে কিশোর জানালো, সে সাইকেল নিয়ে এসেছে; তাতে করেই ফিরবে।

কপালের ফোলাটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো পুলিশ অফিসার, বেশি ব্যথা করছে কিনা।

মাথা নাড়লো কিশোর। 'নাহ্। শুধু ফুলে আছে, ব্যস।' সাইকেল নিয়ে রওনা হয়ে গেল সে।

রাস্তায় উঠে থামলো। সামনের গাড়িগুলো সরে যাওয়ার অপেক্ষায়। সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে এখনও ফোর্ড গাড়িটা। সরে গেল সামনের গাড়িগুলো, একছুটে সাইকেল নিয়ে অন্যপাশে চলে এলো কিশোর। সৈকতের দিকে তাকালো। ভাটা শুরু হয়েছে। পানির কিনারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বালি ভেজা, জোয়ারের সময় পানি উঠেছিলো ওখানটায়। উঠে আসছে একজন মাছশিকারী। গায়ে গলাবন্ধ শাদা শার্ট। তার ওপর পরেছে একটা পরিষ্কার নীল জ্যাকেট। পরনে ফ্যাকাসে নীল প্যান্ট। পায়ে চকচকে নীল স্নীকার। মাথায় নাবিকদের টুপি। সব কিছুই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এই পোশাক পরে মাছ ধরতে এসেছিলো লোকটা, অবাক হয়ে ভাবলো কিশোর। একটু ময়লা লাগেনি কোথাও, পানি লাগেনি।

'হাল্লো!' কাছাকাছি এসে বললো লোকটা।

কিশোর দেখলো, রোদে পোড়া পাতলা একটা মুখ। বেমানান রকমের বড় সানগ্লাস। ধূসর গোঁফে মোম লাগিয়ে শক্ত করে ফেলা হয়েছে। চোখা কোণ দুটো

চলে গেছে দুই কানের কাছাকাছি।

হাতের মাছ ধরার সরঞ্জামগুলো একেবারে নতুন, চকচকে।

'কিছু পেলেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'নাহ্। একেবারেই খাচ্ছে না আজ।' ধুলোয় ঢাকা ফোর্ডের বুট খুলে ছিপ আর অন্যান্য সরঞ্জাম ঢুকিয়ে রাখতে লাগলো লোকটা। 'কিংবা হয়তো টোপই ভালো না। নতুন শুরু করেছি, কিছুই তেমন জানি না।'

সেটা আগেই আন্দাজ করে ফেলেছে কিশোর। বেশির ভাগ মাছ শিকারীকেই দেখতে ভবঘুরের মতো লাগে, অন্তত কিশোরের কাছে। কাপড়ের ঠিক নেই, শরীরের খেয়াল নেই, তাদের শুধু একটাই ভাবনা, মাছ, মাছ আর মাছ।

কুপারদের বাড়ির সামনে দাঁড়ানো পুলিশের গাড়িটার দিকে হাত তুলে জিজ্ঞেস করলো লোকটা, 'চুরি-ডাকাতি হয়েছে নাকি?'

'ওরকমই। তালা ভেঙে ড্রয়ার খুলেছিলো কে জানি।'

'ও।' বিশেষ আগ্রহী মনে হলো না লোকটাকে। দড়াম করে নামিয়ে দিলো বুটটা।

দরজা খুললো লোকটা। ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'কুপারের বাড়ি না ওটা?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'চেনো নাকি তাকে?'

'চিনি। এ-শহরের সবাই চেনে তাকে।'

'আমিও তাই ভেবেছি। লোকে চিনবেই। এতো সুন্দর জিনিস বানায়,' সানগ্লাসের ভেতর দিয়ে কিশোরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখলো লোকটা। 'কপালে কি হয়েছে?'

'পড়ে গিয়েছিলাম।'

'আহ্হা! ফুলে গেছে একেবারে। সাইকেল চালাতে পারবে? নাহয় গাড়িতে এসে ওঠো, বাড়ি পৌছে দেবো।'

'না, লাগবে না। থ্যাংক ইউ।'

'বুঝেছি। অপরিচিত মানুষের লিফট নেবে না।' এমন ভঙ্গিতে হাসলো লোকটা যেন সাংঘাতিক মজার কিছু বলে ফেলেছে। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে স্টার্ট দিয়ে গাড়ি পিছিয়ে আনলো, মুখ ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল হাইওয়ের দিকে।

সাইকেলে করে ইয়ার্ডে ফিরে এলো কিশোর। মেইন গেটের দিকে গেল না। চলে এলো বেড়ার পাশে, যেখানে বেড়ার গায়ে আঁকা রয়েছে একটা মাছ, পানি থেকে মাথা তুলে জাহাজ দেখছে। মাছটার চোখ টিপে ধরলো সে। নিঃশব্দে দুটো চওড়া তক্তা উঠে গেল বেড়ার গা থেকে। বেরিয়ে পড়লো একটা গোপন পথ। সাইকেলসহ সেপথে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। তারপর আবার নামিয়ে দিলো

তক্তাদুটো। এটা তিন গোয়েন্দার অনেকগুলো গোপন প্রবেশপথের একটা, সবুজ ফটক এক।

ভেতরে ঢুকে সাইকেল রেখে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকলো কিশোর। সোজা এগোলো টেলিফোনের দিকে। অন্যপাশে দুই বার রিঙ হতে না হতেই রিসিভার তোলা হলো।

'কিশোর বলছি।'

'ও, কিশোর,' শোনা গেল মুসার উল্লসিত কণ্ঠ। 'আজ সাগরের অবস্থা চমৎকার। ভাবছি সার্ফিং করতে যাবো। বোর্ড নিয়ে বেরিয়ে পড়বো...'

'আমি যেতে পারবো বলে মনে হয় না,' তিক্ত কণ্ঠে বললো কিশোর।

'কেন কেন?'

'অনেক মাল নিয়ে এসেছে চাচা। এতো বেশি পুরনো, সারাতে অনেক সময় লাগবে। ঘষাঘষি শুরু করে দিয়েছে এতোক্ষণে বোরিস আর রোভার, মরচে তুলছে। আমি বেরোলেই ক্যাঁক করে ধরবে চাচী, কাজে লাগিয়ে দেবে।'

'খাইছে, তাই নাকি! আমি তাহলে বাপু আজ আর ইয়ার্ডমুখো হচ্ছি না! এইমাত্র গ্যারেজ সাফ করে এলাম। বাগান সাফ করার কথা ভাবছে কিনা মা, আল্লাহ্ই জানে। তাহলে গেছি।'

'আজ রাত ন'টায় হেডকোয়ার্টারে আসতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই পারবো।'

হাসলো কিশোর। 'এইমাত্র না বললে ইয়ার্ডমুখো হবে না?'

'আরে মেরিচাচীকে দেখিয়ে আসবো নাকি? চোরাপথে ঢুকবো। লাল কুকুর চার দিয়ে।'

'ঠিক আছে,' বলে লাইন কেটে দিলো কিশোর। রবিনকে ডায়াল করতে শুরু করলো।

জবাব দিলেন রবিনের মা। রবিন নেই, লাইব্রেরিতে গেছে, যেখানে পার্টটাইম চাকরি করে সে।

'একটা মেসেজ দিচ্ছি, আন্টি, এলে বলবেন।'

'বলবো। দাঁড়াও কাগজ-পেন্সিল নিয়ে আসি। তোমাদের ভাষা তো বুঝি না, কি বলবে কে জানে! মনেই থাকবে না।'

কোনো মন্তব্য করলো না কিশোর, চুপ করে রইলো। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে এলেন রবিনের মা। বললেন, 'বলো।'

কিশোর বললো, 'লাল কুকুর চার রাত ন'টা।'

'লাল...কুকুর...চার...রাত...নটা,' লিখতে লিখতে বললেন মিসেস মিলফোর্ড। 'বললাম না, উদ্ভট কথা বলবে। ঠিক আছে, রবিন এলে বলবো।'

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার রেখে দিলো কিশোর। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে

হেডকোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে আবার সবুজ ফটক এক দিয়ে পথে বেরোলো। তারপর ঘুরে মেইন গেট দিয়ে ঢুকলো স্যালভিজ ইয়ার্ডে।

অফিসের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন মেরিচাচী। হাতে দস্তানা, কাজ করছিলেন নিশ্চয়। কিশোরকে দেখেই বলে উঠলেন, 'এতো দেরি করলি। আমি তো পুলিশকে ফোন করবো ভাবছিলাম। কি হয়েছিলো?'

'কুপার নেই। তার মেহমানেরা এসে গেছে।'

'এসে গেছে? তাহলে নিয়ে এলি না কেন? তোকে না বলে দিয়েছিলাম।'

সাইকেলটা স্ট্যাণ্ডে তুলে রাখলো কিশোর। 'ওরা হয়তো গলাকাটা ডাকাত ভেবেছে আমাকে। ওশনসাইড ইনে চলে গেছে। মহিলার নাম মিসেস এলিজা মরগান, কুপারের মেয়ে বলে পরিচয় দিচ্ছে। তার ছেলেটার নাম ডরি।'

'কুপারের মেয়ে? আশ্চর্য! আমি তো জানি ওর কোনো মেয়েই নেই!'

'তুমি শিওর?'

'হ্যাঁ। মানে, কখনও বলেনি তো⋯কিশোর, ওরা তোকে গলাকাটা ডাকাত ভাববে কেন?'

'ডাকাত না ভাবলেও চোর তো নিশ্চয় ভাবছে।' চাচীকে সমস্ত কথা খুলে বললো কিশোর।

'হুঁম্।' কিশোরকে চোর ভাবছে, কথাটা একটুও পছন্দ হলো না মেরিচাচীর। সেটা অবশ্য বললেন না। বললেন, 'জলদি যা। গিয়ে বরফ লাগা কপালে।'

'লাগবে না। ঠিক হয়ে যাবে।'

'না, হবে না! তর্ক করবি না। জলদি যা।'

অগত্যা যেতেই হলো কিশোরকে।

পিছে পিছে এলেন চাচী। নিজেই ফ্রিজ থেকে বরফের টুকরো বের করে একটা কাপড়ে পেঁচিয়ে ঠেসে ধরলেন কিশোরের কপালে। কিছুক্ষণ ধরে রেখে কাপড়টা তার হাতে গুঁজে দিয়ে গেলেন খাবার বের করতে। তাঁর ধারণা এতোবড় আঘাতের পর খিদে না পেয়েই যায় না। বড় সাইজের এক জোড়া স্যাণ্ডউইচ আর এক গেলাস দুধ বের করে টেবিলে রেখে দিয়ে আবার কাপড়টা হাতে নিলেন। নতুন একটুকরো বরফ বের করে কাপড়ে ভরে আবার চেপে ধরলেন কিশোরের কপালে। তিনি ধরে রাখলেন, কিশোর ওদিকে খেতে লাগলো।

রাতের খাবারের সময় দুশ্চিন্তা কিছুটা কমলো মেরিচাচীর। নিজেকে বোঝালেন, ওরকম অনেক ব্যথাই পায় ছেলেটা, ওগুলো যখন সেরেছে, এটাও সারবে। খাওয়ার পর বাসন-পেয়ালাগুলো সিংকে ভিজিয়ে রেখে চলে গেলেন মুখহাত ধুয়ে চুল আঁচড়াতে।

চেয়ারে বসে বসে মিনিটখানেক ভাবলো কিশোর। তারপর উঠলো চাচীর রেখে যাওয়া বাসন-পেয়ালাগুলো ধোয়ার জন্যে। ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রাখতে

লাগলো র‍্যাকে।

রাশেদ চাচা খেয়েই উঠে চলে গেছেন টেলিভিশন দেখতে। কিশোর যখন সেঘরে এলো, দেখলো, তিনি ঢুলছেন। টেলিভিশন চলছে, দেখার কেউ নেই। বন্ধ করলো না সে। চাচার খপ্পরে পড়ে পুরনো বাতিল মালের বয়ান শোনার আগ্রহ আপাতত তার নেই, পা টিপে টিপে এগোলো দরজার দিকে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে আরেকবার ফিরে তাকালো চাচার দিকে। নাক ডাকানো শুরু হয়ে গেছে তাঁর। নিঃশ্বাসের তালে তালে কাঁপছে বিশাল গোঁফের ডগা। মুচকি হাসলো সে।

মেইন গেট দিয়ে ঘুরে ইয়ার্ডের বেড়ার কাছে চলে এলো কিশোর। নানারকম ছবি আঁকা রয়েছে বেড়ায়। একজায়গায় দেখা গেল বাড়িতে আগুন লেগেছে। আর বসে বসে তাই দেখছে একটা কুকুর। কুকুরটার একটা চোখে আঙুল দিয়ে চাপ দিতেই বেড়ার তিনটে তক্তা সরে গেল। বেরিয়ে পড়লো একটা প্রবেশ পথ। এটার নামই রেখেছে সে, লাল কুকুর চার। জঞ্জালের নিচ দিয়ে চলে গেছে হেডকোয়ার্টারে ঢোকার পথ। সেপথে এসে উঠলো ট্রেলারের ছাতে, ছাতের ওপর দিয়েই নামার পথ। ঢুকে পড়লো ভেতরে।

ঘড়ি দেখলো। আটটা পঁয়তাল্লিশ। রবিন আর মুসার আসতে দেরি আছে। সারাদিনের ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবতে বসলো সে।

ন'টা পর্যন্ত অবশ্য অপেক্ষা করতে হলো না। দশ মিনিট আগেই এসে গেল দুই সহকারী গোয়েন্দা।

'কেস পাওয়া গেছে নাকি আরেকটা?' উজ্জ্বল হাসি হেসে জিজ্ঞেস করলো মুসা। কিশোরের কপালের ফোলাটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'ও, শুরুও করে দিয়েছো।'

'হেনরি কুপার আজ গায়েব হয়ে গেছে,' কিশোর জানালো।

'শুনেছি,' রবিন বললো। 'বোরিসকে বাজারে পাঠিয়েছিলেন মেরিচাচী। তার সাথে মা'র দেখা হয়েছে। মাকে বলেছে ও। ট্রাকটা ফেলে নাকি চলে গেছে?'

মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'এখনও অফিসের পাশে পড়ে আছে ওটা। কুপার গায়েব হয়েছে, ওদিকে কিছু লোকের আমদানী হয়েছে।'

'ওশনসাইড ইনের ওই মহিলার কথা বলছো তো?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

নাহ্, দু'জনের একজনকেও চমকে দেয়া গেল না, নিরাশই হলো কিশোর। বিড়বিড় করে বললো, 'দূর, রকি বীচ টাউনটা একেবারেই ছোটো!'

'অফিসার ম্যাকেনার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো আমার,' মুসা বললো। 'মহিলা নাকি দাবি করছে, সে কুপারের মেয়ে। আর সাথের ছেলেটা কুপারের নাতি। অসম্ভব! কুপারের মেয়ে, তার ওপর আবার নাতি, উঁহুঁ, থাকতেই পারে না।'

'কেন পারে না? ওই লোকেরও তো যৌবন ছিলো একসময়। বিয়ের বয়েস ছিলো। যাই হোক, মিসেস মরগান আর তার ছেলে ছাড়াও আরও দু'জন নতুন

লোক এসেছে রকি বীচে। হিলটপ হাউসে উঠেছে ওরা।'

'খাইছে!' পিঠ সোজা হয়ে গেল মুসার। 'হিলটপ হাউস! ওই ভূতের বাড়িতে কে আবার থাকতে এলো?'

'থাকবে কিনা জানি না, তবে উঠতে দেখেছি ওখানে। কাকতালীয় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে আজ সকালে ইয়ার্ডে। কুপার থাকতে থাকতে গাড়ি করে এসে ঢুকলো লোক দু'জন। হিলটপ হাউসটা কোথায় জিজ্ঞেস করলো। কুপারও দেখলো ওদেরকে, ওরা দেখলো কুপারকে।'

'চেনে নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

নিচের ঠোঁট ধরে একবার টান দিলো কিশোর। 'ঠিক বোঝা গেল না। ড্রাইভারটা নেমে এসে জানতে চাইলো। ওই সময় গাড়িতে বসে ছিলো টাকমাথা আরেকজন। কেমন যেন উত্তেজিত মনে হলো ওদেরকে। গাড়িতে ঢুকে বিদেশী ভাষায় কথা বললো, কিছু বুঝলাম না। কুপার দাঁড়িয়ে ছিলো একভাবে। লোকগুলো চলে যেতেই অসুস্থ হয়ে পড়লো সে। পানি চাইলো। আনতে গেলাম। ফিরে এসে দেখি, নেই।'

'ইয়ার্ডে যখন ঢুকেছে, তখন ভালো ছিলো?'

'পুরোপুরি। বললো, মেহমান আসছে, ওদের জন্যে খাট, চেয়ার কিনতে এসেছে। কিন্তু লোকগুলো এসে হিলটপ হাউসের ঠিকানা চাইতেই কেমন যেন হয়ে গেল সে...'

'তারপরই গায়েব?'

'হ্যাঁ। হেঁটে চলে গেছে। আমার অবাক লাগছে আরেকটা ব্যাপারে, লোকগুলোকে দেখেই গলার মেডেলটাকে চেপে ধরলো কেন? অভ্যাস বসে লোকে জামার বোতামে হাত দেয়, ধরে মোচড়ায়, সেরকমই কিছু? নাকি লুকাতে চেয়েছিলো ওটা?'

'ঈগলটার কথা বলছো?'

'হ্যাঁ, দুই মাথা ঈগল। কুপারের তৈরি একটা অদ্ভুত ডিজাইন হতে পারে ওটা। আবার কোনো সিমবলও হতে পারে, লোকগুলোর কাছে যার বিশেষ অর্থ আছে।'

'চিহ্ন? সংকেত?' মুসা বললো।

'কিংবা টিকলি,' বললো রবিন। 'কল্পিত কিংবা বাস্তব প্রাণীর টিকলি তৈরি করে গলায় পরে অনেক ইউরোপিয়ান। এই যেমন, সিংহ, বাজপাখি, ইউনিকর্ন...'

'খোঁজ করবে নাকি একবার?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'ওর ঈগলটার চেহারা মনে আছে তোমার?'

মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'আছে। টিকলির ওপর একটা নতুন বই এসেছে লাইব্রেরিতে। দেখতে পারি।'

'গুড।' মুসার দিকে ফিরলো কিশোর। 'মিস্টার ডারবির সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার?'

'রিয়াল এস্টেটের ব্যবসা করেন, উঁনি তো? ভালো করেই চিনি। ক'বার তাঁর লনের ঘাস কেটে দিলাম। ভদ্রলোকের সময় খুব কম, নিজে কাটার সময় পান না।'

'রকি বীচে রিয়াল এস্টেট এজেন্সী একমাত্র তাঁরই আছে। হিলটপ হাউসে যারাই আসুক, তাঁকে না জানিয়ে আসতে পারবে না। কেন এসেছে তা-ও হয়তো জানতে পারেন।'

'ঠিক আছে দেখা করবো। পারলে কালই। রোববারেও অফিস খোলা রাখে।'

'ফাইন। আমার বিশ্বাস, মেরিচাচী কাল ওশনসাইড ইনে যেতে চাইবে, মিসেস মরগানের সঙ্গে দেখা করার জন্যে। গেলে আমিও যাবো তার সঙ্গে। ফোর্ডে করে সেই নতুন মাছ শিকারী আসে কিনা খেয়াল রাখবো।'

'আরেকজন আগন্তুক?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

শ্রাগ করলো কিশোর। 'হয়তো। কিংবা হয়তো লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে একদিনের জন্যে এসেছিলো মাছ ধরতে। চলে গেছে আবার। তবে যদি রকি বীচেই এসে থাকে, আর হিলটপ হাউসটা ভাড়া হয়ে থাকে, তাহলে আমরা জানবো এখানে একই দিনে পাঁচজন নতুন লোকের আগমন ঘটেছে। এবং তাদেরই একজন ঢুকেছিলো কুপারের বাড়িতে; ঢুকে ড্রয়ারের তালা ভেঙেছে।'

পাঁচ

'এই, তোর শাদা শার্টটা গায়ে দে,' মেরিচাচী বললেন, 'আর নীল ব্লেজারটা।'

'এই গরমের মধ্যে?'

'দে, গায়ে দে। একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস, কাপড়চোপড়গুলো একটু ঠিকঠাক হওয়া দরকার। এজন্যেই তো চোর বলে।'

এরপর আর তর্ক করার মানসিকতা রইলো না কিশোরের, করে লাভও হবে না, জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে আবার ওপরতলায় চললো সে, কাপড় পরতে। মিনিটখানেক যেতে না যেতেই ডাক শোনা গেল, 'এই কিশোর, তোর হলো?'

'আসছি।'

মেরিচাচী বেশ সাজগোজ করেছেন। হেসে বললো কিশোর, 'বাহ্, দারুণ লাগছে তো! তুমি সব সময় সেজে থাকতে পারো না, চাচী?'

'সময় কই? আর তোর চাচা ওসব দেখেও না। চল, যাই।'

রোববারের বিকেল। কাজকর্ম নেই হাতে। হলঘরে অলস ভঙ্গিতে বসে টিভি দেখছেন আর কফি খাচ্ছেন রাশেদ পাশা। ভাতিজা আর স্ত্রীকে দেখে বলে উঠলেন, 'আরি, ব্যাপারটা কি? সাজগোজের এমন বাহার। তা কোথায় যাওয়া হচ্ছে? বিয়ের দাওয়াত-টাওয়াত আছে নাকি?'

'কেন, বিয়ের দাওয়াত না থাকলে কি সাজা যায় না?' মুখ ঝামটা দিলেন চাচী।

'না না, তা যাবে না কেন? সাজতে দেখি না তো, তাই। সারাক্ষণই তো ওই এক জিনসের প্যান্ট আর শার্ট...'

'তো আর কি পরবো? স্কার্ট পরে কি কাজ করা যায়?' কিশোরের হাত ধরে টানলেন মেরিচাচী। 'এই কিশোর, আয়।'

হাইওয়ে ধরে হেঁটে চলেছে দু'জনে। একসময় দক্ষিণে মোড় নিলো। সকাল থেকেই কুয়াশা পড়ছে। আচমকা একটা জোরালো বাতাস এসে এই এতোক্ষণ পর উড়িয়ে নিয়ে গেল কুয়াশা। রোদে চকমক করে উঠলো সাগর। রাস্তায় লোক চলাচল খুব কম, বিশেষ করে পথচারীদের। তবে গাড়ির ভিড় বাড়ছে। রকি বীচ বেকারিটা পার হয়ে ওশনসাইড ইনের কাছে চলে এলো কিশোররা।

'জায়গাটার বেশ যত্নআত্তি করে মিস হবসন,' সরাইখানাটার কথা বললেন মেরিচাচী। রাস্তা পেরোতে গিয়েই থমকে গেলেন। একটা বুইক গাড়ি ছুটে আসছে। জ্বলন্ত চোখে ওটার দিকে তাকালেন তিনি। ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষলো ড্রাইভার। তাড়াতাড়ি ওটার সামনে দিয়ে পার হয়ে গেলেন চাচী, পিছে পিছে কিশোর।

সরাইখানায় ঢুকে বেল বাজিয়ে মিস হবসনকে ডাকলেন তিনি।

ডেস্কের ওপাশের একটা দরজা খুলে গেল। উঁকি দিলেন এক মহিলা। মাথার চুল শাদা হয়ে গেছে। মেরিচাচীকে দেখেই আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে, মেরি যে! ভুল দেখছি না তো!' হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন মহিলা। নিশ্চয় মুরগীর মাংস রান্না করছিলেন, তাঁর গায়ে গন্ধ পেলো কিশোর। কিশোরের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ছেলেকেও নিয়ে এসেছো। কেমন আছিস রে?'

'ভালো,' ঘাড় কাত করে জবাব দিলো কিশোর।

আরও দু'চারটা কথার পর মেরিচাচী বললেন, 'শুনলাম মিসেস মরগান আর তার ছেলে নাকি আপনার এখানেই উঠেছে।'

'ঠিকই শুনেছো। বেচারী! কাল তো যখন এসে উঠলো, একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থা। চীফ ফ্লেচারও দেখা করতে এসেছিলো। এই সরাইখানার মধ্যে! কল্পনা করতে পারো!'

চোর-ডাকাত ধরে রকি বীচকে অপরাধমুক্ত রাখুক পুলিশ, তাতে কোনো আপত্তি নেই মিস হবসনের, কিন্তু তাঁর ছোট্ট সরাইখানায় তাদের আগমন ঘটবে,

এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।

জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে একটা বিচিত্র শব্দ করে মেরিচাচী বুঝিয়ে দিলেন, তিনি মিস হবসনের মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মরগানের কথা। সরাইয়ের পেছনের অংশের একটা ছোট চত্বর দেখিয়ে মিস হবসন বললেন, 'ওদিকের ঘরে উঠেছে। ওদের মন ভালো করার চেষ্টা করছেন মিস্টার নিমেরো।'

'মিস্টার নিমেরো'?' প্রতিধ্বনি করলো যেন কিশোর।

'আমার একজন গেস্ট। চমৎকার লোক। মিসেস মরগানের ব্যাপারে বেশ আগ্রহী। ভালো লোক, তাই না? আজকের দিনে তো কেউ কারো জন্যে ভাবে না। তবে, মিসেস মরগান বেশ সুন্দরী,' শেষ কথাটা বলে বোধহয় একটা বিশেষ ইঙ্গিত করতে চাইলেন মিস হবসন।

'হ্যাঁ, চেহারা সুন্দর হলে বেশ কাজেই লাগে,' মেরিচাচী বললেন।

অফিস থেকে বেরিয়ে কিশোরকে নিয়ে বারান্দা ধরে হেঁটে চললেন তিনি। বারান্দার পাশের দরজাগুলোয় ঘরের নম্বর দেয়া। সেগুলো পার হয়ে এসে পড়লেন ছোট চত্বরটায়। তার ওপাশের ঘরটার মুখ সাগরের দিকে ফেরানো।

ছোট একটা গোল টেবিল ঘিরে বসেছে তিনজন মানুষ–মিসেস মরগান, তার ছেলে ডরি, আর সেই মাছশিকারী, আগের দিন যাকে দেখেছে কিশোর। আগের দিনের চেয়েও ভালো পোশাক পরেছে ভদ্রলোক, আর সাজগোজের কি বাহার! সে-ই নিশ্চয় মিস্টার নিমেরো। হলিউডের গল্প শোনাচ্ছে মিসেস মরগান আর তার ছেলেকে।

এলিজার চোখ দেখেই বুঝলো কিশোর, এই গল্পে মোটেও 'মন ভালো' হচ্ছে না মহিলার, আরও খারাপ হচ্ছে, প্রচণ্ড বিরক্তি চোখের তারায়। কিশোর আর মেরিচাচীকে দেখে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

'আইই!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো ডরি। সে-ও বিরক্ত হয়ে গেছে, বোঝা গেল। আরও দুটো চেয়ার আনতে ছুটলো।

'মিসেস মরগান,' পরিচয় করিয়ে দিলো কিশোর, 'আমার চাচী…'

এগিয়ে গিয়ে এলিজার হাত ধরলেন মেরিচাচী, 'আমি মিসেস মারিয়া পাশা। আপনাকে বলতে এলাম, আমার কিশোর চোর নয়। আর যে কারণেই হোক, চুরি করার জন্যে ঢোকেনি মিস্টার কুপারের ঘরে।'

চেয়ার পেতে দিলো ডরি। তাতে বসলেন মেরিচাচী।

ক্লান্ত হাসি ফুটলো এলিজার ঠোঁটে। 'না না, এখন আর চোর ভাবছি না। আসলে কাল এতো বেশি ধকল গিয়েছিলো শরীরের ওপর দিয়ে…সেই অ্যারিজোনা থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছি আব্বাকে দেখার জন্যে।' টেবিলে রাখা একটা কাগজের কাপ আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করছে এলিজা। 'আব্বা যখন চলে আসে,

আমি তখন খুব ছোট, শিশু। তখনকার কথা কিছুই মনে নেই, আব্বাকে দেখে থাকলেও তার চেহারা মনে নেই। উফ্, কতো বছর পর এলাম দেখতে, আর এসে দেখি কিনা নেই! মনের অবস্থা বুঝতেই পারছো,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললো সে। 'তাছাড়া জানালা দিয়ে বেরোতে দেখলাম তোমাকে, চোর ভাবাটা কি ভুল হয়েছে?'

'না, ঠিকই হয়েছে,' কিশোর বললো। 'আমি হলেও সন্দেহ করতাম।'

কিছু পয়সা বের করে নিয়ে কোকাকোলা কিনে আনতে রওনা হলো ডরি।

'তারপর এসে পুলিশ শুরু করলো হেনস্তা,' এলিজা বললো। 'মনটা এতো খারাপ হয়ে গেল না, কি বলবো। কাল রাতে ঘুমাতে পারিনি।'

বিড়বিড় করে মিস্টার নিমেরো বললো, 'এতো যন্ত্রণা দিলে ঘুম কি আর আসে?' টেবিলে রাখা এলিজার হাতটা ছোঁয়ার জন্যে হাত বাড়ালো সে, তাড়াতাড়ি টেবিলের নিচে সরিয়ে নিলো এলিজা। 'ইনি মিস্টার নিমেরো,' লোকটার দিকে তাকালো না সে। 'মিস্টার নিমেরো, উনি মিসেস পাশা। আর ও কিশোর পাশা।'

'কিশোরের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার,' আন্তরিকতার সুরে বললো নিমেরো। 'ব্যথাটা এখন কেমন, কিশোর?'

'ভালো। থ্যাংক ইউ।'

'সতর্ক থাকতে হয় মানুষকে,' উপদেশ দিতে আরম্ভ করলো নিমেরো। 'ভাগ্যিস জোরে লাগেনি। মাথা ফেটে যেতে পারতো। তবে আমারও ওরকম হয়েছিলো একবার। কায়রোতে যখন ছিলাম, নিশ্চয় গিয়েছেন আপনি...' মেরিচাচীর দিকে চেয়ে বললো সে।

'জীবনেও না!' কাটা জবাব দিয়ে দিলেন মেরিচাচী। তাঁদের কথার মাঝে উটকো একটা লোক নাক গলাবে, মোটেও সহ্য করতে পারছেন না তিনি।

চুপ হয়ে গেল নিমেরো।

'মিসেস মরগান, এখন কি করবেন, ভেবেছেন?' মেরিচাচী জিজ্ঞেস করলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো এলিজা। 'যা-ই করি, আব্বার সঙ্গে দেখা না করে বেলিভিউতে ফিরছি না। আব্বার একটা চিঠি আছে আমার কাছে। গরমের সময়টা এখানে কাটানোর জন্যে আসতে বলেছিলো। আজ সকালে চীফকে দেখিয়েছি সেটা। আব্বার প্যাডে লেখা চিঠি, চীফ বিশ্বাস করেছেন যে আমি সত্যি কথাই বলছি। বলেছেন, আঙুলের ছাপটাপ নেয়া হয়ে গেলে আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়া হবে।'

'ঢুকবেন?'

'আর উপায় কি? আসতে অনেক খরচ হয়েছে। সরাইখানায় থাকারও অনেক খরচ. ক'দিন আর থাকতে পারবো। তাছাড়া এখানকার খাবার একটুও

পছন্দ হচ্ছে না ডরির। আচ্ছা মিসেস পাশা, পুলিশ আব্বাকে খুঁজে বের করছে না কেন?'

নড়েচড়ে বসলো কিশোর। 'লাভ হবে না, মিসেস মরগান। মিস্টার কুপার ইচ্ছে করে নিখোঁজ হয়েছেন, তাঁকে খুঁজতেই বা যাবে কেন পুলিশ? তাছাড়া এখানকার পাহাড়ে এতো বেশি লুকানোর জায়গা আছে, একবার কেউ লুকিয়ে পড়লে তাকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব। যেখানে খুশি লুকিয়ে পড়তে পারেন আপনার আব্বা। পায়ে জুতো নেই তার, তার পরেও...'

'খালি পায়ে গেছে!'

দীর্ঘ একটা অস্বস্তিকর নীরব মুহূর্ত কাটলো। তারপর মেরিচাচী বললেন, 'আপনি জানেন না?'

'কি জানবো? জুতো ফেলে গেছে নাকি?'

'জুতো কখনো পরেনই না মিস্টার কুপার।'

'যাহ্, জোক করছেন।'

'মোটেই না।' গম্ভীর হয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিলেন মেরিচাচী, যে তিনি মজা করছেন না। 'মিস্টার কুপার জুতো পরেন না। সব সময় খালি পায়ে থাকেন, গায়ে দেন একটা শাদা আলখেল্লা।' মেয়ের সামনে বাবার চেহারার বর্ণনা দিতে দ্বিধা হলো তাঁর, তবু বললেন, 'মাথায় এলোমেলো লম্বা শাদা চুল, গালে লম্বা দাড়ি, খালি আঁচড়ান।'

ড্রিংকস নিয়ে ফিরে এলো ডরি। মেরিচাচী আর কিশোরকে দিয়ে বললো, 'শুনে মনে হচ্ছে একেবারে পয়গম্বর সেজে থাকে।'

এলিজা বললো, 'ভীষণ খামখেয়ালি মানুষ তো, তাই।'

'খামখেয়ালি লোক এশহরে অনেক আছে,' কিশোর বললো, 'মিস্টার কুপার একলা নন।'

ড্রিংকস খাওয়ার একটা স্ট্র টেবিল থেকে তুলে নিয়ে দুই হাতের তালুতে পাকাতে শুরু করলো এলিজা। 'বুঝলাম, এ-জন্যেই কখনও ছবি পাঠায়নি আব্বা। আমি আসতে চাওয়ায় বোধহয় অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিলো। বলতে গেলে অনেকটা জোর করেই এসেছি আমি, তাকে রাজি করিয়েছি আমাকে জায়গা দিতে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর থাকতে পারেনি, আমার সাথে দেখা হওয়ার ভয়ে পালিয়েছে। যাক। পালিয়ে আর কদ্দিন? আসতে তাকে হবেই। আমি দেখা না করে যাচ্ছি না।'

'ঠিক বলেছো, আম্মা,' ডরি একাত্মতা ঘোষণা করলো মায়ের সঙ্গে।

'কাজেই, আমি আর সময় নষ্ট করছি না,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো এলিজা। 'ডরি, মিস হবসনকে গিয়ে বল আজই হোটেল ছেড়ে দেবো আমরা। পুলিশ চীফকে ফোন করে জিজ্ঞেস করবি, ওদের কাজ হয়েছে কিনা।'

'কাজটা কি ঠিক করছেন?' মোলায়েম গলায় বললো কিশোর। 'ভালো করে ভেবে নিন। আমি কাল মিস্টার কুপারের অফিসে ড্রয়ার ভাঙতে ঢুকিনি বটে, তবে আরেকজন ঢুকেছে। আর কপালের ফোলাটা আমার এখনও আছে।'

উঠে দাঁড়ালো এলিজা। 'সাবধান থাকবো আমি। আবার ঢোকার দুঃসাহস যে-ই দেখাক, কপালে খারাবি আছে তার। পিস্তল-বন্দুক ভালো লাগে না আমার, তবে বেসবল ভালো লাগে। সাথে করে ব্যাটও এনেছি একটা।'

প্রশংসার দৃষ্টিতে এলিজার দিকে তাকালেন মেরিচাচী। 'খুব ভালো করেছেন। আমার মাথায় কিন্তু কোনোদিন ঢোকেনি বুদ্ধিটা। ক্লোজরেঞ্জে পিস্তলের চেয়ে অনেক সুবিধে হবে বেসবল ব্যাট দিয়ে।'

হাসিটা অনেক কষ্টে চাপলো কিশোর। কারণ, ব্যাটেরও দরকার নেই তার মেরিচাচীর। চোর-ডাকাত যদি বাই চান্স ঢুকে পড়ে ইয়ার্ডে, আর কপাল খারাপের কারণে তাঁর সামনে পড়ে যায়, তাহলে ঝাড়ুই যথেষ্ট। ঝাঁটাপেটা হয়ে হাসপাতালে না যাক, ইয়ার্ডের ত্রিসীমানায় ঘেঁষার যে আর সাহস করবে না কোনোদিন বাছাধন, তাতে কিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

মেরিচাচীও উঠে দাঁড়ালেন। 'বাবার বাড়িতে থাকতে হলে আসবাব লাগবে আপনার। খাট আর চেয়ার কিনে ফেলে গেছেন মিস্টার কুপার। আপনি যান, আধ ঘন্টার মধ্যেই ওগুলো নিয়ে আসছি।'

'খুব ভালো হয় তাহলে। আপনাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি।'

'আরে না না কষ্ট কিসের। মাল পৌঁছে দেয়া তো আমাদের দায়িত্ব। আয়, কিশোর।' দরজার কাছে এসে হঠাৎ যেন মনে পড়লো মেরিচাচীর, ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'গুড আফটারনুন, মিস্টার নিমেরো।'

পথ চলতে চলতে হেসে বললো কিশোর, 'চাচী, ওরকম অপদস্থ নিশ্চয় জিন্দেগীতে হয়নি লোকটা। আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছো।'

'একটা রামছাগল! মেয়েটাকে কি রকম বিরক্ত করছিলো দেখেছিস? হায়রে পুরুষমানুষ!'

রাশেদ পাশাও পুরুষমানুষ। কাজেই রাগটা গিয়ে পড়লো যেন তাঁরই ওপর। দুপদাপ করে ঘরে ঢুকে তন্দ্রা থেকে ফিরিয়ে আনলেন তাঁকে মেরিচাচী। রাশেদ পাশা তারপর বোরিস আর রোভারকে ডেকে বললেন স্যালভিজ ইয়ার্ডের ট্রাকে কুপারের মালগুলো তুলে দিতে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই তোলা হয়ে গেল। কুপার কেনার সময় পাননি বটে, কিন্তু মেরিচাচী দিতে ভুললেন না, গোটা দুই চেস্ট অভ ড্রয়ার তিনি নিজে পছন্দ করে ট্রাকে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। বললেন, 'মেয়ে এসেছে, জিনিসপত্র রাখবে কোথায়? কুপারটা তো একটা ছন্নছাড়া।'

বোরিস আর কিশোর মিলে ফ্রিজ থেকে কুপারের খাবারগুলো বের করে নিয়ে এলো। তারপর মেরিচাচীর সঙ্গে গাদাগাদি করে উঠে বসলো ট্রাকের

সামনের কেবিনে। ড্রাইভিং সীটে বসেছে বোরিস। মেরিচাচীর নির্দেশে গাড়ি চালালো কুপারের বাড়ির উদ্দেশে।

কুপার যে ছাউনিতে রসদ রাখে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল এলিজার নীল কনভারটিবলটাকে। রাস্তা থেকেই দেখা গেল, দুটো স্যুটকেস বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ডরি। চত্বরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মা। তার খাটো চুল ফুড়ফুড় করে কাঁপছে বাতাসে।

'সব ঠিকঠাক আছে তো?' ডেকে জিজ্ঞেস করলেন মেরিচাচী।

'আছে। তবে আঙুলের ছাপ তোলার জন্যে অনেক পাউডার ছিটিয়েছে পুলিশ, নোংরা করে রেখে গেছে। পরিষ্কার করতে হবে। কোটিখানেক চীনামাটির জিনিস ছাড়া আর তো কিছু দেখছি না ঘরে। সাফ করতে অসুবিধে হবে না।'

'আসবাব দিয়ে ঘর ভর্তি করার পক্ষপাতী নন মিস্টার কুপার,' কিশোর বললো। 'প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস রাখেন না।'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো এলিজা। 'আব্বার স্বভাব ভালোই জানো দেখেছি তুমি।'

'লোকের সঙ্গে মেলামেশা খুব বেশি ওর,' মেরিচাচী বললেন। 'আর একবার কোনো জিনিস দেখলে ভোলে না।' স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালেন কিশোরের দিকে।

বোরিস আর কিশোর মিলে মাল নামাতে শুরু করলো। নামাতে নামাতেই কিশোরের চোখে পড়লো সেই দু'জন, যারা আগের দিন হিলটপ হাউসের খোঁজ করেছিলো। একবার কুপারদের বাড়ির দিকে তাকিয়েই সৈকতের পথ ধরে চলে গেল ওরা।

মাল নামানোয় হাত লাগালো এসে ডরি। কিশোরকে জিজ্ঞেস করলো, 'ওরা কারা? আমাদের পড়শী?'

'শিওর না। শহরে নতুন এসেছে।'

খাটের একমাথা ধরলো ডরি, আরেক মাথা কিশোর। 'কাপড় দেখলে?' ডরি বললো। 'ওরকম পোশাক পরে সৈকতে হাঁটতে যায় কেউ?'

'কেউ না গেলেও ওরা গেল।' কিশোরের মনে পড়লো নিমেরোর পোশাকের কথা, মাছশিকারী হিসেবে একেবারে বেমানান পোশাক পরেছিলো।

ঘরে ঢুকলো কিশোর। এলিজা ঠিকই বলেছে। ঘরটাকে নোংরা করে দিয়ে গেছে পুলিশ।

কুপারের বাড়িটা গোলাঘরের চেয়ে সামান্য উন্নত। নিচতলায় মোট চারটে ঘর। গোসল করার জন্যে পুরনো ধাঁচের একটা বাথটাব রয়েছে। একটা বেডরুমে একটা বিছানা পাতা, এতোই সরু, বাংক বললেও ভুল হবে না। তবে বেশ ছিমছাম করে বিছানা পাতা, শাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। পাশে একটা ছোট বেডসাইড টেবিল. তাতে রাখা একটা টেবিল ল্যাম্প আর একটা ঘড়ি। শাদা রঙ

করা তিন ড্রয়ারের একটা খুদে সিন্দুকও রয়েছে। বাকি তিনটে ঘর খালি।

'এটাতে থাকতে চাও, আম্মা?' সামনের ঘরের দরজায় উঁকি দিয়ে জিজ্ঞেস করলো ডরি।

'থাকলেই হলো একটাতে।'

'এটাতে ফায়ারপ্লেস আছে। বাপরে বাপ্, দেখো এসে কি বানিয়েছে!'

জিনিসটার দিকে কিশোরও তাকিয়ে রয়েছে। ফায়ারপ্লেসের কিনার ঘেঁষে রাখা বিশাল এক চীনামাটির ফলক। এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত আড়াআড়ি মাপলে পাঁচ ফুটের কম হবে না। তাতে খোদাই করা একটা ছবি।

'দুই মাথা ঈগল!' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। জোরে বললে যেন উড়ে যাবে পাখিটা।

লাল রঙের পাখিটার দিকে তাকিয়ে ডরি জিজ্ঞেস করলো, 'চেনো নাকি? পুরনো বন্ধু?'

'পুরনো বন্ধু বোধহয় তোমার নানার। ওরকম ডিজাইনের একটা মেডেল সারাক্ষণ গলায় পরে থাকেন। আরও অনেক জায়গায় এই ঈগলের ছবি এঁকেছেন। সামনের সিঁড়িতে কলস দুটো দেখেছো? তাতেও ঈগল আঁকা, খেয়াল করোনি?'

'না। মাল নামাতে ব্যস্ত ছিলাম।'

সিঁড়িতে মেরিচাচীর জুতোর শব্দ হলো। কিশোরকে দেখে বললেন, 'ম্যাট্রেস তো আনলাম। এই কিশোর, চাদর-টাদর আছে নাকি ঘরে, দেখ তো।'

'আছে, আমি দেখেছি,' ডরি বললো। 'আনকোরা নতুন। প্যাকেটের মধ্যেই রয়েছে এখনও।'

'যাক, আছে তাহলে। তোমাদের জন্যেই কিনে এনেছে মনে হয়।' ঠেলে একটা জানালা খুলে ফেললেন মেরিচাচী। মুখ বের করে ডাকলেন, 'বোরিস, দেখে যাও।'

'আসছি,' বোরিসের জবাব শোনা গেল। একটা ম্যাট্রেস মাথায় নিয়ে ঢুকলো সে।

'জানালা-টানালাগুলো খুলে ঘরটা একটু পরিষ্কার করা দরকার,' মেরিচাচী বললেন।

'দাঁড়ান, আগে মালগুলো আনা শেষ করি,' বোরিস বললো।

কুপার যে খাবারও অনেক কিনেছে, সেকথা এলিজাকে জানালেন মেরিচাচী। ট্রাক থেকে সেগুলো নামিয়ে আনতে গেল মহিলা। দুটো ব্যাগ দু'হাতে নিয়ে ফিরে এলো। সোজা চললো রান্নাঘরের দিকে। যেতে যেতে বললো, 'আমাদের জন্যেই কিনেছিলো আব্বা। যাক, না খেয়ে মরবো না।'

কিশোরও একটা প্যাকেট নামিয়ে এনেছে। সেটা নিয়ে চলেছে এলিজার

পেছনে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল মহিলা। আরেকটু হলেই তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিলো কিশোর।

হাত থেকে ব্যাগ খসে গেল মহিলার। তারপর শুরু হলো চিৎকার।

এলিজার পাশ কাটিয়ে লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল কিশোর। কি দেখে চিৎকার করেছে দেখার জন্যে। ভাঁড়ারের দরজার কাছে আগুনের তিনটে অদ্ভুত সবুজ শিখা লাফিয়ে উঠেছে, দপদপ করে জ্বলছে।

'কি হয়েছে, কি হয়েছে?' বলতে বলতে ছুটে এলেন মেরিচাচী। তাঁর পেছনে এলো বোরিস।

স্তব্ধ হয়ে দেখছে কিশোর। এলিজাও চুপ, চিৎকার থেমে গেছে। দুজনেই তাকিয়ে রয়েছে ভূতুড়ে আগুনগুলোর দিকে।

'হায় আল্লাহ্!' দম বন্ধ করে ফেললেন মেরিচাচী।

আস্তে আস্তে নিচু হয়ে গেল আগুনের শিখা। দপদপ করলো কয়েকবার, শক্তি কমে এসেছে। নিবে গেল একসময়। সামান্যতম ধোঁয়া দেখা গেল না।

'ঘটনাটা কি?' ডরিও দেখেছে ব্যাপারটা, আর সবার মতোই অবাক হয়েছে।

রান্নাঘরের ভেতরে ঢুকলো ডরি, কিশোর আর বোরিস। যেখানে আগুন জ্বলছিলো খানিক আগে তার কাছে এসে দাঁড়ালো। কুসংস্কার খুব বিশ্বাস করে বোরিস। বুকে ক্রুশ আঁকলো সে আঙুল দিয়ে। তারপর বিড়বিড় করে বললো, 'কুপার! কুপার ছাড়া আর কেউ না! মরে ভূত হয়ে গিয়েছে! এখন এসেছে ঘরে যারা থাকবে তাদের জ্বালাতে!'

'অসম্ভব!' বললো বটে কিশোর, কিন্তু কোনো যুক্তিও দেখাতে পারলো না।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তিনটে পায়ের ছাপ, খালি পায়ের।

ছয়

পুলিশকে ফোন করতে পাঠানো হলো বোরিসকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল পুলিশ। তলকুঠুরী থেকে শুরু করে চিলেকোঠা পর্যন্ত কোনো জায়গাই বাদ দিলো না ওরা। কিন্তু কিছুই পেলো না। আগুন লাগার কারণ বুঝতে পারলো না। পায়ের ছাপগুলো কোথা থেকে এলো তা-ও বোঝা গেল না।

পায়ের ছাপগুলো মেপে দেখলো অফিসার ম্যাকেনা। মেঝেতে যেখানে আগুন লেগেছে সেখানে কিছু কাপড় পোড়া ছাই পড়ে আছে, ওই কাপড়কে বলে লিনোলিয়াম। খানিকটা ছাই তুলে নিয়ে একটা খামে ভরে পকেটে রাখলো সে। তারপর শীতল দৃষ্টিতে তাকালো কিশোরের দিকে। 'নিশ্চয় কিছু জানো তুমি, এবং

সেটা লুকাচ্ছো পুলিশের কাছে…'

বাধা দিলেন মেরিচাচী, 'আশ্চর্য কথা। কিশোর জানবে কি করে? সারাটা দিন আমার সঙ্গে ছিলো। আগুন লাগার সময়ও রান্নাঘরে ছিলো না, মিসেস মরগানকে সাহায্য করছিলো ট্রাক থেকে খাবার নামিয়ে আনতে।'

'তাই নাকি। অদ্ভুত কিছু ঘটলেই তার কাছাকাছি দেখা যায় কিনা ওকে, তাই বললাম। ঠিক আছে, না জানলে নেই।'

এলিজার দিকে তাকালো অফিসার। 'আপনার জায়গায় আমি হলে এখুনি পালাতাম এখান থেকে, সরাইয়ে গিয়ে উঠতাম।'

কাঁদতে বসে গেল এলিজা। ম্যাকেনার ওপর রেগে গেলেন মেরিচাচী, কিছু বললেন না। কেটলিতে করে চুলায় চায়ের পানি চাপালেন। তিনি বিশ্বাস করেন, অনেক সমস্যাই আসে জীবনে যেগুলো দূর করতে এক কাপ ভালো চায়ের জুড়ি নেই।

পুলিশ চলে গেল। বাইরে বেরিয়ে এলো কিশোর আর ডরি। বসলো সিঁড়ির ওপর, দুটো কলস যেখানে রাখা আছে।

'বোরিসের কথা মানতে আমার আপত্তি নেই,' ডরি বললো। 'আমার নানা মারা গেছে, আর তার…'

'ভূত বিশ্বাস করি না আমি,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো কিশোর। 'তোমারও করা উচিত নয়। আর বেঁচে থেকেও এসে তোমাদেরকে ভয় দেখিয়ে তাড়াবেন কুপার, এটাও হয় না। তোমাদেরকে আসতে বলেছেন তিনি, জিনিসপত্র কিনেছেন থাকার ব্যবস্থা করতে, তারপর এরকম করবেন এটা হতেই পারে না।'

'সত্যি কথা বলবো? আমি ভয় পাচ্ছি। নানা যদি মারা না-ই গিয়ে থাকে, কোথায় আছে এখন?'

'সম্ভবত পাহাড়ে।'

'কিন্তু কেন?'

'অনেক কারণই থাকতে পারে। তোমার নানার সম্পর্কে কতোটা জানো?'

'বেশি কিছু না,' স্বীকার করলো ডরি। 'শুধু মায়ের মুখে যা শুনেছি, ব্যস। আম্মাও বেশি কিছু জানে না। একটা কথা অবশ্য জানি, নানার আসল নাম কুপার নয়।'

'তাই?' আগ্রহী হয়ে উঠলো কিশোর। 'একথাটা কেন যেন বহুবার মনে হয়েছে আমার। কাকতালীয়ই বলতে পারো।'

'অনেক দিন আগে আমেরিকায় এসেছে নানা,' ডরি জানালো। 'চল্লিশের দশকে। বাড়ি ইউক্রেইনে। আমেরিকায় এসে সিরামিক নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে, নাইট ইস্কুলে, তখনই আমার নানীর সঙ্গে দেখা হয়। সে মিসেস…কি-যেন-নামটা, যাই হোক, ইউক্রেনিয়ান হতে চায়নি, তাই নানা নতুন আর সহজ নাম

রেখেছে, হেনরি কুপার।'

'কোন শহরে দেখা হয়েছিলো তোমার নানীর সঙ্গে?'

'নিউ ইয়র্কে।'

'নিউ ইয়র্কের মেয়ে?'

'না। জন্ম বেলিভিউতে, আমাদের মতো। নিউ ইয়র্কে গিয়েছিলো কাজ করতে। কাপড়ের ডিজাইন করতো। তারপর তার দেখা হলো এই দিমিত্রি-কি-যেন, তার সঙ্গে, মানে আমার নানার সঙ্গে। তাকে বিয়ে করে বসলো নানা। তখন নিশ্চয় এখনকার মতো শাদা আলখেল্লা পরতো না সে। তাহলে সহ্য করতো না নানী। পোশাকের ডিজাইনার, তার ওপর আমেরিকান মহিলা, ওরকম খাপছাড়া পোশাক কি আর পছন্দ করে?'

'তোমার নানীর কথা মনে আছে তোমার?'

'অল্প অল্প। আমি ছোট থাকতেই মারা গেছে। নিউমোনিয়ায়। একজন পোশাকের কারিগর, আরেকজন চীনামাটির, কিন্তু যদ্দূর জানি, দু'জনে মিলেও রোজগার তেমন ভালো করতে পারেনি শুরুতে। এর কারণ নাকি নানা। ছোট একটা দোকান দিয়েছিলো, কাজও খুব ভালো পারতো, কিন্তু সব সময়ই নাকি নার্ভাস হয়ে থাকতো, কাজে মন বসাতে পারতো না, কিসের ভয় পেতো কে জানে। প্রতিটি দরজায় অন্তত তিনটি করে তাঁলা না লাগিয়ে ঘুমাতে যেতো না। এসব নিয়ে খটমট লেগে যায় নানীর সঙ্গে। তাছাড়া সারাক্ষণ কাদা আর কেমিক্যালের গন্ধ সইতে পারতো না নানী। শেষে একদিন আলাদা হয়ে গেল দু'জনে। আমার মা তখন নানীর পেটে। তাকে নিয়েই বেলিভিউতে ফিরে গেল নানী, নানার কাছে আর কখনও ফিরে যায়নি।'

'কখনও না?'

'না। একবার বোধহয় দেখতে গিয়েছিলো নানা, আমার মা তখন জন্মেছে। তবে নানী কখনও নানার কাছে যায়নি।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। কুপারের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভেবে খারাপই লাগছে তার। সাগর পাড়ে এতগুলো বছর একলা কাটালো কি করে লোকটা!

'নানা কিন্তু নানীকে কখনও ভোলেনি,' ডরি বললো। 'প্রতিমাসে নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছে। অবশ্যই আমার মায়ের খরচ। তারপর আমার মা-ও বড় হলো একদিন, বিয়ে করলো, সেই বিয়েতে দারুণ একটা টী সেট পাঠিয়েছিলো নানা, উপহার। নানীর কাছে চিঠি লিখতো নানা, খোঁজখবর নিতো। নানী মারা গেলে আমার কাছে লিখতো। ক'দিন আগেই লিখেছে।'

'তোমার আব্বা?'

'ও, আব্বা খুব ভালো লোক,' শ্রদ্ধা ফুটলো ডরির চোখে। 'বেলিভিউতে

একটা হার্ডওয়্যারের দোকান আছে আমাদের। আমাকে নিয়ে আম্মা এখানে আসার ব্যাপারে মত ছিলো না তার, তবে অমতও করেনি।'

'তোমার নানা ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে এলো কেন, জানো কিছু?'

'সম্ভবত আবহাওয়া। ভালো বলেই অনেকে আসে এখানে, তাই না?'

'অন্য কারণেও আসে।' সৈকতে যাওয়ার পথটার ওপর কিশোরের নজর। দুটো লোক উঠে এলো সেপথ ধরে, মেইন রোড পার হয়ে হিলটপ হাউসে ওঠার গলি ধরে ওপরে উঠতে শুরু করলো।

উঠে দাঁড়িয়ে একটা কলসের গায়ে হেলান দিলো কিশোর। আনমনেই হাত বোলালো একবার ঈগলের একটা মাথায়। নিজেকেই যেন বললো, 'একসারি রহস্য! কুপার কেন গায়েব হয়ে গেলেন আচমকা? গতকাল কেন তাঁর অফিসে চুরি করে তল্লাশি চালানো হলো? রান্নাঘরে পায়ের ছাপের ওপর অদ্ভুত আগুনটা জ্বললো কিভাবে? কে জ্বাললো? আর কুপারের একটা মেয়ে আছে, নাতি আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগও আছে তাঁর এতোদিন ধরে, একথাটা রকি বীচে কেউ জানলো না কেন?'

'জানবে কি ভাবে, সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতো যে। এতোবড় বাড়িতে একটা চেয়ার নিয়ে থাকে কেউ? টাকা আছে, অথচ এরকম সাধারণ ভাবে জীবন কাটায় ক'টা মানুষ?'

'সন্ন্যাসী হোন আর যা-ই হোন, তিনি একজন মেয়ের বাপ, নানা। আমার মেরিচাচীর অনেক বন্ধু আছে, তারা নানা। সুযোগ পেলেই নাতিদের ছবি দেখিয়ে ছাড়েন, তাদের কথা বলতে বলতে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কিন্তু কুপার কক্ষণো, কোনোদিন তা করেননি। এমনকি তোমরা যে আছো, একথাও ঘুণাক্ষরে বলেননি কারো কাছে।'

সামনে ঝুঁকে দুই হাত দিয়ে হাঁটু পেঁচিয়ে ধরলো ডরি। 'হ্যাঁ, কেমন যেন লাগে শুনতে। আমার ভাল্লাগছে না। পারলে এখুনি বাড়ি ফিরে যেতাম। কিন্তু...'

'গেলে এসব প্রশ্নের জবাব কোনোদিন পাবে না, এই তো? এক কাজ করো, গোয়েন্দার সাহায্য নাও।'

'না, তা পারবো না। গোয়েন্দা ভাড়া করতে অনেক খরচ, অতো টাকা নেই আমাদের।'

'পয়সা ছাড়াও গোয়েন্দা পাওয়া যায়,' পকেট থেকে তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড বের করলো কিশোর। 'শখের গোয়েন্দা।'

কার্ডটা পড়ে অবাক হলো প্রথমে ডরি। তারপর হাসি ছড়িয়ে পড়লো সারামুখে। 'হুঁ, সে-জন্যেই ভাবি, ওরকম খুঁতখুঁত করার স্বভাব কেন তোমার? অফিস রুমে কি করতে ঢুকেছিলে? পুলিশ তোমাদের চেনে, ওদের সুনজরেই আছো বোঝা যায়।' কার্ডটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বললো, 'বেশ, নানাকে খুঁজতে

নাহয় তিন গোয়েন্দার সাহায্য চাইলামই। তারপর কি কি করতে হবে আমাকে?'

'প্রথমে,' একটা আঙুল তুললো কিশোর, 'আমাদের মধ্যে যা যা কথা হবে, সব আমাদের মধ্যেই থাকবে, বাইরের কারো কানে যাবে না। তোমার আম্মারও না। এমনিতেই মানসিক অবস্থা ভালো না তাঁর। এসব কথা বলতে গেলে হয়তো আরও অস্থির হয়ে পড়বেন। তার চেয়ে না শোনানোই ভালো।'

'বেশ, শোনালাম না। তারপর?'

'দ্বিতীয়ত, অফিসার ম্যাকেনা ঠিকই বলেছে। এখানে তোমাদের একলা থাকাটা উচিত হবে না।'

'কোথায় যাবো তাহলে? আবার ওশনসাইডে?'

'সেটা তোমার আম্মার ওপর নির্ভর করে। অন্যখানেও যেতে পারেন ইচ্ছে করলে। আর নিতান্তই যদি এখানে থাকতে চান, তিন গোয়েন্দার কোনো একজন সর্বক্ষণ থাকবে তোমাদের সঙ্গে। তাতে সুবিধে হবে তোমাদের।'

'আম্মা কি করবে জানি না, তবে আমি খুশিই হবো।'

'বেশ, তাহলে ওকথাই রইলো। আমি মুসা আর রবিনের সঙ্গে আলাপ করবো...'

'কিশোর,' ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মেরিচাচী, 'এখানে বসে আছিস। কতো কাজ ছিল, আমাদের সঙ্গে একটু হাত লাগালেও পারতি।'

'সরি, চাচী, ডরির সঙ্গে কথা বলছিলাম।'

নাক কুঁচকালেন মেরিচাচী। 'অনেক বোঝালাম ডরির আম্মাকে, সরাইয়ে চলে যেতে, এখানে থাকা ঠিক হবে না, কিন্তু শুনছে না। তার ধারণা, যে কোনো সময় এসে হাজির হতে পারে তার বাবা।'

'আসতেও পারে। এটাই তাঁর বাড়ি যখন।'

এলিজাও বেরিয়ে এলো। চেহারা এখনও ফ্যাকাশে, তবে চায়ে খানিকটা উপকার হয়েছে।

'এলিজা,' মেরিচাচী বললেন, 'আমাদের তো আর কোনো কাজ নেই এখন। যাই। ভয় পেলে, কিংবা যে কোনো অসুবিধে হলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন। আর খুব হুঁশিয়ার থাকবেন।'

থাকবে, কথা দিলো এলিজা। দরজা-জানালা ভালোমতো বন্ধ করে শোবে, তা-ও বললো। তেমন মনে করলে দরজায় তালাও লাগিয়ে নিতে পারবে।

'তালা খোলাটা আজকাল আর কিছুই না,' সন্তুষ্ট হতে পারলেন না মেরিচাচী। 'তবু, থাকবেনই যখন...'

ফেরার পথে মেরিচাচী বললেন, 'তালা লাগিয়ে কোনো লাভ হবে না। ওগুলো খোলা কোনো ব্যাপারই না। ছিঁচকে চোরেরাও আজকাল খুলতে জানে। ঘরে একটা টেলিফোন থাকলে তা-ও নাহয় হতো, পুলিশে খবর দিতে পারতো।

সাংঘাতিক রিস্ক নিলো মহিলা।'

একমত হলো কিশোর।

ইয়ার্ডে পৌঁছেই ট্রাক থেকে নেমে গিয়ে ওয়ার্কশপে ঢুকলো সে। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকলো হেডকোয়ার্টারে। মুসাকে ফোন করে বললো, 'মুসা, একটা কেস পেয়ে গেল তিন গোয়েন্দা। রেডি থেকো।'

সাত

বিকেল পাঁচটায় হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো তিন গোয়েন্দা। এলিজা আর ডরি যে কুপারের বাড়িতে উঠে পড়েছে, রান্নাঘরে জ্বলন্ত পায়ের ছাপ দেখা গেছে, সংক্ষেপে জানালো কিশোর।

'খাইছে!' ভয় পেয়ে গেল মুসা। 'তাহলে সত্যিই মরে গেল কুপার? ভূত হয়ে জ্বালাতে এসেছে বাড়ির লোককে!'

'বোরিসের তাই ধারণা,' কিশোর বললো। 'কিন্তু ওই ছাপগুলো কুপারের নয়, আমি শিওর। বহু বছর ধরে খালি পায়ে থাকছে কুপার। খেয়াল করেছো কিনা জানি না, ওভাবে থাকতে থাকতে চ্যাপ্টা হয়ে ছড়িয়ে গেছে তার পা। কিন্তু যে ছাপগুলো দেখলাম, ওগুলো ছোট। কোনো খাটো মানুষের, কিংবা মেয়েমানুষের।'

'এলিজা?'

'না, সে সময় পায়নি। ট্রাক থেকে মাল আনতে গিয়েছিলো। তার সঙ্গে আমি ছিলাম। রান্নাঘরে ঢুকতে গিয়ে আলোটা দেখে। ঠিক পেছনে ছিলাম আমি। আর সে-ই বা করবে কেন? কি করে করবে?'

'হিলটপ হাউসের লোকগুলো?'

'হতে পারে। সামনের দরজা খোলাই ছিলো। ঢুকে, কোনো কায়দায় পায়ের ছাপের ওপর আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করে রেখে চলে গেছে। যাকগে, এখন বলো, হিলটপ হাউস সম্পর্কে কি কি জেনেছো?'

পকেট থেকে নোটবুক বের করলো মুসা। 'মিস্টার ডারবির মেজাজ খুব ভালো ছিলো। ঢুকলাম ওঁর অফিসে। জিজ্ঞেস করলাম, ঘাসটাস সাফ করা লাগবে কিনা। লাগবে না বললেন। তারপর হিলটপ হাউসের ব্যাপারে আগ্রহ দেখলাম। পনেরো বছর ধরে তার খাতায় লেখা রয়েছে বাড়িটার নাম। এতো বেশি ভাঙাচোরা, বিক্রি তো দূরের কথা, ভাড়াও দিতে পারেননি। ছিলো খাতায় নামকা ওয়াস্তে। তারপর এলো ওই লোকটা, যে স্থির করেছে, রকি বীচে বাড়ি নিতে হলে ওই একটা বাড়িই নেবে। এক বছরের জন্যে লীজ নিয়ে তিন মাসের অগ্রিম দিয়ে দিলো। ওই লীজটা নিয়েই কাজ করছিলেন মিস্টার ডারবি, আমি যখন ঢুকলাম, বোধহয় কমিশন কতো পাবেন সেটাই হিসেব করছিলেন…টুক করে ভাড়াটের নামটা দেখে

ফেললাম।'

'কি নাম?'

'মিচেল ভ্যান হফ। দলিলটা রেখে টাইপরাইটার পরিষ্কার করতে লাগলেন মিস্টার ডারবি, এই সুযোগে অনেকখানিই পড়ে ফেললাম। হফ লোকটার আগের ঠিকানা ছিলো তেরো শো বারো, উইলশায়ার ব্যুলভার, লস অ্যাঞ্জেলেস।'

ফাইল কেবিনেটের ওপরে রাখা সেন্ট্রাল টেলিফোন ডিরেকটরিটা নামিয়ে আনলো রবিন। পাতা উল্টে খুঁজতে শুরু করলো নামটা। শেষে মাথা নেড়ে বললো, 'নেই।'

'অনেক লোকেরই থাকে না,' বললো কিশোর। 'টেলিফোন না থাকলে ঠিকানাও থাকবে না ডিরেকটরিতে, জানা কথাই। থাকগে, ভ্যান হফের ব্যাপারে পরে খোঁজখবর নেবো। আগে ঈগলটার কথা জানা দরকার। ওটাই জরুরী।'

হাসলো রবিন। 'জেনে ফেলেছি।'

'লাইব্রেরিতে গেলে কখন?'

'যাইনি। যাওয়াই লাগেনি। বাবা একটা কফি-টেবল বুক নিয়ে এসেছে।'

'কি বুক?' বুঝতে পারলো না মুসা।

'কফি-টেবল বুক। ওই যে বড় বড় বইগুলো, ছবিওয়ালা, যেগুলোর সাহায্যে ডাকযোগে বিজ্ঞাপন করা হয়। ওগুলোর ব্যাপারে দুর্বলতা আছে তার। পত্রিকার লোক তো।'

মুসার মনে পড়লো, একটা প্যাকেট সঙ্গে ছিলো রবিনের। সেটা কোথায় দেখার জন্যে ঝুঁকলো। পায়ের কাছ থেকে প্যাকেটটা তুলে এনে গর্বের সঙ্গে খুললো রবিন। চকচকে প্লাস্টিকের জ্যাকেট লাগানো রয়েছে বইয়ের শক্ত মলাটের ওপর। মূল নামঃ রয়্যাল রিচেস। তার নিচে আরেকটু ছোট অক্ষরে লেখাঃ আ ফটোগ্রাফিক স্টাডি অভ দা ক্রাউন জুয়েলস অভ ইউরোপ, উইথ কমেন্টারি বাই ই. পি. ফার্নসওয়ার্থ।

কভারের সুন্দর ছবিটার দিকে তাকিয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'ব্রিটিশ মুকুট না এটা?' খুব কাছে থেকে তোলা হয়েছে ছবিটা, লাল মখমলের কাপড়ের ওপর বসিয়ে।

'হ্যাঁ। অনেক কষ্ট করেছেন লেখক, অনেক জায়গায় ঘুরেছেন। শুধু ইংল্যাণ্ডই নয়, ইউরোপের বহু জায়গায়ও গেছেন। অস্ট্রিয়ার শার্লেমেন আর হাঙ্গেরির সেইন্ট স্টিফেনের মুকুটের ছবিও তুলে এনেছেন। সোনার তৈরি মূল্যবান পাথর বসানো মুকুটের ছবিই শুধু তোলেননি, লোহার তৈরি লোমবার্ড মুকুটের ছবিও আছে বইটাতে। রাশিয়ার কিছু মুকুটের ছবি আছে। ঈগলের ওপর বেশ লোভ রাশানদের, বোঝা যায়। তবে আমরা যে ঈগলকে খুঁজছি, সেটা বোধহয় এটা।'

বইয়ের মাঝামাঝি জায়গায় খুললো রবিন। বইটা ছড়িয়ে রেখেই ঠেলে দিলো

কিশোরের দিকে। 'এই যে, দা ইমপেরিয়াল ক্রাউন অভ লাপাথিয়া।'

কিশোরের কাঁধের ওপর দিয়ে দেখার জন্যে ঝুঁকে এলো মুসা। 'মারছে! কি সাংঘাতিক!'

মুকুট না বলে হেলমেট বললেই বেশি মানায় দা ইমপেরিয়াল ক্রাউন অভ লাপাথিয়াকে। সোনার তৈরি, নীল পাথর বসানো নিচের দিকটায়। চূড়ার কাছে সোনার চারটে বন্ধনী তৈরি করে তার ভেতরে বসানো হয়েছে বিশাল এক চুনী পাথর। আর ঠিক চূড়ায় ডানা ছড়িয়ে আছে লাল রঙের দুই মাথা একটা ঈগল। হীরার চোখ জ্বলছে। শিকারকে আক্রমণ করার ভঙ্গিতে হাঁ করে রেখেছে ঠোঁট দুটো।

'আমাদের কুপারেরটার মতোই,' কিশোর বললো।

'মুকুটটা সম্পর্কে লেখা রয়েছে পরের পৃষ্ঠায়,' রবিন জানালো।

পৃষ্ঠাটা উল্টে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলো কিশোর,

'দা ইমপেরিয়াল ক্রাউন অভ লাপাথিয়ার ডিজাইন তৈরি করেছিলেন জনৈক বোরিস কেরিনভ, পনেরোশো তেতাল্লিশ সালে। কারলনের যুদ্ধে ডিউক ফেডারিক আজিমভ যে হেলমেট পরেছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করেই নমুনাটা তৈরি করেছিলেন শিল্পী। সেই যুদ্ধে বিজয়ী হন আজিমভ, একটা গৃহযুদ্ধের অবসান হয় তাতে, ক্ষুদ্র রাজ্য লাপাথিয়াকে ক্রম-ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিলো যে যুদ্ধ। আজিমভের সৈন্যদের কাছে পরাজিত হওয়ার পর প্রতিজ্ঞা করেন দক্ষিণাঞ্চলের ব্যারনেরা, যে আর কখনও এমন কাজ করা হবে না যাতে লাপাথিয়ার শান্তি নষ্ট হয়। পরের বছর তাঁদেরকে ম্যাডানহফ দুর্গে আসার জন্যে দাওয়াত করেন ডিউক ফেডারিক। তাঁদের উপস্থিতিতে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। ব্যারনেরা তখন দুর্গের ভেতরে, তাদের সৈন্যসামন্ত কেউ নেই সঙ্গে, ডিউককে রাজা বলে মেনে নিতে বাধ্য হলেন। একজন মানতে রাজি হননি, তাঁর নাম ইভান দা বোল্ড। কথিত আছে, দুঃসাহসী ওই যোদ্ধাকে নাকি দুর্গের প্রধান হলঘরে, অনেক গণ্যমান্য লোকের চোখের সামনে মাথা কেটে হত্যা করা হয়। তারপর তাঁর কাটা মুণ্ডু বর্শায় গেঁথে রেখে দেয়া হয় দুর্গের সমরাস্ত্র রাখা হতো যে ঘরে, সেখানে, শোভা বর্ধনের জন্যে।

'পনেরো শো চুয়াল্লিশ সালে ম্যাডানহফ দুর্গের গির্জায় রাজা ফেডারিক ওয়ান অভ লাপাথিয়ার অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর মাথায় পরানো হয় মুকুটটা—দা ইমপেরিয়াল ক্রাউন অভ লাপাথিয়া। তার পর থেকে চারশো বছর ওটা আজিমভ পরিবারের দখলে ছিলো। শেষ ওটা মাথায় পরেন রাজা উইলিয়াম ফোর, উনিশশো তেরো সালে। উনিশশো পঁচিশ সালে আজিমভ পরিবারের উচ্ছেদের পর মুকুটটাকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়। ম্যাডানহফের ন্যাশনাল মিউজিয়মে এখন রাখা আছে ওটা। ডিউক ফেডারিকের কঠোর শাসনামলেই

দুর্গের চারপাশে গড়ে ওঠে শহর, আর ওই শহরই এখন রাজধানী হয়ে গেছে দেশটার।

'ইমপেরিয়াল ক্রাউনের আরেক নাম আজিমভ ক্রাউন। খাঁটি সোনায় তৈরি। লাপিস লাজুলি পাথর বসানো রয়েছে নিচের দিকে। ওপরের অংশে রয়েছে বিশাল এক চুনী পাথর, শোনা যায়, ওটার মালিক নাকি ছিলো ইভান দা বোল্ড। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি তছনছ করে ফেলা হয়, চলে যায় রাজার দখলে। আজিমভদের পারিবারিক চিহ্ন হলো দুই মাথা ঈগল। কেরিনভ পাখিটাকে সোনা দিয়ে বানিয়ে তার ওপর এনামেলের রঙ করে দেন। চোখ তৈরি করেন হীরা দিয়ে। ওসব পাথরের একেকটার ওজন দুই ক্যারাট করে।'

পড়া থামিয়ে পাতা উল্টে মুকুটের ছবিটা দেখতে লাগলো আবার কিশোর।

'ওপরে ওঠার এটাই সব চেয়ে সহজ পথ,' তিক্ত কণ্ঠে বললো মুসা। 'প্রতিপক্ষকে খুন করে ফেলা। এবং পারলে তার সমস্ত সম্পত্তি লুট করে নেয়া।'

'সত্যিই,' রবিন বললো। 'লোকটাকে মেরেও ফেললো, আবার তার পাথরটা ছিনিয়ে এনে নিজের মুকুটে লাগালো। কত্তোবড় হারামি লোক হলে ওরকম করতে পারে।'

'তখনকার দিনে আসলে ওরকম আচরণই করতো ক্ষমতাশালীরা,' বললো কিশোর।

'এখনও কি আর কম করে নাকি? মানুষের স্বভাব প্রাগৈতিহাসিক কালেও যা ছিলো এখনও তা-ই আছে, এতটুকু বদলায়নি। এই তো, এই শতকেই, উনিশশো পঁচিশ সালে কি কাণ্ডটা হলো লাপাথিয়ায়,' নোটবুক বের করলো রবিন। 'এনসাইক্লোপীডিয়া ঘেঁটে বের করেছি। বিশ্বাস করবে? রাজ্যটা এখনও আছে।'

'তারমানে শক্তিধররা গিলে ফেলেনি এখনও?' কিছুটা অবাকই হলো কিশোর।

'না। এখন ওটার নাম রিপাবলিক অভ লাপাথিয়া। আয়তন তিয়াত্তর বর্গমাইল। লোক সংখ্যা বিশ হাজার। প্রধান উৎপাদন, পনির। সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা তিনশো পঞ্চাশ, তার মধ্যে পঁয়তিরিশজনই জেনারেল।'

'প্রতি দশজন সৈন্যের জন্যে একজন করে জেনারেল!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'সবাই জেনারেল হয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি?' হাসলো কিশোর। রবিনের দিকে তাকালো, 'আর কি আছে?'

'পঁয়তিরিশ জন জেনারেল আর প্রতিটি প্রদেশের একজন করে লোক নিয়ে গভার্নিং বডি, দি ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অভ লাপাথিয়া। ওইটুকু দেশ, তার আবার দশটা প্রদেশ।'

'জেনারেলরাই তাহলে দেশ চালাচ্ছে,' কিশোর বললো।

'প্রেসিডেন্ট নির্বাচনও ওরাই করে,' বললো রবিন।

'আজিমভদের কি খবর?' মুসা জানতে চাইলো।

'নেই আর এখন। টিকতে পারেনি। উনিশশো পঁচিশ সালেই শেষ। শেষ রাজা ছিলেন উইলিয়াম ফোর। রাজকোষ খালি হয়ে আসছে তখন। একজন লাপাথিয়ান লেডিকেই বিয়ে করেছিলেন রাজা, তাঁর চাচাতো বোন, ওই মহিলাও একজন আজিমভ। রক্তে রয়েছে খরচের নেশা, উচ্ছৃঙ্খলতা। ওই মহিলাও তা এড়াতে পারেনি। ভীষণ খরচ করতো। হীরার ব্রেসলেট, প্যারিস থেকে আনা গাউন, আর এমনি সব দামী দামী জিনিস ছাড়া পরতো না। চারটে ছেলেমেয়ে ছিলো। ওদেরও প্রচুর খরচ। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা শিক্ষক ছিলো। গাড়ি ছিলো। ঘোড়া ছিলো। রাজকোষ খালি, খরচ করতে করতে ফতুর হয়ে গেলেন রাজা উইলিয়াম। দেনায় জড়িয়ে পড়লেন। শেষে সেই টাকা জোগাড় করার জন্যে কর বসিয়ে দিলেন পনিরের ওপর। প্রতি পাউণ্ড পনিরের জন্যে বাড়তি কর জোগাতে হলো লাপাথিয়ান ডেইরি ফার্মগুলোকে। স্বভাবতই বিরক্ত হয়ে উঠলো লাপাথিয়ানরা। জেনারেলরা দেখলো এইই সুযোগ। রাজার জন্মদিন আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো তারা। কারণ সেদিন রাজ্যের লোক এসে জড়ো হবে রাজপ্রাসাদের সামনে। লোকেরা এলো নির্দিষ্ট দিনে। জেনারেলরাও তাদেরকে নিয়ে মার্চ করে ঢুকে পড়লো প্রাসাদে, সাফ বলে দিলো, উইলিয়াম আর রাজা নন। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে।'

'তারপর?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে পড়েছে কিশোর।

'সম্ভবত সেই একই ব্যাপার ঘটলো আরেকবার, ইভান দা বোল্ডের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিলো। অফিশিয়াল রেকর্ড বলে, রাগে ক্ষোভে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল রাজার, প্রাসাদের ব্যালকনি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন।'

'তার মানে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছিলো তাঁকে!' তিক্তকণ্ঠে বললো মুসা।

'ওরকমই কিছু নিশ্চয়ই,' রবিন বললো। 'পরিবারের অন্যদের এতোই মন খারাপ হয়ে গেল—এটাও অফিশিয়াল রেকর্ড, তারাও যে যেদিকে পারলো চলে গেল। মনের দুঃখে বনে চলে যাওয়া যাকে বলে। আর রানী নাকি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে।'

'লোকে বিশ্বাস করেছে ওকথা?'

'আশেপাশে এতগুলো জেনারেল, সন্দেহ প্রকাশ করে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা? তবে জেনারেলরা ক্ষমতা নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে পনিরের ওপর থেকে কর মওকুফ করে দিলো। লোকেও আর রাজার মৃত্যু নিয়ে মাথা ঘামালো না। রাজপ্রাসাদটাকে করে ফেলা হলো ন্যাশনাল মিউজিয়াম।'

কিশোর বললো, 'ফ্যানটাসটিক কাহিনী! এইই হয়। কর যখন বোঝা হয়ে

ওঠে, আর সহ্য করে না মানুষ, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই আমেরিকার কথাই ধরো। চায়ের ওপর কর বসানোতেই রেগে গিয়েছিলো জনতা, আমেরিকান রেভ্যুলুশানের কারণ ওই কর। তো, আজিমভরা কি সবাই শেষ? কেউ বেঁচে নেই?'

'বইতে অনেক খুঁজেছি। এনসাইক্লোপীডিয়া বলছে, রাজা উইলিয়াম ব্যালকনি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর পরই তাঁর পুরো পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'পালিয়ে গেছে না বললে?'-মুসার প্রশ্ন।

'সেকথা তো জেনারেলরা বলেছে। কিন্তু জনতা কাউকে পালাতে দেখেনি। কারও লাশও দেখেনি।'

কি যেন ভাবলো কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো একবার। 'ডরি বলেছে তার নানা এসেছে ইউক্রেনিয়া থেকে। হয়তো ভুল করেছে সে। কুপার আর দুই মাথা ঈগলের মাঝে পুরনো বন্ধুত্ব দেখা যাচ্ছে। রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তো তার?'

'কিন্তু কাউকে পালাতে দেখেনি জনতা,' রবিন বললো।

'না পালানোর দুটো অর্থ হতে পারে। হয় সবাইকে খুন করে ফেলেছে বিদ্রোহী জেনারেলরা, নয়তো সবাই আত্মহত্যা করেছে।' সামান্য কেঁপে উঠলো মুসার কণ্ঠ, গায়ে কাঁটা দিলো বোধহয়। 'কিন্তু এক পরিবারের সবাই আত্মহত্যা করেছে, এটা বিশ্বাস করা যায় না।'

'ঠিক,' কিশোর বললো। 'রাশিয়ার রোমানোভদের কথা শুনেছো?'

'শুনেছি,' মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'পাইকারী হারে খুন করা হয়েছিলো ওদের।'

'বলা যায় না, কুপার রাজপরিবারের লোক না হয়ে জেনারেলদেরও কেউ হতে পারে। ওই খুনোখুনিতে হয়তো তারও হাত ছিলো। পালিয়ে এসেছে সে-জন্যেই। ওর সম্পর্কে আরও খোঁজখবর করা দরকার।'

আট

আলোচনা করে ঠিক হলো, মুসা যাবে ডরিদের সঙ্গে থাকতে, অর্থাৎ তাদেরকে পাহারা দিতে। কিশোর আর রবিন যাবে হিলটপ হাউসে, নতুন ভাড়াটেদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে। রাতে বাড়ি না-ও ফিরতে পারে। তাই ফোন করে বাড়িতে যার যার মাকে বলে দিলো রবিন আর মুসা, জরুরী কাজ আছে, রাতে আসবে না। আর কিশোর মেরিচাচীকে বললো, ডরিদের ওখানে যাবে, সবুজ আগুনের ব্যাপারে তদন্ত করতে।

ওদেরকে হুঁশিয়ার থাকতে বললেন মেরিচাচী। তবে যেতে মানা করলেন না।

সুতরাং ডিনারের পর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লো মুসা। রবিন আর কিশোর বেরোতে যাবে, এই সময় দেখলো ট্রাক নিয়ে বেরোচ্ছে বোরিস। কোথায়

যাচ্ছে তাকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

বোরিস জানালো, উইলশায়ার বুলভারে যাচ্ছে, এক বাড়িতে কতগুলো পুরনো মাল কিনে রেখে এসেছেন রাশেদ পাশা, সেগুলো আনতে।

উইলশায়ার বুলভারের নামে একটা কথা মনে পড়ে গেল কিশোরের। বললো, 'যাবেনই যখন, তেরোশো বারো নম্বরে একবার খোঁজ নিতে পারবেন? কারা থাকে না থাকে, আগে কারা থাকতো, একটু জানা দরকার।'

'এ আর এমন কঠিন কি কাজ?' বোরিস বললো। 'জেনে নেবো। আমার ফিরতে কয়েক ঘন্টা দেরি হবে। ফিরে এসে বললে হবে?'

'ফোন করতে পারেন। আগে ওখানে চলে যান। খোঁজ নিয়ে আমাদের জানান। তারপর মাল আনতে গেলেও চলবে। নাকি?'

'তা চলবে।'

হেডকোয়ার্টারে এসে বসলো দু'জনে। অযথা চুপচাপ তো আর বসে থাকা যায় না, আলোচনা করতে লাগলো মূলতঃ আজিমভ আর তাদের মুকুট নিয়েই।

এক ঘন্টা পর ফোন বাজলো।

'নিশ্চয় বোরিস।' ছোঁ মেরে রিসিভার তুলে নিলো কিশোর। কানে ঠেকিয়ে বললো, 'হালো।'

বোরিসই। বললো, 'খোঁজ নিয়েছি, কিশোর। ওখানে কেউ থাকে না। মানে বাস করে না। ছোট একটা বিজনেস বিল্ডিং ওটা। অফিসের সময় শেষ অনেক আগেই, এখন সব বন্ধ।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। আউটার লবিতে অবশ্য আলো আছে। বিল্ডিং ডিরেক্টরিটা পড়া যায়। কোন্ কোন্ কোম্পানি আছে বিল্ডিঙে, নোট করে নিয়েছি। দাঁড়াও, পড়ছি। ব্র্যানসন ফটোস্ট্যাট সার্ভিস, ডক্টর ডব্লিউ এ. স্মিথ, দা লাপাথিয়ান বোর্ড অভ ট্রেড, হ্যানিম্যান…'

'দাঁড়ান দাঁড়ান!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'এর আগের নামটা কি যেন বললেন?'

'হ্যানিম্যান…'

'না না, তার আগেরটা।'

'দা লাপাথিয়ান বোর্ড অভ ট্রেড।'

'বোরিস, আর লাগবে না! যা জানা দরকার ছিলো বোধহয় জেনে ফেলেছি!'

'তাই নাকি? কিন্তু…'

'আপনি আপনার কাজে চলে যান। মালগুলো নিয়ে আসুন। অনেক ধন্যবাদ। রাখলাম।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রবিনের দিকে তাকালো কিশোর। 'আমাদের হিলটপ

হাউসের নতুন ভাড়াটে এই লাপাথিয়ান বোর্ড অভ ট্রেড থেকেই এসেছে, আমি শিওর। দুই মাথা ঈগলের সঙ্গে কুপারের যোগাযোগ আছে। কুপারের বাড়িটা দেখা যায় হিলটপ হাউস থেকে। আর হিলটপ হাউস ভাড়া নিয়েছে লাপাথিয়ান একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লোক। কিছু বুঝলে?'

মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'কুপারের ওপর চোখ রাখতে এসেছে। আর কুপার লাপাথিয়ান হলেও অবাক হবো না।'

লাল কুকুর চার দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো কিশোর আর রবিন। দ্রুত চললো কোল্ডওয়েল হিলের দিকে।

পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকিয়ে রবিন বললো, 'কুপারের ওখানে সাইকেল-গুলো রেখে হেঁটে হিলটপ হাউসে ওঠাই বোধহয় ভালো হবে।'

'বোধহয়। তবে সরাসরি রাস্তা দিয়ে ওঠা উচিত হবে না আমাদের। লোকগুলো কেন এসে আড্ডা গেড়েছে, জানি না। ওদের চোখ এড়িয়ে উঠতে হবে। পথের ওপর নজর রেখে থাকলে দেখে ফেলবে।'

'ঠিক।' সাগরের দিকে ফিরে তাকালো রবিন। কুয়াশার আড়ালে হারিয়ে গেছে সূর্য, আজ আর বেরোতে পারবে বলে মনে হয় না। 'অন্ধকার হয়ে যাবে ততোক্ষণে।'

'অসুবিধে নেই। চাঁদ উঠবে। জ্যোৎস্নায় পথ দেখে উঠে যেতে পারবো।'

'অ্যালমানাক দেখেছো?'

'নিশ্চয়ই। না দেখে কি আর বলি?'

'তা ঠিক। জিজ্ঞেস করাটাই ভুল হয়েছে আমার। শিওর না হয়ে তো আর কিছু বলো না।'

কুপারের বাড়ির কাছে সাইকেল রেখে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করলো দু'জনে। বেশ খাড়া। একটু পর পরই থেমে জিরিয়ে নিতে হচ্ছে।

দশ মিনিট পর আরেকবার জিরাতে থামলো ওরা। উত্তরে তাকালো। অন্ধকার হয়ে গেছে, চাঁদ এখনও ওঠেনি। এই আলোতে পাহাড়ের ঢালে জন্মানো ওকগাছগুলোকে কেমন ভূতুড়ে লাগছে, যেন দানবের ছায়া।

'কি খুঁজতে যাচ্ছি আমরা?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'ওই লোক দু'জনের পরিচয়,' জবাব দিলো কিশোর। 'একজন, মিচেল ভ্যান হফ সম্ভবত এসেছে দা লাপাথিয়ান বোর্ড অভ ট্রেড থেকে। অন্যজন যে কেউ হতে পারে। হিলটপ হাউসে কেমন আরামে আছে ওরা দেখার লোভ সামলাতে পারছি না,' হাসলো সে।

আবার উঠতে লাগলো কিশোর। রবিন রইলো ঠিক তার পেছনে।

পাহাড়ের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ। ওদের আশপাশের কালো

ছায়াগুলোকে আরও কালো করে দিলো তেরছা আলো। আর কোনো কথা হলো না ওদের মাঝে। হিলটপ হাউস নজরে এলো, সামনে, ওদের সামান্য বাঁয়ে। বাড়িটার ওপরতলা অন্ধকার। নিচের একটা ঘরে ম্লান আলো জ্বলছে।

'বাড়িটায় একবার ঢুকেছিলাম,' রবিন জানালো। 'আলো আসছে যে, মনে হয় ওটা লাইব্রেরি থেকে।'

'জানালার কাঁচে নিশ্চয় প্রচুর ময়লা। আলোটাও ইলেকট্রিক ল্যাম্পের নয়, সে-জন্যেই এতো কম।'

'প্যারাফিন ল্যাম্প হবে। মাত্র কাল এসেছে তো, লাইন এখনও ঠিক করতে পারেনি। প্যারাফিন দিয়েই কাজ সারছে।'

ওরা উঠছে একটা পায়েচলা পথ ধরে। ওটার মাথার কাছ থেকে একটা ঝর্না নেমেছিলো কোনো এক সময়, এখন শুকিয়ে গেছে, ঘুরে চলে গেছে হিলটপ হাউসের পাশ দিয়ে। পানির নামগন্ধও নেই এখন, খটখটে শুকনো। নিঃশব্দে তাতে নেমে পড়লো দু'জনে। এমনভাবে পা ফেলতে লাগলো, যাতে আলগা পাথরে পা লেগে পাথর গড়িয়ে পড়তে না পারে। পা হড়কে গিয়ে ওদেরও পিছলে পড়ার ভয় আছে। শেষের পঞ্চাশ ফুট তো রীতিমতো হামাগুড়ি দিয়ে পার হলো।

পৌঁছে গেল হাউসের নিচু দেয়ালের কাছে। উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের ধার আঁকড়ে ধরে বেয়ে উঠে গেল কিশোর। নামলো পেছনের চত্বরে। রবিনও নামলো তার পাশে।

বাড়ির পেছন দিকে নেমেছে ওরা। বিশাল ক্যাডিলাকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তিন কামরার একটা গ্যারেজের সামনে। গাড়িটাকে একবার ঘুরে দেখলো কিশোর। ভেতরে কেউ নেই। ওটার দিকে নজর দেয়ার প্রয়োজন মনে করলো না আর।

বাড়ির জানালাগুলো অন্ধকার। একটা দরজার ওপরের অর্ধেকটায় কাঁচ লাগানো, বাকিটা কাঠের। তালা দেয়া।

'রান্নাঘর,' অনুমান করলো কিশোর।

'চাকরদের ঘর ওপরতলায়,' রবিন বললো।

'চাকর রাখার সময়ই পায়নি এখনও ওরা। সোজা লাইব্রেরিতে চলো।'

'ভেতরে ঢুকবে নাকি?' রবিনের কণ্ঠে অস্বস্তি।

'না। অযথা বিপদ বাড়িয়ে লাভ নেই। জানালা দিয়ে ভেতরে দেখবো।'

'ঠিক আছে। বিপদ দেখলেই দেবো দৌড়।'

একথার জবাব দিলো না কিশোর। অন্ধকার রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ঘুরে আলোকিত জানালার দিকে এগোলো। সরু একটা পাকা রাস্তা রয়েছে, ফলে এগোনো সহজ হলো। পথের পাশে ফুলগাছ সযত্নে বাড়তো একসময়, এখন যত্ন আর পানির অভাবে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

ঠিকই আন্দাজ করেছে কিশোর, পুরু হয়ে ধুলো জমে রয়েছে জানালার কাঁচে।

পা টিপে টিপে একটা জানালার কাছে এসে সাবধানে কাঁচে নাক ঠেকালো দু'জনে। চৌকাঠের বেশি ওপরে মাথা তুললো না। দু'জন লোককে দেখা গেল ভেতরে, আগের দিন স্যালভিজ ইয়ার্ডে গিয়েছিলো যারা। মস্ত ঘরটায় দুটো বাংক পাতা হয়েছে, বিছানার বিকল্প। একদা যেসব তাকে বই শোভা পেতো, তারই একটাতে অগোছালো হয়ে পড়ে রয়েছে খাবারের টিন, কাগজের প্লেট, কাগজের ন্যাপকিন। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। দু'জনের মাঝে কমবয়েসী লোকটা, ক্যাডিলাকের ড্রাইভার, আগুনের সামনে ঝুঁকে বসে লম্বা তারের মাথায় হটডগ গরম করছে। টেকো লোকটা বসে রয়েছে তাস খেলার একটা টেবিলের সামনের ফোল্ডিং চেয়ারে। যেন রেস্টুরেন্টে খাবারের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করছে ক্ষুধার্ত খরিদ্দার।

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হটডগটাকে গরম করছে ড্রাইভার। কিছুক্ষণ বসে থেকে অধৈর্য ভঙ্গি করে উঠে দাঁড়ালো টেকো, চলে গেল লাইব্রেরির পাশের আরেকটা অন্ধকার ঘরে। মিনিট কয়েক পরে যখন আবার ফিরে এলো, হটডগ তৈরি হয়ে গেছে ততোক্ষণে। ওটাকে একটা কাগজের প্লেটে করে নিয়ে এলো অল্পবয়েসী লোকটা, টেবিলে নামিয়ে রাখলো।

নাক বাঁকালো টেকো, খাবার দেয়ার ধরনটা বোধহয় পছন্দ হলো না তার।

জানালার কাছ থেকে সরে আবার বাড়ির পেছন দিকে চলে এলো দুই গোয়েন্দা। ক্যাডিলাকের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো রবিন। 'কি করছে দেখলাম। ক্যাম্প করছে এখানে।'

'শুধু ক্যাম্প করার জন্যে এতোবড় বাড়ি ভাড়া করেনি। অন্য কারণ আছে। একটু আগে অন্ধকার ঘরটায় কেন গিয়েছিলো টাকমাথা লোকটা?'

'ওটা লিভিং রুম। সাগরের দিকে মুখ করা।'

'বারান্দাও ওদিকেই। এসো।'

কিশোরের পিছু পিছু বাড়িটার এককোণে এসে দাঁড়ালো রবিন। লম্বা ছড়ানো বারান্দার নিচেই গাড়িবারান্দা। প্রায় পনেরো ফুট চওড়া বারান্দাটা মাটি থেকে তিন ফুট উঁচুতে, পাথর আর সিমেন্ট দিয়ে তৈরি।

'দেখো, একটা যন্ত্র,' হাত তুলে দেখালো রবিন। ট্রাইপডের ওপর বসানো।'

'টেলিস্কোপ।'

'বোধহয়। শুনলে?'

একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বাড়ির দেয়ালে গা মিশিয়ে দেখতে লাগলো কিশোর। চন্দ্রালোকিত বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে অল্পবয়েসী লোকটা। টেলিস্কোপে চোখ রেখে দেখলো কিছুক্ষণ, তারপর ডেকে কিছু বললো। আবার দেখলো, হাসলো, তারপর আরেকটা মন্তব্য করলো। ভ্রূকুটি করলো কিশোর। ভাষাটা বুঝতে পারছে না।

শোনা গেল আরেকটা ভারি কণ্ঠ। ক্লান্ত স্বর। বেরিয়ে এলো টাকমাথা

লোকটা। ঝুঁকে টেলিস্কোপে চোখ রাখলো। দু'চারটা কথা বলে আবার ফিরে গেল ঘরে। পেছনে গেল অন্য লোকটা।

'ফরাসী ভাষা নয়,' ওরা চলে গেলে বললো কিশোর।

'জার্মানও না।'

'লাপাথিয়ান ভাষা নয় তো?'

'হতে পারে। কিন্তু দেখলোটা কি?'

'সেটাই জানার চেষ্টা করবো।' বলে নিঃশব্দে বারান্দায় উঠে পড়লো কিশোর। পা টিপে টিপে এগোলো টেলিস্কোপটার দিকে। সাবধানে, যন্ত্রটা না ছুঁয়ে ওটার চোখে চোখ রাখলো সে।

কুপারের বাড়ির পেছন দিকটা যেন লাফ দিয়ে উঠে এলো চোখের কাছে। বেডরুমে উজ্জ্বল আলো। মুসাকে দেখা গেল। বিছানায় বসে কথা বলছে ডরির সঙ্গে। দু'জনের মাঝখানে রাখা একটা দাবার ছক। একটা ট্রেতে করে তিনটে কাপ নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলো এলিজা। কোকো নিয়ে এসেছে বোধহয়।

টেলিস্কোপের কাছ থেকে সরে এলো কিশোর ড্রাইভ-ওয়েতে নামলো। 'কুপারের বাড়ির ওপর নজর রাখছে ব্যাটারা।'

'যা জানার তো জানলাম। চলো, ভাগি। জায়গাটা আমার ভাল্লাগছে না।'

'হ্যাঁ, চলো। আর কিছু জানার নেই আপাতত।'

ক্যাডিলাকের পাশ দিয়ে এসে দেয়ালের দিকে এগোলো দু'জনে। দেয়াল পেরিয়ে আবার শুকনো নালায় নামবে।

'এদিক দিয়ে কাছে,' বলতে বলতে দেয়াল আর রান্নাঘরের মাঝের খোলা জায়গাটা ধরে এগোলো রবিন। এককালে বোধহয় বাগান ছিলো এখানটায়।

হঠাৎ দুই হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে উঠলো রবিন। তার পরই অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

নয়

'রবিন, ব্যথা পেয়েছো?'

একটা গর্তের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে নিচে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। কোনো ধরনের সেলার-টেলার হবে ওটা। আবছা-মতো চোখে পড়ছে, উঠে দাঁড়াচ্ছে রবিন।

'দূউর!' শোনা গেল রবিনের বিরক্ত কণ্ঠ।

'ব্যথা পেয়েছো?'

উঠে দাঁড়িয়েছে রবিন। কুঁজো করে রেখেছে পিঠ। 'নাহ্।'

লম্বা হয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লো কিশোর। হাত বাড়িয়ে দিলো টান টান

করে। 'ধরো।'

হাতটা ধরলো রবিন। দেয়ালে তাকমতো রয়েছে, তাতে পা তুলে দিয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করলো। তাকটা কাঠের, পুরনো হতে হতে পচে নরম হয়ে গেছে। রবিনের ভার রাখতে পারলো না, ভেঙে পড়লো। পড়ে গেল সে। আরেকটু হলেই কিশোরকেও এনে ফেলেছিলো গর্তের মধ্যে।

'দূউর!' আবার বললো সে। বলেই জমে গেল যেন। জ্বলে উঠেছে উজ্জ্বল টর্চ।

'নড়বে না!' কঠোর আদেশ দিলো হিলটপ হাউসের ভাড়াটে অল্পবয়েসী লোকটা।

কিশোর নড়লো না। রবিন যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকলো। গর্তের মাটিতে বসে তাকিয়ে রয়েছে ওপরের দিকে। চোখে পড়ছে ভাঙা তক্তা, আচ্ছাদন ছিলো গর্তের মুখে, ওটা ভেঙেই নিচে পড়েছে সে।

'এখানে কি করছো তোমরা?' জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

মটিতে শুয়ে থেকেই জবাব দিলো কিশোর, 'আমার বন্ধুকে তোলার চেষ্টা করছি। পারছি না। একটু সাহায্য করবেন, প্লীজ!'

'ঢুকেছো কেন এখানে, আগে সেকথা বলো!' ধমক দিয়ে বললো লোকটা।

'কি হয়েছে, মিচেল?' পেছন থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো ভারি কণ্ঠ, টাকমাথা লোকটা। দ্রুত এগিয়ে এলো গর্তের কাছে। শরীর দেখে মনেই হয় না, প্রয়োজনের সময় এতোটা ক্ষিপ্র হতে পারে। কিশোরের মতো শুয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো নিচে। 'ধরো। মই নেই আমাদের।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাতটা ধরলো রবিন। মুহূর্ত পরেই তাকে টেনে ওপরে তুলে নিয়ে এলো লোকটা। 'হাড়টাড় ভাঙেনি তো? হাড় ভাঙার যা ব্যথা, হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি আমি। একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলাম, ঘোড়াটা পড়েছিলো আমার ওপর। দুই মাস পড়ে থাকলাম বিছানায়। ভাঙা হাড়ের চেয়েও বেশি যন্ত্রণা দিলো ওই পড়ে থাকা।' একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে যোগ করলো লোকটা, 'ঘোড়াটাকে গুলি করে মেরেছিলাম আমি।'

ঢোক গিললো রবিন। ঘাড়ের কাছটা শিরশির করে উঠলো কিশোরের।

'এসব ব্যাপারে ধৈর্য খুব কম চেক ডিকটারের,' মিচেল বললো।

'চেক ডিকটার?' উঠে দাঁড়িয়ে কাপড় ঝাড়তে ঝাড়তে বললো কিশোর।

'জেনারেল ডিকটার বলবে,' বলে দিলো মিচেল। হঠাৎ লক্ষ্য করলো কিশোর, লোকটার একহাতে টর্চ, আরেক হাতে পিস্তল।

'জেনারেল ডিকটার।' টাকমাথার দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা নোয়ালো কিশোর। তারপর ফিরলো পিস্তলধারী লোকটার দিকে। 'আর আপনি নিশ্চয় মিস্টার মিচেল?'

'কি করে জানলে?'

'জেনারেল আপনাকে ওই নামেই ডাকছিলেন।'

'বাহ্, কথা তো বেশ মনে রাখতে পারো। আর শোনোও মন দিয়ে।' হাসলো জেনারেল। 'পুরো নাম মিচেল ভ্যান হফ।' কিশোরের দিকে তাকালো। 'চালাক ছেলেদেরকে আমার পছন্দ। ওদের কানে অনেক কথা আসে, মনেও থাকে। এসো, বাড়ির ভেতরে এসো। আজ রাতে নতুন কি কি শুনেছো, শোনা যাক।'

'কিশোর,' দ্রুত বললো রবিন, 'কথা বলার সময় নেই আমাদের। চলো…'

মিচেলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো জেনারেল। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল উঁচিয়ে ধরলো অল্পবয়েসী লোকটা। চুপ হয়ে গেল রবিন।

'গর্তটা বের করে দিয়ে কিন্তু ভালোই করলাম আমরা,' কিশোর বললো। 'নইলে অন্য কেউ পড়তো। আপনি পড়তে পারতেন,' জেনারেলকে বললো কিশোর। 'আরেকবার হয়তো হাড় ভাঙতো আপনার। মিস্টার মিচেলও পড়ে কোমর ভাঙতে পারতেন। এখন আর পড়ার সম্ভাবনা নেই। কাজটা ভালো করলাম না আমরা?'

আবার হাসলো জেনারেল। 'সাহস আছে তোমার, ইয়াংম্যান। পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়েও ওভাবে কথা বলছো। হ্যাঁ, ভালোই করেছো। হাড় ভাঙলে খুব কষ্ট হয়। মিচেল, আস্তাবলের পেছনে কাঠ দেখেছি। এনে ঢেকে দাও গর্তের মুখটা।'

'আস্তাবল না গ্যারেজ?' রবিন শুধরে দিতে চাইলো।

'যা-ই হোক, কিছু এসে যায় না।' গর্তটার দিকে তাকালো জেনারেল। 'বাগানের নিচেও ঘরটর আছে বাড়িটার। মদ রাখার ঘর হতে পারে, ওয়াইন সেলার। থাক, পরে দেখা যাবে।'

পিস্তলটা জেনারেলের হাতে দিয়ে কাঠ আনতে গেল মিচেল। কয়েকটা তক্তা এনে ঢেকে দিলো আবার গর্তের মুখ। তারপর পিস্তলটা নিয়ে নিলো।

'এসো, ঘরে এসো,' ডাকলো জেনারেল। 'তোমরা কে, আগে সেকথা শুনবো।'

'চ্যাপারাল ওয়াকিং ক্লাবের সদস্য।' নির্জলা মিথ্যে কথাটা বলতে একটুও মুখে আটকালো না কিশোরের।

'খুব ভালো। নামটাও জানা দরকার। আর কেন এসেছিলে সেটাও। এখানে দাঁড়িয়ে হবে না, ঘরে এসো।'

'চলুন।'

পিস্তল নেড়ে রান্নাঘরের দরজা দেখালো মিচেল। আগে আগে চললো জেনারেল। তার পেছনে রবিন আর কিশোর। সবার পেছনে রইলো মিচেল। ধুলো পড়া, নোংরা, অব্যবহৃত রান্নাঘর পেরিয়ে লাইব্রেরিতে এসে ঢুকলো ওরা। ফোল্ডিং চেয়ারটায় বসলো জেনারেল। কিশোর আর রবিনকে বসতে বললো বিছানায়।

'আদর-আপ্যায়ন করতে পারছি না, দুঃখিত,' ফায়ারপ্লেসের আগুনের আলোয়

চকচক করে উঠলো জেনারেলের চোখ। 'জিনিসপত্র কিছু নেই। চা খাবে?'

'মাথা নাড়লো কিশোর। 'থ্যাংক ইউ। চা খাই না আমি।'

'আমিও না,' রবিন বললো।

'ও, হ্যাঁ, শুনেছি। আমেরিকান ছেলেরা চা, কফি খায় না। মদও না। দুধ তো খাও?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কিশোর বললো, 'খাই।'

'সরি, দুধ নেই আমাদের,' জেনারেল বললো। তার পেছনে একপাশে সামান্য সরে দাঁড়িয়েছে মিচেল।

'মিচেল,' জেনারেল জিজ্ঞেস করলো, 'চ্যাপারাল ওয়াকিং ক্লাবের নাম শুনেছো?'

'জীবনেও না,' জবাব দিলো মিচেল।

'এখানকার স্থানীয় ক্লাব,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'পাহাড়ী ঝোপঝাড়ে দিনের চেয়ে রাতে ঘুরতে ভাল্লাগে, আপনি জানেন। অবশ্য অনেকের কাছে দিনেই ভালো লাগে। আমরা রাতে ঘুরি, তার কারণ, চলার সময় ঝোপের ভেতরে বুনো প্রাণীর সাড়া পাওয়া যায়। চুপচাপ যদি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায়, তাহলে দেখাও যায় অনেক জন্তু। একবার একটা হরিণ দেখেছিলাম। আর বহুবার খাটাশ দেখেছি রাস্তা পেরিয়ে চলে যাচ্ছে।'

'চমৎকার! পাখিও দেখো নিশ্চয়?'

'রাতে দেখতে পারি না,' সত্যি কথাটাই বললো কিশোর। 'রাতে মাঝেসাঝে পেঁচার ডাক শোনা যায় অবশ্য, তবে পাখিগুলোকে ভালো দেখা যায় না। দিনের বেলা পাখির ডাকে সজীব হয়ে ওঠে ঝোপ...'

হাত তুললো জেনারেল। 'রাখো রাখো। চ্যাপারাল বললে, ওটা কি জিনিস?'

'ওই একধরনের ঝোপঝাড়কেই বলে। যেখানে গাছপালা ক্রমেই বাড়ে, ওরকম জায়গাকে। এখানকার পাহাড়ের ঢাল তো নিশ্চয় খেয়াল করে দেখেছেন। গাছপালা অনেক আছে। এটা চ্যাপারাল অঞ্চল। ওক আর জুনিপারের জঙ্গল আছে, আছে সেইজের ঝোপ। ওসব গাছ থাকে ঢালের নিচের দিকে। ওপরের অংশে জন্মে ম্যানজানিটা। খুব শক্ত গাছ, জীবনীশক্তিও অবিশ্বাস্য, সামান্য পানি পেলেই বেঁচে থাকতে পারে। চ্যাপারাল অঞ্চল খুব কম আছে পৃথিবীতে। ক্যালিফোর্নিয়া তার মধ্যে একটা। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা খুব আগ্রহ নিয়ে আসে এখানে গবেষণা করতে।'

'নেচার' ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিলো উদ্ভিদের ওপর লেখা ওই আর্টিকেলটা। সেটারই অংশবিশেষ উগড়ে দিচ্ছে কিশোর, মনে মনে হাসলো রবিন।

চ্যাপারালের ওপর বক্তৃতা দিয়েই চলেছে কিশোর, বৃষ্টির পরে কি রকম বাড়ে গাছপালাগুলো, বসন্তে কেমন গন্ধ ছড়ায়। কি করে ক্ষয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা

করে পাহাড়ের মাটিকে।

আচমকা হাত তুললো জেনারেল। 'যথেষ্ট হয়েছে, থামো। এবার আসল কথায় আসা যাক। তোমাদের নাম?'

'কিশোর পাশা।'

'রবিন মিলফোর্ড।'

'ভালো। আমার বাগানে কি করছিলে?'

'শর্টকাটে যাওয়া যায় ওখান দিয়ে,' কিশোর বললো। 'ওটা পার হয়ে মেইন রোডে নেমে যেতে চেয়েছি।'

'জানো না, এটা প্রাইভেট প্রপার্টি?'

'জানি, স্যার। কিন্তু হিলটপ হাউসে বহুদিন লোক থাকে না, জানতাম। বুঝতেই পারিনি, আপনারা এসেছেন।'

'হুঁ। কিশোর পাশা, তোমাকে আগেও কোথাও দেখেছি। কোথায়, বলো তো?'

'আমাদের ইয়ার্ডে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও হিলটপ হাউসটা পাননি। ওটা কোথায় আমাকে জিজ্ঞেস করার জন্যে নেমেছিলেন মিস্টার মিচেল।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। দাড়িওয়ালা এক বুড়োর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলে তখন।'

'কুপারের কথা বলছেন নিশ্চয়। হেনরি কুপার।'

'পরিচিত?'

'নিশ্চয়ই। রকি বীচে সবাই চেনে তাকে।'

মাথা ঝাঁকালো জেনারেল। 'মনে হয় নামটা শুনেছি।' মিচেলের দিকে ফিরলো সে। আগুনের আলো চিকচিক করে উঠলো তার রোদে পোড়া চামড়ায়। এই প্রথম গলার চামড়ায় খুব সরু ভাঁজ দেখতে পেলো কিশোর। বয়েস আন্দাজ করা যায় না ডিকটারের তা নয়, করা যায়, বুড়ো হয়ে গেছে।

'মিচেল,' বললো জেনারেল, 'তুমি না বলেছিলে এখানে একজন খুব ভালো কুমোর আছে?'

'আছে,' জবাবটা দিলো রবিন।

'ওর সাথে দেখা করার খুব ইচ্ছে আমার।' কোনো জবাব আশা করলো না জেনারেল।

কিশোর বা রবিন কিছু বললো না।

'পাহাড়ের গোড়ায় ওটা তারই বাড়ি,' জেনারেল বললো আবার।

'হ্যাঁ,' এবার জবাব দিলো কিশোর।

'মেহমান এসেছে ওর বাড়িতে। এক সুন্দরী মহিলা আর তার ছেলে। আজ ওদেরকে ঘর গোছাতে সাহায্য করেছিলে তুমি।'

'করেছি।'

'মানুষকে সাহায্য করা ভালো। চেনো ওদেরকে?'

'না। ওরা কুপারের বন্ধু।'

'বন্ধু? বন্ধু থাকা ভালো। কিন্তু ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে থাকলো না কেন কুমোর?'

'ইয়ে...মানে...মানুষটা খামখেয়ালি।'

'ও। যাই হোক, ওর সাথে দেখা করার খুব ইচ্ছে আমার।' হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো জেনারেল। 'ও কোথায়?'

'উঁ?' যেন প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি রবিন।

'কুপার নামের ওই কুমোরটা কোথায়?' গলা চড়িয়ে বললো জেনারেল।

'জানি না,' জবাব দিলো কিশোর।

'অসম্ভব!' রঙ দেখা গেল জেনারেলের রোদে পোড়া চামড়ায়। 'গতকালও তোমার সাথে দেখা হয়েছে। আজ ওর বন্ধুদেরকে সাহায্য করেছো তুমি। জানি না বললে বিশ্বাস করবো ভেবেছো?'

'না, স্যার, বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। তবে সত্যিই আমি জানি না। কাল গায়েব হয়ে গেছে আমাদের ইয়ার্ড থেকে।'

'ও-ই তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে!' কঠিন হয়ে উঠলো জেনারেলের কণ্ঠ।

'না!' সমান তেজে জবাব দিলো রবিন।

'চ্যাপারালে ঘুরতে এসেছো না ছাই! গপ্পো শোনানো হচ্ছে আমাকে!' চিৎকার করে বললো জেনারেল। সহকারীর দিকে হাত বাড়ালো, 'পিস্তলটা দাও আমার হাতে।'

দিলো মিচেল।

'কি করতে হবে জানা আছে তোমার,' কর্কশ কণ্ঠে বললো জেনারেল।

'শুনুন, আমরা...!' চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিলো রবিন, বাধা পেয়ে থেমে গেল।

'চুপ!' ধমক দিলো জেনারেল। 'যেখানে আছো বসে থাকো। মিচেল, কোঁকড়াচুলো ছেলেটাকে আগে ধরো। ওর কথাই শোনা দরকার। ও বেশি চালাক।'

কিশোরের পেছনে চলে গেল মিচেল। কোমর থেকে বেল্ট খুলে কপালের ওপর দিয়ে এনে মাথায় পেঁচিয়ে ধরলো।

'এবার বলো,' জেনারেল জিজ্ঞেস করলো, 'কুমোর কোথায়?'

কিশোরের কপালে বেল্টের চাপ বাড়লো। ব্যথা লাগছে।

'জানি না,' জবাব দিলো সে।

'ও...ও জাস্ট তোমাদের ইয়ার্ড থেকে চলে গেল, আর তুমি কিছুই জানো না?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো জেনারেল।

'না।'

বেল্টের চাপ আরও বাড়লো।

'সে জানতো তার বন্ধুরা আসবে?'

'জানতো।'

'আর পুলিশ কিছুই করছে না? লোকটা হেঁটে গায়েব হয়ে গেল, আর কিছুই বললো না ওরা?'

'না। কি বলবে? এটা স্বাধীন দেশ, লোকের যেখানে খুশি যাওয়ার অধিকার আছে।'

'স্বাধীন দেশ?' চোখ মিটমিট করলো জেনারেল। দাড়িবিহীন চোয়ালে হাত বোলালো একবার। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি একথা। তোমাকে কিছুই বলেনি? কসম খেয়ে বলতে পারো?'

'কিছুই বলেনি।' সরাসরি জেনারেলের চোখের দিকে তাকালো কিশোর। একটিবারের জন্যে কাঁপলো না তার চোখের পাপড়ি।

'হুঁ।' উঠে কিশোরের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো জেনারেল। পুরো আধ মিনিট কিশোরের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো স্থির দৃষ্টিতে। তারপর জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে মিচেলকে বললো, 'ছেড়ে দাও। সত্যি কথাই বলছে।'

প্রতিবাদ করলো মিচেল, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না! এরকম কাকতালীয় ব্যাপার...'

শ্রাগ করলো জেনারেল। 'এ-বয়েসী ছেলেদের কৌতূহল একটু বেশিই থাকে। ছেড়ে দাও। ওরা কিছু জানে না।'

কিশোরের কপাল থেকে বেল্ট খুলে নিলো মিচেল।

চেপে রাখা নিঃশ্বাস শব্দ করে ছাড়লো রবিন। খেয়ালই করেনি কখন থেকে চাপতে আরম্ভ করেছে।

'তোমাদের চমৎকার পুলিশ বাহিনীকে খবর দেবো আমি, যারা মানুষকে খুঁজে বের করার কষ্টটুকু করতেও নারাজ,' বিরক্ত কণ্ঠে বললো মিচেল। 'বলবো দুটো ছেলে বেআইনী ভাবে বাড়িতে ঢুকেছিলো।'

'আইনের কথা তুলছেন!' রেগে গেল রবিন। 'আমাদেরকে ধরে এনে আপনারা কোন্ আইনের কাজটা করলেন? আমরাও পুলিশকে বলতে পারি...'

'বলে কিছু হবে না,' জেনারেল বললো। 'বেআইনী কি করেছি আমরা? একটা বিখ্যাত লোকের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হয়েছে, তার কথা জিজ্ঞেস করেছি। তোমরা বলেছো, জানো না। ব্যস, চুকে গেল। আমরা আর কিছু করিনি তোমাদেরকে। পত্রিকার খবর হয়, ওরকম একজন লোকের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হয় না মানুষের? আমারও তাই হয়েছে।' পিস্তলটা মিচেলের দিকে ছুঁড়ে দিলো সে। 'ওটার লাইসেন্স আছে। তোমরা চুরি করে আমাদের এলাকায় ঢুকেছো।

আমরা কিছুই করিনি। যথেষ্ট ভদ্রতা দেখিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। সুতরাং তোমাদের চমৎকার পুলিশ বাহিনী কিছুই করবে না আমাদের। এখন যেতে পারো।'

আর দেরি করলো না রবিন। উঠে, কিশোরের হাত ধরে টেনে নিয়ে চললো তাকে। 'সোজা রাস্তা দিয়ে যাবে,' জেনারেল বলে দিলো, 'যাতে আমরা দেখতে পারি। নাহলে খারাপ হবে বলে দিলাম।'

কথা বললো না গোয়েন্দারা। ঘর থেকে বেরিয়ে হাঁটতে লাগলো দ্রুতপায়ে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের যাওয়া দেখছে জেনারেল আর মিচেল। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু।

'দারুণ একখান জুটি,' একবার পেছনে ফিরে দেখে বললো কিশোর।

'হ্যাঁ,' একমত হলো রবিন।

মোড় নিলো পথটা। এখান থেকে চোখে পড়ে না হিলটপ হাউস, বাঁয়ের একটা উঁচু ঝোপের জন্যে। তারপর, পাহাড়ের কোনোখান থেকে শোনা গেল ভারি একটা শব্দ। একঝলক আলো। রবিনের মাথার পাশ দিয়ে শাঁ করে গিয়ে পেছনের ঝোপে ঢুকে ডালপাতায় ছড়াৎ ছড়াৎ শব্দ তুললো কি যেন।

'শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো!' চিৎকার করে বললো কিশোর।

ও কথা শেষ করার আগেই মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো রবিন। কিশোরও পড়লো তার পাশে। মাথা তোলার সাহস নেই। ডান দিকে ঝোপের ভেতরে খসখস শব্দ হলো। তারপর নীরবতা। আরও কয়েক মিনিট পরে ডেকে উঠলো একটা পেঁচা।

'বাক্‌শট!' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন।

'মনে হয়।' হাতের ওপর ভর দিয়ে আস্তে শরীর তুললো কিশোর। কিছুই ঘটলো না দেখে উঠে বসলো। মিনিটখানেক অপেক্ষা করে উঠে দাঁড়ালো।

রবিনও উঠলো। দৌড়াতে শুরু করলো দু'জনে। কুপারের গেটের কাছে আসার আগে গতি কমালো না। গেটে তালা দেয়া। ওটা ডিঙাতে খুব একটা পরিশ্রম করতে হলো না। একেবারে চত্বরে না ঢুকে থামলো না ওরা।

'হরিণ মারার ছররা দিয়ে গুলি করেছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো কিশোর। 'হিলটপ হাউস থেকে করা হয়নি, একদম শিওর। জেনারেল আর মিচেল দাঁড়িয়েছিল তখন বারান্দায়, ঘুরপথে আমাদের আগে নেমে এসে গুলি করা একদম সম্ভব ছিলো না ওদের পক্ষে।' জোরে জোরে কয়েকবার দম নিয়ে কিছুটা শান্ত হলো সে। 'বন্দুক হাতে ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে ছিলো কেউ। রবিন, ওকাজটা করেছে তৃতীয় আরেকজন লোক!'

দশ

ঘন্টা শুনে ওপরতলার জানালা খুলে দিলো এলিজা মরগান। জিজ্ঞেস করলো, 'কে?'

চত্বরে খানিকটা পিছিয়ে এলো কিশোর, যাতে ওপরতলা থেকে দেখা যায়। বললো, 'আমরা। কিশোর আর রবিন।'

'ও। দাঁড়াও, এক সেকেণ্ড।'

বন্ধ হয়ে গেল জানালাটা। একটু পরে দরজার ছিটকানি খোলার শব্দ হলো। মুসার মুখ দেখা গেল। 'কি হয়েছে?'

'সরো, আগে ঘরে ঢুকি। তারপর বলছি,' কিশোর বললো।

হলঘরে ঢুকে নিচু কণ্ঠে বললো, 'চেঁচামেচি করো না। মিসেস মরগান শুনলে ভয় পেয়ে যাবে...'

'কি করে এসেছো যে ভয় পেয়ে যাবে...' মুসার চাপা গলার কথা শেষ হওয়ার আগেই পেছনে বলে উঠলো এলিজা, 'কিশোর, শব্দটা শুনেছো? গুলি হলো মনে হয়?'

'গাড়ির এঞ্জিনের ব্যাকফায়ার,' নিরীহ কণ্ঠে বললো কিশোর। 'মিসেস মরগান, এ-হলো আমাদের আরেক বন্ধু, রবিন মিলফোর্ড।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে হাসলো এলিজা। 'এসেছো, খুশি হলাম। তা এতো রাতে কি মনে করে?'

ট্রেতে করে তিনটে খালি কাপ নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো ডরি। বললো, 'হাই, কিশোর।'

আরেকবার পরিচয় দিতে হলো রবিনের।

'ও, তিন নম্বর গোয়েন্দা!' ডরি বললো।

'কী বললি?' এলিজা জিজ্ঞেস করলো।

'না, কিছু না, আম্মা। একটা জোক করলাম আরকি।'

ভুরু কুঁচকে ছেলের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো এলিজা। 'দেখ, আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করবি না। কিছু একটা করছিস তোরা, বুঝতে পারছি। এই যে মুসাকে আমাদের পাহারা দিতে পাঠানো, এতো রাতে কিশোর আর রবিনের হঠাৎ হাজির হওয়া...নিশ্চয় কিছু একটা করছিস।'

'সরি, মিসেস মরগান,' কিশোর বললো। 'আসলে ঘুরতে বেরিয়েছিলাম আমি আর রবিন, এখানে আসার ইচ্ছে ছিলো না। হিলটপ হাউসে গিয়ে লোকটাকে দেখার পর আর না এসে থাকতে পারলাম না।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রবিন।

শান্তকণ্ঠে বলে যাচ্ছে কিশোর, 'অনেক বড় বাড়ি হিলটপ হাউস। এই বাড়ির পেছনে পাহাড়ের ওপর। অনেক দিন খালি পড়ে ছিলো বাড়িটা। এখন নতুন ভাড়াটে এসেছে। দু'জন লোক। ওদের বারান্দা থেকে এই বাড়িটার পেছনের বেডরুম দেখা যায়। ব্যাপারটা দেখে মনে হলো, আপনাকে জানানো দরকার, যাতে বেডরুমের জানালা বন্ধ করে রাখেন। কিংবা পর্দা টেনে রাখেন।'

'চমৎকার!' সিঁড়ির ওপরেই বসে পড়লো এলিজা। 'ভালো একটা দিন কাটলো! প্রথমে রান্নাঘরে দেখলাম আগুনে পায়ের ছাপ। তারপর সরাইয়ের সেই পাগলটা। আর এখন দুটো ছুঁচো, যারা পরের ঘরে উঁকি দেয় চুরি করে।'

'পাগল?' রবিন জিজ্ঞেস করলো, 'কোন্ পাগল? কোন্ সরাইয়ের?'

'খেপাটার নাম নিমেরো,' মুসা জানালো। 'আধ ঘন্টা আগে এসে জ্বালিয়ে গেছে। এসেই জিজ্ঞেস করলো মিসেস মরগানের সঙ্গে দেখা করতে পারবে কিনা। কেন, জানতে চাওয়ায় বললো, ওরা ঠিকমতো পৌঁছেছে কিনা, ভালো আছে কিনা জানতে এসেছে। যখন বললাম, ভালোই আছে, জিজ্ঞেস করলো ওদের সাহায্যের দরকার হবে কিনা। সে কিছু করতে পারবে কিনা।'

'আমাদের নতুন মাছশিকারী,' কিশোর বললো।

'আস্ত শয়তান!' রাগ চাপতে পারলো না এলিজা। 'খালি অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে আসে। লোকটাকে দেখলেই আমার জোঁকের কথা মনে পড়ে যায়। আর কথায় কথায় হাসে। বিরক্তি ধরে যায় আমার। মুসার ডাকে এসে দেখা করলাম। জোর করে কফি খেতে চাইলো। সাফ বলে দিলাম ঠাণ্ডা লেগে মাথা ধরেছে আমার, শুতে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ আমার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থেকে শেষে চলে গেল।'

'গাড়ি নিয়ে এসেছিলো?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, একটা ফোর্ড গাড়ি,' জবাব দিলো মুসা।

'হুঁম্। ঠিক আছে, যাই। মিসেস মরগান, কাল দেখা হবে।'

কিশোর আর রবিনকে গুডনাইট জানিয়ে ট্রেটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল এলিজা।

যা যা ঘটেছে সংক্ষেপে দ্রুত মুসা আর ডরিকে জানালো কিশোর। বন্দুকের কথা বললো। ডরিকে বললো, পেছনের বেডরুমের জানালার পর্দা টেনে রাখতে।

কিশোর আর রবিন বাইরে বেরোতেই পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ছিটকানি তোলার শব্দ কানে এলো। তালা লাগানো হলো নিশ্চয়, তবে সে-শব্দ বাইরে থেকে শোনা গেল না।

'বাড়ির দরজা-জানালায় ভেতর থেকে তালা লাগানোর ব্যবস্থা করে ভালোই করেছে কুপার,' কিশোর বললো। 'এখন কাজে লাগছে।'

আবার গেট ডিঙিয়ে এসে ঝোপের পাশে ফেলে রাখা সাইকেল দুটো তুলে

নিয়ে ইয়ার্ডে ফিরে চললো দু'জনে।

প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে রবিন বললো, 'ডরিরা খুব বিপদের মধ্যে রয়েছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' কিশোর বললো। 'জেনারেল আর মিচেল কুপারের ব্যাপারে আগ্রহী, তার মেয়ের ব্যাপারে নয়। আর ওরা জানে কুপার এখন বাড়ি নেই। কাজেই কিছু করতে আসবে না।'

'তাহলে সেই লোকটা? যে গুলি করলো?'

'সে তো আমাদের জন্যে বিপজ্জনক, ডরিদের জন্যে নয়। মনে হলো আমাদেরকে হুমকি দিয়েছে। নিমেরোর ব্যাপারটা অবশ্য সন্দেহজনক, গায়ে পড়ে এসে মিসেস মরগানকে সাহায্য করতে চাওয়াটা। তবে সে খারাপ কিছু করবে বলে মনে হয় না। মেরিচাচীর ধমকেই যেভাবে কাঁচুমাচু হয়ে গেল। আসলে ওরকম কিছু লোক থাকে, অপমানের ভয় করে না, কিংবা অপমান গায়েই মাখে না, গায়ে পড়ে এসে লোকের সঙ্গে ভাব জমাতে চায়, বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে। ওর গাড়িটাও চোখে লাগে।'

'কেন? ওরকম গাড়ি লাখ লাখ আছে আমেরিকায়।'

'আছে। তবে নিমেরোর পোশাকআশাকের সঙ্গে গাড়িটা বেমানান। আরেকটু দামি গাড়ি হলে মানানসই হতো। একে তো পুরনো গাড়ি, তার ওপর এমন ময়লার ময়লা। ধুইয়ে-টুইয়ে যে সাফসুতরো করে রাখবে, সেটাও করেনি লোকটা।'

ইয়ার্ডে পৌছলো দু'জনে। জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে এলো কিশোর, টিভিতে পুরনো একটা সিনেমা চলছে। অন করে রেখেছেন বটে রাশেদ চাচা, দেখছেন না, সোফায় হেলান দিয়ে নাক ডাকাচ্ছেন।

মেইন গেট বন্ধ করে দিয়ে এলো কিশোর। ওয়ার্কশপে ঢুকতেই দেখলো লাল আলোটা জ্বলছে নিভছে। তারমানে ফোন বাজছে হেডকোয়ার্টারে।

'এতো রাতে কে?' রবিন অবাক।

'নিশ্চয় মুসা! আর কেউ হতে পারে না!'

যতো তাড়াতাড়ি পারলো দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকলো দু'জনে। রিসিভার তুললো কিশোর। ঠিকই আন্দাজ করেছে। মুসার উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'কিশোর, আবার ঘটেছে! জলদি এসো!'

'জ্বলন্ত পায়ের ছাপ!' টান টান হয়ে গেছে কিশোরের স্নায়ু।

'সিঁড়িতে! তিনটে! আমি আগুন নিভিয়ে ফেলেছি। অদ্ভুত একটা গন্ধ বেরিয়ে-ছিলো! পাগল হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে মিসেস মরগানের। এমন কাণ্ড করছেন, যেন ভূতে ধরেছে!'

'এখুনি আসছি,' বলে রিসিভার রেখে দিলো কিশোর। 'আবার সবুজ পায়ের

ছাপ দেখা গেছে,' রবিনকে বললো সে। 'এবার সিঁড়িতে। মিসেস মরগান নাকি মাথা খারাপের মতো করছে। চলো।'

'আবার যাবো?'

'যাবো।'

যেমন তাড়াহুড়ো করে ঢুকেছিলো, তেমনি করেই আবার বেরিয়ে এলো দু'জনে। আবার গেট খুলে বেরোতে হলো। সাইকেলে করে কুপারের বাড়ি পৌঁছতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগলো না। আগের জায়গায় সাইকেল রেখে গেট ডিঙালো দু'জনে, সদর দরজার বেল বাজালো।

খুলে দিলো মুসা।

'বাড়িটায় খুঁজে দেখেছো?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'আমি? পাগল! ভূতফুত না কিসের কাণ্ড কে জানে! তাছাড়া ব্যস্ত ছিলাম আমি। আগুন নিভিয়েই তোমাদেরকে ফোন করতে ছুটলাম। ফিরে এসে দেখি মিসেস মরগানের মাথা খারাপ, তাকে সামলাতেই হিমশিম খাচ্ছি।'

মুসাকে অনুসরণ করে দোতলার বড় বেডরুমটায় এসে ঢুকলো কিশোর আর রবিন। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে এলিজা। ফোঁপাচ্ছে জোরে জোরে। পাশে বসে মায়ের কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ডরি। সে-ও নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

বাথরুমে ঢুকে ঠাণ্ডা পানিতে একটা তোয়ালে ভেজাতে গেল রবিন।

'আ-আবার!' কাঁপা গলায় বললো এলিজা।

'কি?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'বন্ধ হয়ে গেছে। পানি পড়ছিলো কোথাও।'

'কল আমি ছেড়েছি, মিসেস মরগান,' ভেজা তোয়ালে হাতে এসে দাঁড়ালো রবিন। 'কপালে দিন। ভালো লাগবে।'

'দাও,' তোয়ালেটা নিয়ে মুখ মুছলো এলিজা, তারপর কপালে চেপে ধরলো।

'তোমরা যাওয়ার পর পরই,' মুসা জানালো, 'পানি পড়ার শব্দ শুনলাম। পাইপ দিয়ে গড়িয়ে পড়ার শব্দ, অথচ বাড়ির সব কল বন্ধ ছিলো। তারপর নিচতলায় ধুপ করে একটা শব্দ। কি হয়েছে দেখতে গেলেন মিসেস মরগান। আগুন দেখেই চিৎকার করে উঠলেন। তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে কম্বল দিয়ে চেপে আগুন নিভালাম। তার পর দেখলাম পায়ের ছাপগুলো।'

নিচতলায় নেমে এলো কিশোর আর রবিন, পোড়া চিহ্নগুলো পরীক্ষা করার জন্যে।

'ঠিক রান্নাঘরেরগুলোর মতো,' দেখে বললো কিশোর। একটা ছাপে আঙুল ছুঁইয়ে তুলে এনে শুঁকলো। 'অদ্ভুত গন্ধ। কোনো ধরনের কেমিক্যাল।'

'মারছে!' বলে উঠলো মুসা। 'কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করেছে ভূতটা!'

তার কথার জবাব না দিয়ে কিশোর বললো, 'দেরি হয়ে গেছে অবশ্য, তবু

বাড়িটা একবার খুঁজে দেখা দরকার।'

'কিশোর, এখানে কেউ ঢুকতে পারেনি,' জোর দিয়ে বললো মুসা। 'যেভাবে বন্ধ করে রেখেছিলাম, ঢুকতে পারার কথা নয়।'

সন্তুষ্ট হতে পারলো না কিশোর। তলকুঠুরী থেকে চিলেকোঠা পর্যন্ত সমস্ত জায়গা খুঁজে দেখলো। সন্দেহজনক কিছু পেলো না।

'বাড়িতেই চলে যাবো,' এলিজা বললো।

'যাবো, আম্মা,' ডরির যাওয়ার ইচ্ছে নেই। 'সকালেই চলে যাবো।'

'এখন গেলে অসুবিধে কি?'

'এতো রাতে? এখন তুমি ক্লান্ত, বিশ্রাম দরকার।'

'তোর কি মনে হয় এখানে ঘুমাতে পারবো আমি?'

'আমরা সবাই যদি থাকি, তাহলে কি পারবেন, মিসেস মরগান?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো এলিজা। মোজা পরা একটা পা ছড়াতে গিয়ে লাথি লাগলো খাটের তামা দিয়ে বাঁধানো কিনারায়। 'তা বোধহয় পারবো। দমকলকে কি খবর দেয়ার দরকার আছে?'

'মনে হয় না।'

'আম্মা, ঘুমানোর চেষ্টা করো।' দেরাজ থেকে একটা কম্বল বের করে এনে মায়ের গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিলো ডরি।

'আলো নেভাসনে।'

'না, নেভাবো না।'

'এঘর থেকে যাসনে।'

'আচ্ছা।'

আর কিছু বললো না এলিজা। চোখ বন্ধ করলো।

পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরোলো তিন গোয়েন্দা। দরজার কাছে এসে ডরি বললো, 'আমি আম্মার কাছেই শোবো। আরও কম্বল আছে, মাটিতে বিছিয়ে নিয়ে শুতে পারবো। তোমরা কি সত্যি থাকছো?'

'থাকবো,' কিশোর বললো। 'আমার চাচীকে একটা ফোন করে আসি। নইলে চিন্তা করবে।'

'পুলিশকে কি খবর দেবে?'

'লাভটা কি? আমরা বেরোলেই দরজায় তালা লাগাবে।'

'যাও।' মুসা বললো, 'লাগিয়ে দেবো।'

ফিরে এসে দরজায় তিনবার চাপড় দেবো। একটু থেমে আবার তিনবার। বুঝবে আমরা এসেছি।'

'ঠিক আছে।'

. এলিজার কথা শুনে উদ্বিগ্ন হলেন মেরিচাচী। থাকার অনুমতি দিলেন কিশোরকে। আরও বলে দিলেন, রবিন কিংবা মুসার মা টেলিফোন করলে তাদেরকে বুঝিয়ে বলবেন।

নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলো কিশোর আর রবিন। দরজায় চাপড় দিতেই খুলে দিলো মুসা। আলোচনা করে ঠিক করলো ওরা, পালা করে পাহারা দেবে। একজন পাহারায় থাকবে, অন্য দু'জন তখন ঘুমোবে।

প্রথম তিন ঘন্টা পাহারার দায়িত্ব নিলো কিশোর। রবিন চলে গেল কুপারের সরু বাংকে শুয়ে ঘুমোতে। আর মুসা গেল ডরির জন্যে যে ঘরটা ঠিক করা হয়েছিলো সেটাতে।

হলঘরে সিঁড়ির মাথায় পাহারা দিতে বসলো কিশোর। তাকিয়ে রইলো পোড়া চিহ্নগুলোর দিকে, খালি পায়ের ছাপগুলো স্পষ্ট। আনমনেই নিজের আঙুল শুঁকলো। কেমিক্যালের গন্ধটা লেগে রয়েছে এখনও। খুব দ্রুত উদ্বায়ী কোনো রাসায়নিকের মিশ্রণ দিয়ে জ্বালানো হয় ওই আগুন, অনুমান করলো সে। পদার্থগুলো কি? কিছুক্ষণ ভেবে ভাবনাটা বাদ দিলো সে। আপাতত ওটা না জানলেও চলবে। জরুরী ব্যাপার হলো, কেউ একজন ঢোকে বাড়ির ভেতরে, তালা দেয়া অবস্থাতেও, আগুনটা জ্বেলে দিয়ে পালিয়ে যায়? কিভাবে ঢোকে আর বেরোয়? এবং লোকটা কে?

এগারো

রান্নাঘরের খুটুর খাটুর শব্দে ডরির বিছানায় ঘুম ভাঙলো কিশোরের। গুঙিয়ে উঠে কাত হলো। ঘড়িটা নিয়ে এলো চোখের সামনে। সাতটা বাজে।

'ঘুম হয়েছে?' দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'হয়েছে।' ধীরে ধীরে উঠে বসলো কিশোর।

'মিসেস মরগানের মন এখনও খারাপ। তবে উঠে পড়েছে। নাস্তা বানাচ্ছে রান্নাঘরে।'

'ভালো। খিদে পেয়েছে আমার। তো, বাড়ি যেতে চাইছে না আর? কাল রাতেই তো চলে যেতে চাইছিলো।'

'এখন আর চাইছে না। বরং সমস্ত রকি বীচের ওপর খেপে গেছে। কারণ এখানকারই কেউ তার মনোকষ্টের কারণ। ঘুম ভালো হলে মানুষের মন ঠিক হয়ে যায়। তার বেলায়ও হয়েছে সেটাই।'

হেসে বাথরুমে চলে গেল কিশোর।

নাস্তা খাওয়ার সময় এলিজা বললো, 'ওকে ছাড়বো না আমি! পালিয়ে যাবে কোথায়? পুলিশ লাগিয়ে দেবো। আজকেই থানায় গিয়ে রিপোর্ট লেখাবো, হেনরি

কুপার হারিয়ে গেছে। তার খোঁজ চাই। তখন আর না খুঁজে পারবে না পুলিশ।'

'তাতে কি কোনো লাভ হবে?' প্রশ্ন তুললো কিশোর। 'মিস্টার কুপার যদি লুকিয়ে থাকতে চান...'

'লুকিয়ে থাকা চলবে না ওর!' এক প্লেট ডিমভাজা টেবিলে নামিয়ে রাখলো এলিজা। 'আমি ওর মেয়ে। সেটা তার বোঝা উচিত। আরেকটা ব্যাপার। আগুনের ব্যাপারেও রিপোর্ট করবো, আরেকবার। দেখি, পুলিশ কিছু করে কিনা। আগুন লাগানোটা অপরাধ।'

'অ্যারসন,' রবিন বললো।

'নাম যা-ই হোক, সেটা বন্ধ হওয়া দরকার। খাও তোমরা। আমি শহরে যাচ্ছি।'

'তুমি খাবে না?' ডরি জিজ্ঞেস করলো।

'না, পরে। আগে গিয়ে থানায় রিপোর্ট লেখাবো, তারপর আমার অন্য কাজ।'

রেফ্রিজারেটরের ওপর থেকে হাতব্যাগটা নামিয়ে এনে সেটা থেকে গাড়ির চাবি বের করলো এলিজা। ছেলেদেরকে থাকতে বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই নীল কনভারটিবলের এঞ্জিনের আওয়াজ কানে এলো ওদের।

'আবার খেপে গেছে আম্মা,' ডরি বললো খেতে খেতে।

'ডিমটা খুব ভালো হয়েছে,' বলে আরেকটা ডিম প্লেটে তুলে নিলো কিশোর। খাওয়া শেষ করে বললো, 'বাসন-পেয়ালাগুলো ধুয়ে ফেলা দরকার।'

একমত হলো রবিন।

'তোমার আম্মার কিন্তু রাগ করার কারণ আছে,' ডরিকে বললো কিশোর। 'কাউকে দাওয়াত করে আসতে বলে বাড়ির মালিকের ওভাবে পালিয়ে যাওয়া...তবে মিস্টার কুপারের এভাবে গায়েব হয়ে যাওয়ার পেছনেও নিশ্চয় কারণ আছে। যতোদূর দেখেছি, তিনি ভদ্রলোক, কারো মনে কষ্ট দেয়ার মানুষ নন।' নিজের প্লেটটা নিয়ে গিয়ে সিংকে ভেজালো সে। জেনারেল ডিকটার আর মিচেলের কথা ভাবলো। ইয়ার্ডে ওদেরকে দেখে কিভাবে মেডালটায় হাত চলে গিয়েছিলো কুপারের, মনে পড়লো।

'দুই মাথা ঈগল!' আনমনে বিড়বিড় করলো সে। ডরিকে বললো, 'তোমার নানা তো নানারকম উপহার পাঠাতো তোমাদেরকে। কখনও দুই মাথা ঈগল পাঠিয়েছিলেন?'

ভাবলো ডরি। তারপর মাথা নাড়লো। 'না। আম্মা পাখি পছন্দ করে। নানা তাকে নানারকম পাখি পাঠাতো। এই যেমন রবিন, ব্লুবার্ড, এসব। সবই অবশ্য চীনামাটির তৈরি। তবে দুই মাথা ঈগল কখনও পাঠায়নি।'

'কিন্তু নিজে একটা ঈগলের মডেলকে মেডাল বানিয়ে গলায় পরেন। এখানে কলসি, চীনামাটির ফলকের ওপর ওই ঈগল এঁকে রেখেছেন। একটা শূন্য ঘরে

এতোবড় ফলকে ঈগল এঁকে রাখার কি দরকার?'

বাসন ধোয়া শেষ করে একটা তোয়ালেতে হাত মুছে সিঁড়ির দিকে চললো কিশোর। অন্য তিনজনের খাওয়া তখনও শেষ হয়নি। ওগুলো ওভাবে ফেলে রেখেই তার পেছন পেছন চললো ওরা। চলে এলো সেই ঘরটায়, যেটাতে বিছানা পেতেছে এলিজা।

ম্যানটেলের ওপর থেকে কড়া চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো লাল ঈগল।

ফলকটার ধারগুলোয় হাত বুলিয়ে দেখলো কিশোর।

নিজের ঘরে ছুটে গেল ডরি। ফিরে এলো নখ ঘষার একটা রেত নিয়ে। 'দেখ তো এটা দিয়ে হয় কিনা।'

রেতটা দিয়ে ফলকের ধারগুলো খুঁচিয়ে দেখলো কিশোর। 'নাহ্, হবে না। শক্ত করে লাগানো। মিস্টার কুপার ওটা বানিয়ে লাগিয়ে দিয়েছেন দেয়ালের সঙ্গে।'

কয়েক পা পিছিয়ে এসে পাখিটার দিকে ভালো করে তাকালো সে। 'কিন্তু করলো কিভাবে কাজটা, একা? এতোবড় একটা ফলক, বেজায় ভারি হওয়ার কথা।'

'করেছে কোনোভাবে,' ডরি বললো।

'দাঁড়াও! ফলকটা বোধহয় আস্ত নয়। ছোট ছোট করে বানিয়ে জোড়া দেয়া হয়েছে। এই, একটা চেয়ার নিয়ে এসো তো। ওপরে উঠে দেখি।'

রান্নাঘর থেকে গিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে এলো মুসা। ওটার ওপর উঠে ঈগলটার একটা চোখে আঙুল রাখলো কিশোর। 'এটা অন্য চোখগুলোর মতো নয়।' বলতে বলতেই টিপে দিলো চোখটা। আঙুলের চাপে দেবে গেল ওটা। কিট করে মৃদু একটা শব্দ হলো। ম্যানটেলের ওপরের কাঠের দেয়ালটা সামান্য সরে গেল।

'গোপন দরজা,' অবাক হয়নি কিশোর। 'কিছু কিছু বুঝতে পারছি এবার।' কি বুঝলো সে, অন্যেরা সেটা বুঝতে পারলো না। চেয়ার থেকে নেমে এসে, সরে যাওয়া দেয়ালের একটা ধার ধরে টানলো সে। নিঃশব্দে খুলে গেল চারকোণা কাঠের প্যানেল। ভেতরে ছয় ইঞ্চি গভীর একটা দেয়াল আলমারি বসানো, চারটে তাক রয়েছে। সেগুলোতে ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়েছে কাগজপত্র। একটা কাগজ বের করে আনলো সে।

'রেজিস্টার অ্যাণ্ড ট্রিবিউন!' চেঁচিয়ে উঠলো ডরি। 'বেলিভিউর পুরনো পত্রিকা!' কিশোরের হাত থেকে পত্রিকাটা নিয়ে দেখলো সে। 'এটাতেই আমার কথা লেখা হয়েছিলো!'

'তোমার কথা?' রবিন জানতে চাইলো, 'কোনো খবর-টবর?'

'একটা রচনা প্রতিযোগিতায় জিতেছিলাম।'

আরেকটা কাগজ খুললো কিশোর, আরও বেশি পুরনো। 'তাতে রয়েছে এলিজার বিয়ের খবর।'

আরও কাগজ পাওয়া গেল, সেগুলোতে রয়েছে ডরিদের নানা খবর, সে কবে জন্মেছে, কবে তার নানীর মৃত্যু হয়েছে, ইত্যাদি। মরগান হার্ডওয়্যার স্টোরের মহাসমারোহে শুভ উদ্বোধনের কথাও লেখা হয়েছে ফলাও করে। একটা বক্তৃতা হুবহু তুলে দেয়া হয়েছে। ভেটিরান'স ডে-তে বক্তৃতা দিয়েছিলো ডরির বাবা। মরগানদের সমস্ত খবর সময়ে সময়ে ছেপে দিয়েছে পত্রিকাটা, আর সেগুলোর কপি সব সযত্নে তুলে রেখেছে কুপার।

'এটা একটা গোপন লাইব্রেরি,' মুসা বললো ডরিকে। 'তোমাদের সমস্ত খবর সংগ্রহে রেখেছেন তোমার নানা, খুব সাবধানে সেগুলো গোপন করে রেখেছেন।'

'তাতে কি বোঝা যায়?' ভুরু নাচালো ডরি।

'তোমাদের খবর এখানে কাউকে জানতে দিতে চাননি কুপার,' জবাব দিলো কিশোর। 'তোমরা যে আছো, সেটাই গোপন করে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত, তাই না? আরও অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তোমাদের সমস্ত খবর আছে এখানে, কিন্তু তাঁর নিজের একটা খবরও নেই।'

'কাগজে নিজের নাম ছাপানো পছন্দ করেন না কুপার,' মুসা বললো। 'আমি অন্তত শুনিনি কখনও ছাপতে দিয়েছেন।'

'ঠিক। অথচ কাল হিলটপ হাউসের লোকগুলো বললো, কুপার পত্রিকার খবর হন। ওরকম আর্টিক্যাল ছাপা হলে তোমার নামে, তুমি কি করতে? কেটেছেঁটে যত্ন করে রেখে দিতে না?'

'হ্যাঁ, রাখতাম,' রবিন বললো।

'তার অর্থ দাঁড়ালো, ওসবে আগ্রহ নেই কুপারের। কিংবা কোনো কারণে রাখাটা বিপজ্জনক মনে করেছেন। তাঁকে জানিয়ে তাঁর সম্পর্কে কেউ কিছু লিখতে পারেনি পত্রিকায়। ওয়েস্টওয়েজ-এ যে ছবিটা বেরিয়েছে, তা-ও তিনি জানেন না বলে। জেনেছেন গত শনিবারে, আমাদের ইয়ার্ডে গিয়ে। দেখে একটুও খুশি হয়েছেন বলে মনে হলো না।'

'কেন?'

'আমার বিশ্বাস, তোমাদের কথা যেমন গোপন রাখতে চেয়েছেন, নিজেকেও তেমনি লুকিয়ে রাখতে চেয়েছেন। আর তার জোরালো কারণ নিশ্চয় আছে। কাল রাতে হিলটপ হাউসের দুই ভাড়াটেকে যথেষ্ট আগ্রহী মনে হয়েছে তাঁর সম্পর্কে। ওয়েস্টওয়েজে মিস্টার কুপারের ছবি ছাপা হওয়ার প্রায় দুই মাস পরে রকি বীচে এলো ওরা। কিছু বুঝলে?'

'কোনোখান থেকে পালিয়ে এসেছে নানা,' ডরি বললো। 'কারো ভয়ে। কিন্তু

কার ভয়ে?'

'লাপাথিয়ার ব্যাপারে কিছু জানো তুমি?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'শুনিইনি কখনও। কি ওটা?'

'ইউরোপের ছোট্ট একটা দেশ। অনেক বছর আগে একটা অভ্যুত্থান হয়েছিলো ওখানে।'

হাত নাড়লো ডরি। 'কি জানি, বলতে পারবো না। নানীর কাছে শুনেছি, ইউক্রেইন থেকে এসেছে আমার নানা।'

'আজিমভ নামটা শুনেছো কখনও?'

'না।'

'তোমার নানার আগের নাম হতে পারে ওটা। পরে বদলে কুপার রেখেছেন।'

'না। অন্য নাম ছিলো তার। দিমিত্রি কি যেন?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'প্রশ্ন হচ্ছে, এতো কষ্ট করে কাগজগুলো লুকাতে গেলেন কেন তিনি? আরো তো সহজ উপায় ছিলো। পুরনো কাগজপত্রের সঙ্গে ফাইলে ঢুকিয়ে রেখে দিতে পারতেন, কে দেখতে আসতো? ফাইলের পুরনো বিলের সঙ্গে রাখতে পারতেন, এডগার অ্যালান পো-র দা পারলয়নড লেটার গল্পের মতো।'

ভারি ফলকটার গায়ে হাত রাখলো মুসা। 'হ্যাঁ, তাহলে সহজ হতো। ভালোও হতো। শূন্য ঘরে এরকম একটা ছবি আঁকা ফলক তো বরং দৃষ্টি আকর্ষণ করে লোকের। আমাদের যেমন করলো। আর খুঁজতে খুঁজতে পেয়েও গেলাম।'

'অথচ নিশ্চয়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করুক, এটা চাননি মিস্টার কুপার।'

ম্যানটেলের নিচে ফায়ারপ্লেসটা পরীক্ষা করার জন্যে ঝুঁকলো কিশোর। পরিষ্কার। দেখে মনে হয়, কোনোদিন আগুনই জ্বালানো হয়নি ওটাতে। হাত-পায়ের ওপর ভর দিয়ে ফায়ারপ্লেসের ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিলো সে। ওপরে তাকালো। 'চিমনি নেই। ফায়ারপ্লেসটা একটা ফাঁকিবাজি।'

'কুপারই হয়তো বানিয়েছিলেন,' রবিন বললো। 'তার পর আর জ্বালাননি।'

'তাহলে এই জালিটা কেন এখানে?' ফায়ারপ্লেসের মেঝেতে বসানো ধাতব জালিটা তুলে আনলো কিশোর। 'আগুন জ্বাললে, ছাই নিচে পড়ে যাওয়ার জন্যে বসানো হয় এই জালি। কিন্তু যেখানে আগুনই জ্বালানো হয়নি, সেখানে কেন?'

জালিটা যেখানে বসানো ছিলো, তার নিচের ফোকরে হাত ঢুকিয়ে দিলো সে। হাতে লাগলো কাগজ। 'কিছু আছে এখানে!' চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'একটা খাম!' দু'আঙুলে কোণা টিপে ধরে খামটা বের করে আনলো গর্ত থেকে। জালিটা জায়গামতো বসিয়ে দিলো আবার।

বাদামী রঙের একটা ম্যানিলা খাম, লাল গালা দিয়ে সীল করা।

'গোপন লাইব্রেরিটা আরেকটা ফাঁকিবাজি,' ঘোষণা করলো কিশোর, 'ধোঁকা

দেয়ার জন্যে। আসল জিনিস রাখা হয়েছিলো এখানে। ডরি, কি করি বলো তো? জিনিসটা তোমার নানার। তিনি নেই। না বলে অন্যের জিনিস খোলাটা...অবশ্য তুমি আছো, তাঁর নাতি। কি করবো?'

'খুলে ফেলো,' একটুও দ্বিধা করলো না ডরি। ভেতরে কি আছে দেখার আগ্রহ অন্য কারো চেয়ে কিছু কম নয় তার।

'জানতাম, একথাই বলবে,' বিড়বিড় করলো রবিন।

গালাটা ভাঙলো কিশোর।

'খোলো,' ভেতরে কি আছে দেখার তর সইছে না ডরির।

ভারি পার্চমেন্ট কাগজ রয়েছে এক তা। তিন ভাঁজ করা। সাবধানে ভাঁজগুলো খুললো কিশোর, যাতে ছিঁড়েটিড়ে না যায়।

'কি এটা?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এলো ডরি।

ভ্রূকুটি করলো কিশোর। 'জানি না। কোনো ধরনের সার্টিফিকেট হবে। ডিপ্লোমা, কিংবা ডিগ্রি, তবে বড় মাপের কিছু নয়।'

কিশোরের গায়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে এসেছে তিনজনে।

'ভাষাটা কি?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

মাথা নাড়লো রবিন। 'জীবনেও দেখিনি এরকম লেখা।'

জানালার সামনে বেশি আলোতে এসে দাঁড়ালো কিশোর। লেখাটা পড়ার চেষ্টা করলো। 'দুটো জিনিস বুঝতে পারছি,' অবশেষে বললো সে। 'এক, নিচের সীলটা। আমাদের অতি পরিচিত দুই মাথা ঈগল। আরেকটা একটা নাম, কারিনভ। কোনো এক সময়ে, কোনো একজন মানুষ দিমিত্রি কারিনভ নামের একজনকে এই সম্মানপত্রটা দিয়েছিলো। নামটা কি চেনা লাগছে, ডরি?'

'না। এটা নানার নাম নয়। তাঁর নামের শেষটা আরও লম্বা। উচ্চারণ করা কঠিন।'

'রবিন, তোমার মনে আছে?'

'আছে। কারিনভ হলো সেই শিল্পীর নাম, যিনি ফেডারিক আজিমভের মুকুটটা তৈরি করেছিলেন।'

কিশোর আর রবিনের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো ডরি, কিছু বুঝতে পারছে না। 'ফেডারিক আজিমভ কে?'

'লাপাথিয়ার প্রথম রাজা,' কিশোর বললো। 'চারশো বছরের বেশি আগে সিংহাসনে বসেছিলেন।'

'কিন্তু তার সাথে আমার নানার সম্পর্ক কি?'

'জানি না এখনও। তবে জানার চেষ্টা করছি।'

৬.

বারো

আবার তাকের মধ্যে খবরের কাগজগুলো আগের মতো করে রেখে দিলো কিশোর। প্যানেলটা লাগিয়ে দিলো।

'তোমার আমার আসার-সময় হয়ে গেছে,' ডরিকে বললো সে। 'পুলিশও আসতে পারে সাথে। এগুলো ওদেরকে দেখাতে চাই না। নিশ্চয় তোমার নানাও চান না। পুলিশ নিজে নিজে বের করতে পারলে করুকগে।' ডরির মুখের দিকে তাকালো। 'খামটা কি করি, বলো তো?'

মাথা চুলকালো ডরি। 'তদন্ত চালাতে দরকার হবে বলে মনে করলে রেখে দাও। তবে নষ্ট করো না। হয়তো নানার জন্যে খুব মূল্যবান জিনিস। আচ্ছা. খবরের কাগজগুলো যদি সত্যিই পুলিশ দেখে ফেলে?'

'তেমন কোনো ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না।'

জানালার বাইরে চোখ পড়তেই বলে উঠলো রবিন, 'ওই যে, এসে গেছেন।'

'সঙ্গে পুলিশ আছে?'

'আছে। নিজেদের গাড়ি নিয়ে এসেছে পুলিশ।'

'খাইছে! প্লেটগুলো!' চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

'ঠিক!' বললো কিশোর। চারজনেই দৌড় দিলো রান্নাঘরের দিকে।

গাড়ি পার্ক করে, চত্বর পেরিয়ে এলিজা সদর দরজায় আসতে আসতে গরম পানিতে সিংক ভরে ফেলেছে কিশোর। ডরি আর মুসা বাসন ধোয়ায় ব্যস্ত। তোয়ালে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন, মুছে জায়গামতো নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে রাখবে।

'বাহ্, চমৎকার!' খুশি হয়ে বললো এলিজা, মেজাজ কিছুটা ভালো হয়েছে।

'দারুণ আপনার রান্না; মিসেস মরগান,' প্রশংসা করলো মুসা। 'প্রচুর খেয়েছি।'

অফিসার ম্যাকেনা এসেছে। সঙ্গে আজ চীফ ইয়ান ফ্লেচারও এসেছেন। মিসেস মরগানের পেছন পেছন ঢুকলেন দু'জনে। অন্য তিনজনের দিকে একবার তাকিয়েই কিশোরের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন চীফ। 'কাল রাতে খবর দাওনি কেন আমাকে?'

'মিসেস মরগানের অবস্থা ভালো ছিলো না,' জবাব দিলো কিশোর।

একটা দীর্ঘ নীরব মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। ছেলেটার স্বভাব ভালো করেই জানা আছে তাঁর। ইচ্ছে করে কিছু না বললে পেটে বোমা মারলেও যে কথা বের করা যাবে না, জানেন। তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে ম্যাকেনাকে বললেন. 'ভালো করে খোঁজো বাড়িটা।'

'খুঁজেছি, চীফ,' আগ বাড়িয়ে বললো কিশোর। 'কেউ নেই। আগুন জ্বালানো পায়ের ছাপের কোনো হদিস পাবেন না।'

ভুরু কোঁচকালেন চীফ। 'আমাদের মতো করে খুঁজলে কি আপত্তি আছে তোমার?'

'না, স্যার।'

'তাহলে চুপ করে থাকো।' অধৈর্য ভঙ্গিতে বললেন পুলিশ চীফ। 'যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। কাজ করতে দাও আমাদের। বেজবল-টেজবল কিছু একটা খেলো গিয়ে।'

চত্বরে বেরিয়ে এলো ছেলেরা।

'সব সময়ই এরকম মেজাজ খারাপ করে রাখেন নাকি?' ডরি জিজ্ঞেস করলো।

'না,' হেসে বললো মুসা। 'কিশোর যখন তথ্য লুকিয়ে রাখে, আর রেখেছে সেটা বুঝে ফেলেন, তখনই রেগে যান।'

'তাহলে বলে দিলেই হয়।'

'ওর নাম কিশোর পাশা। সময় না হলে একটা শব্দও বের করা যাবে না ওর মুখ থেকে।'

ওকে নিয়ে যখন এহেন কথাবার্তা চলছে, কিশোর তখন তাকিয়ে রয়েছে সিঁড়িতে বসানো কলসিদুটোর দিকে। জালার মতো বড় বড় কলসির দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেছে তার।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলো রবিন।

'দেখছো না!' ফিসফিস করে বললো কিশোর, যেন অন্য কারো শুনে ফেলার ভয় আছে। বিস্মিত কণ্ঠস্বর। 'এখানে একটা ঈগলের মাত্র একটা মাথা!'

তাই তো! আগে চোখে পড়েনি কেন?—অবাক হয়ে ভাবলো রবিন আর মুসা। পাখিটার ডানদিকের মাথাটা নেই। ফলে সাধারণ ঈগল মনে হচ্ছে এখন ওটাকে।

'ইনটারেসটিং,' আনমনে বিড়বিড় করলো কিশোর।

সবগুলো পাখি আরেকবার ভালো করে দেখলো রবিন। শুধু ওই একটা বাদে বাকি সবগুলোর দুটো মাথা। 'সব দুটো করে।'

'হয়তো ভুলে এক মাথা বানিয়ে ফেলেছে নানা,' ডরি বললো।

'এরকম ভুল কুপার করেননি,' বিশ্বাস করতে পারলো না কিশোর। 'অত্যন্ত শান্ত মাথায় ভেবেচিন্তে ডিজাইন করেন তিনি। তাঁর জিনিসে খুঁত থাকে না।'

'আরেকটা চিহ্ন হতে পারে এটা,' আন্দাজ করলো রবিন। 'বেডরুমের গোপন কুঠুরীটার মতো। দেখো তো কিছু আছেটাছে কিনা?'

কলসির মুখটা খোলার চেষ্টা করলো কিশোর। নড়লো না ওটা। সিঁড়িতে সিমেন্ট দিয়ে আটকানো রয়েছে কলসিটা। ঈগলের চোখ টিপে দেখলো। কিছু

হলো না।

বেরিয়ে এলেন চীফ ফ্লেচার।

কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'কিছু পাওয়া গেল?'

'না,' গম্ভীরমুখে জবাব দিলেন চীফ।

ছাপের মধ্যে কেমিক্যালের গন্ধ ছিলো, একথা বললো কিশোর।

'কিসের গন্ধ বুঝতে পেরেছো? প্যারাফিন?'

'না। একেবারে অপরিচিত। তীব্র, অ্যাসিড অ্যাসিড গন্ধ।'

'হুঁম্। পোড়া লিনোলিয়ামের ছাই ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। দেখা যাক, ওরা কিছু বের করতে পারে কিনা। আর কিছু বলার আছে তোমার?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মাথা নাড়লো কিশোর, 'না, স্যার।'

এখানে আর কিছু করার নেই। ডব্লির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে চললো তিন গোয়েন্দা।

ইয়ার্ডের গেটে পৌছে সাইকেল থামালো কিশোর। দেখাদেখি রবিন আর মুসাও থামলো। কিশোর বললো, 'আমাদের ওই নতুন মাছশিকারী মিস্টার নিমেরো এর মধ্যে নেই তো?'

'থাকতেও পারে,' রবিম বললো। 'একটু বেশিই ঘুরঘুর করছে সে মিসেস মরগানের আশেপাশে।'

'ঠিক।' পকেট থেকে খামটা বের করলো কিশোর, ফায়ারপ্লেসের নিচে লুকানো কুঠুরীতে যেটা পাওয়া গেছে। রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, 'ভাষাটা কাউকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে আনতে পারবে?'

'চেষ্টা করতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওটা লাপাথিয়ান।'

'বুঝতে পারলে ভালো হয়। আজিমভ আর কারিনভের ব্যাপারে হয়তো নতুন কিছু জানা যাবে।'

খামটা পকেটে ফেলে রওনা হয়ে গেল রবিন।

'নটা বাজে,' মুসা বললো। 'আমিও যাই। মা চিন্তা করবে।'

'এখনই যাবে? আমি ভাবছিলাম মিস হবসনের সঙ্গে আরেকবার দেখা করবো।'

'ওশনসাইডের মালিক? তার সাথে কথা বলে কি হবে?'

'লোকের সম্পর্কে আগ্রহ আছে মহিলার। আমাদের নতুন মাছশিকারী ওই সরাইতেই উঠেছে। নিশ্চয় তার ওপর কড়া নজর রেখেছে মিস হবসন।'

'বেশ, চলো তাহলে। কিন্তু বেশি দেরি করতে পারবো না।'

সরাইয়ের লবিতে পাওয়া গেল মিস হবসনকে, কথা বলছেন পরিচারিকা অ্যানির সঙ্গে। 'লিখে যখন রেখেছে, যাবে না। মেহমানদের বিরক্ত করা উচিত না।'

রাগ করে বললো অ্যানি, 'থাকুক নোংরার মধ্যে।' ঘর পরিষ্কারের জিনিসপত্র বোঝাই ট্রলিটা ঠেলতে ঠেলতে চলে গেল সে।

'কি হয়েছে, মিস হবসন?' এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'আরে, কিশোর। মুসাও এসেছো। না, তেমন কিছু না। দরজায় "বিরক্ত করবেন না" নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে মিস্টার নিমেরো। তাই অ্যানি ঢুকতে পারছে না। রেগুলার কাজগুলো করতে না পারলে বিরক্ত হয় সে।'

এক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন মিস হবসন, 'কাল রাত তিনটেয় ফিরেছে মিস্টার নিমেরো।'

'ইনটারেসটিং,' কিশোর বললো। 'বেশির ভাগ মাছশিকারীরা সকাল সকাল শুয়ে পড়ে, ভোরে উঠে ছিপ নিয়ে চলে যায়।'

'মাছের চেয়ে মিসেস মরগানের ওপরই আগ্রহ বেশি লোকটার। তার ওখানে থাকেনি তো?'

'না, মিস হবসন। আমরা ওখান থেকেই আসছি। রাতে মিসেস মরগানের ওখানে ছিলো না।'

'এতোটা সময় তাহলে ছিলো কোথায়? থাকুকগে, যেখানে খুশি। মিসেস মরগানের খবর কি? সকালেই বেরোতে দেখলাম?'

'থানায় গিয়েছিলো। রিপোর্ট লেখাতে। বাবাকে ফিরে পেতে চায় সে।'

'চাইবেই। কুপারটাও কেমন? মেয়ে আর নাতিকে আসতে বলে নিজেই গায়েব। লোকটার স্বভাব-চরিত্র সব সময়ই অদ্ভুত।'

'একেবারে,' মাথা দোলালো মুসা।

'আচ্ছা, চলি, মিস হবসন,' কিশোর বললো। 'মিসেস মরগানের কথাই জানাতে এসেছিলাম আপনাকে। আপনার গেস্ট ছিলো। ভাবলাম, তার কথা হয়তো জানতে চাইবেন। এপথ দিয়েই যাচ্ছিলাম তো, তাই…'

'খুব ভালো করেছো।'

'আশা করা যায় দুপুর নাগাদ ঘুম থেকে উঠবে মিস্টার নিমেরো।'

তাহলে খুশি হবে অ্যানি। লোকটার কপালই খারাপ। মাছ ধরতে এসে এখানে উঠে এতো টাকা খরচ করছে। অথচ কিছুই করতে পারছে না।'

'পারছে না মানে?'

'চারদিন ধরে আছে, একটা মাছও ধরতে পারছে না, এই আরকি।'

'হ্যাঁ, খুব খারাপ,' বলে মুসাকে নিয়ে সরে এলো কিশোর।

'রাত তিনটে পর্যন্ত কোথায় ছিলো লোকটা?' মুসার প্রশ্ন।

'রকি বীচে থাকার অনেক জায়গা আছে। হতে পারে, চাঁদের আলোয় মাছ ধরার চেষ্টা করেছে। বন্দুক নিয়ে পাহাড়ে ঝোপের মধ্যেও অপেক্ষা করতে পারে। কিংবা জ্বলন্ত পায়ের ছাপ দেখিয়ে লোককে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে থাকতে

পারে।'

'আমার ধারণা, শেষটাই করেছে ও। কিশোর, কুপারের বাড়িতে অনেকগুলো ঘর আছে, যেগুলোতে ঢুকতে পারিনি। তালা লাগানো। নিমেরোও নিশ্চয় ওগুলোতে ঢুকতে পারেনি।'

'তবে কেউ একজন নিশ্চয়ই ঢুকেছে।'

'একমাত্র কুপার হতে পারে। কারণ চাবিগুলো তার কাছেই থাকা সম্ভব।'

'আবার সেই পুরনো প্রশ্ন, কেন?'

'কারণ মেহমান পছন্দ করে না সে। তার বাড়িতে লোক থাকুক, এটা চায় না।'

'কিন্তু লোকগুলো তার পর নয়। নিজের মেয়ে আর নাতি।'

'তাহলে আর একটা জবাবই হতে পারে। মরে গিয়ে ভূত হয়ে ফিরে এসেছে।' ঘড়ি দেখলো মুসা। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর থাকতে পারছি না। আমি গেলাম।' সাইকেলে চেপে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

তেরো

ইয়ার্ডে কিছু জরুরী কাজকর্ম ছিলো, সেগুলো সেরেটেরে দুপুরের পর থানায় চললো কিশোর। ডেস্কের ওপাশে চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসে ছিলেন চীফ ফ্লেচার, কিশোরকে দেখে সোজা হলেন। 'কি ব্যাপার?'

'ওশনসাইডে একটা লোক উঠেছে,' ভূমিকা না করে বললো কিশোর, 'মিসেস মরগানের ওপর আগ্রহটা খুব বেশি।'

'সুন্দরী মহিলার ওপর পুরুষের নজর থাকবেই। মিসেস মরগান কচি খুকি নয়, নিজের ভালোমন্দ বোঝে।'

'সেকথা বলছি না। লোকটা নিজেকে মাছশিকারী বলে পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু কিছুই ধরতে পারছে না।'

'ভাগ্য খারাপ।'

'তা হতেই পারে। তবে অনেকগুলো ব্যাপার ঘটেছে, যাতে সন্দেহ জাগে। আমাকে যেদিন কুপারের বাড়িতে ধাক্কা দিয়ে ফেলা হলো, সেদিন কুপারের বাড়ির কাছাকাছি ছিলো তার গাড়িটা। কাল রাতে সে এসে মিসেস মরগানের সাথে দেখা করে যাবার পরই সবুজ আগুন জ্বলেছিলো। তারপর রয়েছে তার কাপড়চোপড়।'

'কাপড়চোপড়?'

'সব ঝকঝকে নতুন। মাছশিকারীর ওরকম হয় নাকি? দেখে মনে হয় ফিল্মের লোক। কাপড়ের সাথে আবার গাড়িটার মিল নেই, বেমানান। লোকটার নাম নিমেরো। তার গাড়িটার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পারেন, কিছু

বেরোয় কিনা।'

'মানুষের স্বভাব বড় বিচিত্র, কিশোর, সেটা তুমিও কম জানো না। কাপড়ের সাথে গাড়ির মিল অনেকেরই থাকে না, তাতে কি? আমি কিন্তু তেমন সন্দেহ করতে পারছি না লোকটাকে, অবশ্য তোমার কথা শুনে। দেখলে হয়তো আরেক রকম মনে হতে পারে।'

বার দুই নিজের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'আচ্ছা, পোড়া লিনোলিয়ামের খবর কি?'

'এখনও জানি না।' একটা ফাইল টেনে নিলেন চীফ। 'আর কিছু বলবে?'

'নাহ্। গাড়িটার ব্যাপারে খোঁজ নেবেন তো?'

'না, আপাতত নেয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। লোকটা অপরাধ করেছে, এটা যতোক্ষণ না বুঝবো, খোঁজ নেয়াটা উচিত হবে না, বুঝতেই পারছো। এমনিতেই পুলিশের ওপর মানুষের রাগ। অহেতুক মানুষকে বিরক্ত করে সেটা আরও বাড়াতে চাই না।'

চীফের কাছ থেকে কোনোই সাহায্য না পেয়ে কিছুটা হতাশই হলো কিশোর। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলো থানা থেকে। চললো ওশনসাইড সরাইখানায়।

পার্কিং এরিয়ায় ফোর্ড গাড়িটা না দেখে খুশিই হলো সে। এখন নিশ্চয় মিস হবসনও কাউন্টারে নেই, এ-সময়টা তাঁর দিবানিদ্রার সময়। গেস্টদের দেখাশোনা এ-সময়টায় অ্যানিই করে।

লবিটা এখন নির্জন। ডেস্কের পেছনের দরজাটা বন্ধ। পা টিপে টিপে ডেস্কের কাছে চলে এলো কিশোর। নিমেরোর ঘরের নম্বরটা জানা নেই। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে চট করে রেজিস্টারটা টেনে নিলো। লোক বেশি নেই সরাইখানায়। নম্বরটা জানতে দেরি হলো না। একশো আট নম্বর। দেয়ালে ঝোলানো কী-বোর্ড থেকে চাবিটা তুলে নিয়ে চললো ওই ঘরের দিকে।

বারান্দায় থাকার কথা অ্যানির, কিন্তু নেই। বাথরুমে-টুমে গেছে হয়তো, কিংবা অন্য কোথাও, কাজে।

একশো আট নম্বরের সামনে পৌঁছে দরজায় কান পাতলো কিশোর। শব্দ নেই ভেতরে। আস্তে টোকা দিয়ে ডাকলো, 'মিস্টার নিমেরো?'

আরও একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে তালার ফোকরে আস্তে চাবিটা ঢুকিয়ে মোচড় দিয়ে খুলে ফেললো। পাল্লা সামান্য ফাঁক করে আবার ডাকলো নিমেরোর নাম ধরে। কিন্তু কেউ নেই ভেতরে।

ভেতরে ঢুকে দরজাটা লাগিয়ে দিলো কিশোর। খুঁজতে আরম্ভ করলো। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার, ডেস্কের ড্রয়ারগুলোতে কিছু পাওয়া গেল না। ওয়ারড্রোবের মধ্যে রয়েছে কিছু নতুন জামাকাপড়, পকেটগুলো খুঁজে দেখলো সে। খালি।

এরপর নজর দিলো সে দুটো স্যুটকেসের দিকে। দুটোর একটাতেও তালা

লাগানো নেই। একটাতে নতুন-পুরনো মিলিয়ে আরও কিছু কাপড়চোপড় আর জুতো। দ্বিতীয়টায়ও কাপড়, সব নতুন, লস অ্যাঞ্জেলেসের বিভিন্ন দোকানের লেবেল লাগানো।

একটা শার্টের দাম লেখা ট্যাগটা উল্টে দেখেই চমকে গেল সে। এতো দাম! কাপড়ের নিচে পাওয়া গেল একটা খবরের কাগজ, লস অ্যাঞ্জেলেস টাইমসের একটা কপি। 'পার্সোন্যাল' কলামের একটা আইটেমের চারপাশে গোল দাগ দেয়া। তাতে লেখাঃ মিখাইল, আমি অপেক্ষায় আছি। লিখঃ দিমিত্রি, পো, অ. বক্স নম্বর ১১২, রকি বীচ, ক্যালিফোর্নিয়া।

পত্রিকাটার নিচে এক টুকরো নিউজপ্রিন্ট কাগজ পাওয়া গেল। নিউ ইয়র্ক ডেইলি নিউজের ক্ল্যাসিফাইড সেকশনের অংশ ওটা। একই ধরনের বিজ্ঞপ্তি রয়েছে ওটাতেও। শিকাগো ট্রিবিউনের একটা কপি আছে স্যুটকেসে, তাতেও একই বিজ্ঞপ্তি। তিনটে কাগজেরই তারিখ এক, ২১, এপ্রিল।

আবার আগের মতো করে কাগজগুলো সাজিয়ে রেখে তার ওপর কাপড়গুলো রাখলো এমন ভাবে, যাতে বোঝা না যায় ওগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছিলো। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল সে, আর যে কারণেই আসুক, মাছ ধরার জন্যে অন্তত আসেনি নিমেরো।

বাথরুমে এসে ঢুকলো কিশোর। সাধারণত যা থাকে, সাবান, শেভিঙের সরঞ্জাম, তোয়ালে আর কিছু টুকিটাকি জিনিস রয়েছে। বেরোতে যাবে এই সময় বারান্দায় পায়ের শব্দ কানে এলো। তার পর পরই তালায় চাবি ঢোকানোর আওয়াজ। পাগলের মতো লুকানোর জায়গা খুঁজতে শুরু করলো সে। খাটের নিচে ঢোকা উচিত হবে না। ওয়ারড্রোবটার দিকে তাকিয়ে রইলো একটা মুহূর্ত। আর কোনো উপায় না দেখে ওটার ভেতরেই এসে ঢুকলো। লুকিয়ে পড়লো ঝোলানো জ্যাকেট আর শার্টের আড়ালে।

ঘরে ঢুকলো নিমেরো। বিছানার কাছে থামলো কয়েক সেকেণ্ড, তারপর এগোলো বাথরুমের দিকে—শব্দ শুনেই আন্দাজ করতে পারছে কিশোর। বাথরুমের দরজা বন্ধ হলো। শোনা গেল পানি পড়ার শব্দ।

একটা মুহূর্ত আর দেরি করলো না কিশোর। ওয়ারড্রোব থেকে বেরিয়ে সোজা এগোলো দরজার দিকে। দরজা খুলে বেরিয়ে বন্ধ করতে যেতেই চোখে পড়লো জিনিসটা। বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে একটা পিস্তল।

চমৎকার! ভাবলো সে। ওরকম একটা পিস্তল দিয়ে কি করে মাছশিকারী?

চোদ্দ

সেদিন বিকেলে হেডকোয়ার্টারে মিলিত হলো আবার তিন গোয়েন্দা। মোটা মোটা

দুটো বই নিয়ে এসেছে রবিন। 'লাপাথিয়ান ডিকশনারি। লাপাথিয়ান টু ইংলিশ। ভীষণ কঠিন!' একটা বই দেখিয়ে বললো সে। 'আর এটা লাপাথিয়ার ইতিহাস। বাবাকে বলেছিলাম, লস অ্যাঞ্জেলেসের লাইব্রেরি থেকে এনে দিয়েছে।'

'এটা তো ডিকশনারির বাপ!' ভয়ে ভয়ে বইটার দিকে তাকালো মুসা। 'পড়বে কি করে?'

'কুপারের সার্টিফিকেটটার অনুবাদ করেছো?' রবিনকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'অনেকখানি। বাকিটা আন্দাজ করে নেয়া যায়। লেখা বেশি না। তবে ওটুকু করতেই জান বেরিয়ে গেছে।'

'কি লিখেছে?'

ডিকশনারির ভেতর থেকে পার্চমেন্টের কাগজটা বের করলো রবিন। আরেক টুকরো সাধারণ কাগজ বের করে রাখলো ওটার পাশে। ওটার দিকে তাকিয়ে বললো, 'মানেটা এরকম দাঁড়ায়। পঁচিশে আগস্ট, উনিশশো বিশ সাল। দিমিত্রি কারিনভ সম্রাটের আনুগত্য লাভে সমর্থ হইয়া, ডিউক অভ মেলিনবাদ নাম ধারণ করতঃ লাপাথিয়ার রাজদণ্ড এবং মুকুট রক্ষা করিবার দায়িত্ব লাভ করিল। প্রয়োজনে শত্রুর হাত হইতে সেগুলি রক্ষা করিবার জন্যে নিজের জীবন দান করিতেও দ্বিধা করিবে না, এই অঙ্গীকার করার পরই এই গুরুদায়িত্ব তাহার উপর অর্পণ করা হইল। সম্রাটের শান্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্বও তাহার ওপর অর্পিত হইল।'

মুখ তুললো রবিন। 'এইই। সইটা পড়তে পারিনি।'

'অথচ ওটাই সব চেয়ে জরুরী। আজিমভ না তো?'

'হতে পারে। কিছুই বোঝা যায় না।' দ্বিতীয় বইটা টেনে নিলো রবিন। কাগজ ঢুকিয়ে চিহ্ন দিয়ে রাখা একটা পৃষ্ঠা খুললো। 'লাপাথিয়ায় কারিনভরা অনেক উঁচু বংশের লোক। বোরিস কারিনভ যা-তা লোক ছিলেন না। শুধু মুকুটের ডিজাইন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। দুর্গের চারপাশে রাস্তা কোথায় কোথায় হবে তার পরিকল্পনাও তিনি করেছেন। ম্যাডানহফ দুর্গ বাড়ানোর বুদ্ধিটাও তাঁর মাথা থেকেই বেরিয়েছে। রাজা ফেডারিকের রাজদণ্ডের ডিজাইন করেন তিনি। তাঁকে এতোই পছন্দ করে ফেলেন রাজা, মেলিনবাদের ডিউক বানিয়ে দেন। এর আগে মেলিনবাদের শাসনকর্তা ছিলো ইভান দা বোল্ড।'

'এক সেকেণ্ড,' বাধা দিলো মুসা। 'ইভান দা বোল্ডই তো সেই লোক যে ফেডারিককে রাজা বলে মেনে নিতে চায়নি? এর ফলে খুন হতে হয় তাকে।'

'হ্যাঁ। এবং তার মাথা কেটে বর্শায় গেঁথে রেখে দেয়া হয় ম্যাডানহফ দুর্গের অস্ত্রাগারে। রাজকীয় মুকুটের জন্যে তার চুনী পাথরটা কেড়ে নেয়া হয়। সম্পত্তি জবর দখল করে নতুন শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। কারিনভরা আগে থেকেই

ধনী ছিলো, রাজার সহায়তায় ওসব সম্পত্তি আর ক্ষমতা পেয়ে আরও ধনী হয়ে যায়। এই বইটাতে কারিনভদের অনেক কথা লেখা আছে। বংশানুক্রমে কারিনভদের ছেলেরা মেলিনবাদের ডিউক হয়ে এসেছে। মুকুট আর রাজদণ্ড পাহারার দায়িত্ব নিয়েছে।'

বইয়ের আরেকটা পৃষ্ঠা খুললো রবিন। 'আজিমভদের চেয়েও কারিনভদের ইতিহাস বেশি ইনটারেসটিং। মেলিনবাদের পুরনো দুর্গে, অর্থাৎ ইভানের দুর্গে বাস করেছে তারা কিছু দিন। তারপর প্রায় তিনশো বছর আগে সেখান থেকে রাজধানী ম্যাডানহফে সরে আসে ওরা। কেন এসেছে সেটা আরও মজার।'

'কেন এসেছে?' জানতে চাইলো কিশোর।

'বিশ্বাস করা কঠিন। মেলিনবাদে একটা গণ্ডগোল হয়েছিলো। কারিনভদের একটা মেয়ে, ওলগা নাম, সে নাকি যাদু জানতো। ডাইনী বলতো লোকে।'

'বলে কি!' মুসার চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'সত্যি সত্যি ডাইনী ছিলো তাহলে আগের দিনে? ইতিহাসে যখন লেখা হয়েছে···তা, ডিউকের মেয়েকে ডাইনী বলার সাহস হয়েছিলো লোকের?'

'তখন সুন্দরী মহিলাদের বিপদ ছিলো বড় বেশি। কেউ আজব কিছু করে বসলেই তার ওপর সন্দেহ পড়তো লোকের। ডাইনী বলতে শুরু করতো। আর একবার কেউ ডাইনী বলে চিহ্নিত হয়ে গেলে তার আর নিস্তার ছিলো না। ওলগাও পায়নি। তবে সেটা অন্য কারণে। স্থানীয় সরাইখানার মালিকের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলো সে। তার বাবা ডিউক সেটা সহ্য করেনি। তাছাড়া সে-ও যাদুকর বলে কানাঘুষা শুরু করেছিলো লোকে। নিজের চামড়া বাঁচাতে আজিমভদের সাহায্য নিয়েছিলো সেই ডিউক। নিজের মেয়ের ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে, লোকের সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডাইনী খেতাব দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিলো।'

'খাইছে! এতোবড় পিশাচের কথা তো শুনিনি!'

'পুড়িয়ে মারলো!' সজাগ হয়ে উঠেছে কিশোর। 'এবং তার পরই মেলিনবাদ ছাড়লো ডিউকেরা?'

'হ্যাঁ। কারণ ওলগাকে পুড়িয়ে মারার পর থেকে দুর্গে ভূতের উপদ্রব শুরু হলো। নানা রকম কাণ্ডকারখানা শুরু করলো ভূতটা। তার মধ্যে একটা হলো···'

'জ্বলন্ত পায়ের ছাপ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর।

'হ্যাঁ। একটা লোকও আর থাকার সাহস করলো না দুর্গে। ধীরে ধীরে পোড়ো বাড়িতে পরিণত হলো সেটা, ধ্বংসস্তূপ হয়ে গেল। উনিশশো পঁচিশের বিদ্রোহের সময়ও রাজধানীতে ছিলো কারিনভরা, তারপর নিখোঁজ হয়ে গেল। সারা বইতে তারপর আর একবারও ওদের কারো উল্লেখ নেই।'

কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলো তিন গোয়েন্দা। অবশেষে কিশোর মুখ খুললো, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে রবিন। হেনরি কুপারের আসল নামটা বোধহয় আন্দাজ

করতে পারছি।'

'দিমিত্রি কারিনভ তো?'

'কিন্তু ডরি তো বললো অন্য নাম, লম্বা, উচ্চারণ করতে পারে না সে,' মনে করিয়ে দিলো মুসা। 'অনেকগুলো "সি" আর "জেড" আছে ওর মধ্যে।'

'নিশ্চয় ডরির নানীর কাছে সত্যি নামটা বলেনি কুপার, বানিয়ে শক্ত একটা নাম বলে দিয়েছে, যা উচ্চারণ করাও কঠিন।'

পাল্টা যুক্তি দেখাতে না পেরে চুপ করে রইলো মুসা।

'আর সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকতো কুপার,' আবার বললো কিশোর। 'দুটো-তিনটে করে তালা লাগিয়ে রাখতো দরজায়। এখনও তা-ই করে। কিছু একটা গোপন করে রাখতে চাইছে। মেসেজ পাঠানোরও চেষ্টা করেছে।'

'কি মেসেজ?' ভুরু কোঁচকালো রবিন।

ওশনসাইড ইনে গিয়ে নিমেরোর ঘরে কি দেখে এসেছে জানালো কিশোর।

'মিখাইল?'

'হ্যাঁ, মিখাইল,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর।

'কেন, পরিচিত লাগছে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা। 'তোমার ইতিহাস বইতে আছে নাকি নামটা?'

'লাপাথিয়ার রাজা উইলিয়াম ফোর-এর ছেলের নাম ছিলো মিখাইল।' বইয়ের কয়েকটা পাতা উল্টে নিয়ে কিশোর আর মুসার দিকে ঠেলে দিলো রবিন। বড় একটা ছবি রয়েছে। তাতে রাজা উইলিয়াম ফোর, তাঁর উচ্ছৃঙ্খল রানী, চার ছেলে, সবাই রয়েছে। বড় ছেলেটা লম্বা এক তরুণ, আর সব চেয়ে ছোটটির বয়েস দশ। 'রাজার পেছনের এই যে তরুণ, এ-ই হলোগে গ্র্যাণ্ড ডিউক মিখাইল।'

'এই উইলিয়াম ফোরই তো ব্যালকনি থেকে পড়ে মরেছিলেন,' কিশোর বললো। 'রানী মরেছে বিশ খেয়ে। মিখাইলের কি হলো?'

'শোনা যায়, ফাঁসিতে ঝুলে নাকি আত্মহত্যা করেছিলো।'

'অন্য ছেলেরা?'

'মাঝের দু'জনও নাকি ফাঁসি নিয়ে মরেছে। আর সব চেয়ে ছোটটা অসাবধানে বাথরুমের বাথটাবে পড়ে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে যায়, তারপর পানিতে ডুবে মারা যায়।'

'হুঁম্‌ম্‌!' নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটলো কিশোর। 'ধরে নিই, ডিউক মিখাইল আত্মহত্যা করেনি। তার বয়েস এখন কতো হবে?'

'নব্বইয়ের বেশি।'

'কুপারের বয়েস কতো, আন্দাজ করো তো?'

'ওরকমই হবে। কিশোর, কুপারই গ্র্যাণ্ড ডিউক মিখাইল?'

'না, আমার তা মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, কুপার হলো দিমিত্রি কারিনভ,

আজিমভ পরিবারের উচ্ছেদের দিন লাপাথিয়া থেকে পালায়। কোন মাসের কতো তারিখ ছিলো সেদিন, দেখো তো?'

বইয়ের পাতা ওল্টালো রবিন। 'একুশ এপ্রিল, উনিশশো পঁচিশ।'

'আর এবছরের একুশে এপ্রিল পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে দিমিত্রি নামের একজন, মিখাইল যেন দেখা করে তার সাথে। নিশ্চয় এটা কুপারের কাজ। সেটা চোখে পড়েছে নিমেরোর কিন্তু সে গ্র্যাণ্ড ডিউক মিখাইল হতেই পারে না। বয়েস অনেক কম।'

'হিলটপ হাউসের ওরাও নিশ্চয় এই বিজ্ঞাপন দেখেই হাজির হয়েছে,' রবিন বললো। 'জেনারেল চেক ডিকটার। খুনখারাপীতে সে-ও ছিলো। তারপর থেকেই শাসক জেনারেলদের একজন হয়ে আছে সে। চারশো তেত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় তার ছবি আছে।'

পৃষ্ঠাটা উল্টে নিলো কিশোর। 'ক্যাপশন বলছে, উনিশশো ছাব্বিশে এই জেনারেলের বয়েস ছিলো মাত্র আঠারো। তখনই সেনাবাহিনীর উঁচু পদের অফিসার। রাজাকে উচ্ছেদের কয়েক বছর পরেই জেনারেল হয়ে যায় সে। তখনও চুল ছিলো না তার, এখনও নেই। বুঝতে পারছি না, লোকটা জন্মটেকো, নাকি শেভ করে রাখে? এতো বয়েস হয়েছে, অথচ দেখে বোঝা যায় না, আশ্চর্য! লাপাথিয়ার মানুষগুলো বোধহয় বাঁচেই বেশিদিন।'

'আবহাওয়া হয়তো খুব ভালো। রাশিয়ার কিছু কিছু জায়গা আছে, যেখানকার মানুষেরা একশো বছর বয়েসেও ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে,' মুসা বললো, 'শুনেছি।'

'তা আছে,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'বয়েস কমিয়ে দেখানোর কিছু উপায় অবশ্য আছে। তুমি চুল আর ভুরু কামিয়ে ফেলো, বয়েস বোঝা যাবে না তোমার।'

'যাবে, যদি চামড়া কুঁচকে যায়।'

'কিন্তু জেনারেলের চামড়া কুঁচকায়নি। ওর বয়েস আর গ্র্যাণ্ড ডিউক মিখাইলের বয়েস এক। কুপারেরও। আমার মনে হয় না বিজ্ঞাপন দেখে রকি বীচে এসেছে ডিকটার, এসেছে আসলে ওয়েস্টওয়েজ ম্যাগাজিনে কুপারের ফটো দেখে। নিশ্চয় মিচেলের চোখে পড়েছে ওটা, কারণ লস অ্যাঞ্জেলেসে ব্যবসা করে সে। কুপারের গলার মেডালও দেখেছে। তারপর খবর পাঠিয়েছে লাপাথিয়ায়।'

'এবং খবর পেয়েই ছুটে এসেছে ডিকটার,' যোগ করলো রবিন।

'হ্যাঁ। একটা অত্যন্ত বাজে লোক। কিন্তু এসব জেনে ডরির উপকার করছি কিভাবে? একথা পরিষ্কার, কারিনভদের ইতিহাস আর ভূতুড়ে দুর্গের কাহিনী জানে, এমন কেউই এসে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করছে ওদের। এর একটাই ব্যাখ্যা। মূল্যবান কিছু রয়েছে বলে ভাবছে ওই বাড়িটাতে। মিসেস মরগান জানে না সেসব। ওরা বাড়িতে রয়েছে বলে সেই লোক খুঁজতেও আসছে না জিনিসটা।

কোনোভাবে যদি সরিয়ে দিতে পারতাম ওদেরকে ওই বাড়ি থেকে, তাহলে কাজ সহজ হয়ে যেতো আমাদের। হয়তো হাতেনাতে ধরে ফেলতে পারতাম।'

'ফাঁদ পাততে চাইছো,' মুসা বললো।

'হ্যাঁ। ডরি আর তার মা বাড়ি থেকে না বেরোলে হিলটপ হাউসের ওরা ঢুকতে আসবে না। নিমেরো যদি এসবে জড়িত থাকে, তাহলে সে-ও আসবে না। আর যতোক্ষণ এসবের সুষ্ঠু সমাধান না হচ্ছে, কুপারও বাড়ি ফিরবে না, নিরুদ্দেশ হয়েই থাকবে।'

'তাহলে মিসেস মরগানকে বাড়ি থেকে বের করা দরকার। তারপর কড়া নজর রাখবো আমরা।'

'কিন্তু বেরটা করবে কিভাবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'দেখি,' কিশোর বললো, 'বুঝিয়ে শুনিয়ে কিছু করা যায় কিনা।'

পনেরো

সন্ধ্যা সাতটার পরে কুপারের বাড়ি পৌঁছলো তিন গোয়েন্দা। দরজায় ধাক্কা দিয়ে নিজের নাম বললো কিশোর। ডরি খুলে দিয়ে বললো, 'এক্কেবারে সময়মতো এসেছো। আবার আগুন জ্বেলে দিয়ে গেছে।'

রান্নাঘরে চেয়ারে বসে রয়েছে এলিজা। তলকুঠুরীর দরজার কাছে জ্বলছে একজোড়া ছাপ, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিশোরদেরকে দেখে শান্তকণ্ঠে বললো, 'একবার দু'বার দেখলে শক লাগে। কিন্তু বার বার একই জিনিস দেখতে দেখতে সহ্য হয়ে যায় মানুষের, তখন আর কিছুই হয় না।'

'এটা জ্বলার আগে কোথায় ছিলেন?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ওপরে। ঠঙ করে একটা আওয়াজ শুনলাম। এসে দেখি ওগুলো জ্বলছে।'

'খুঁজবে নাকি বাড়িটায়?' ডরি জিজ্ঞেস করলো। 'আমি তাই করতে যাচ্ছিলাম, এই সময় তোমরা এলে।'

'লাভ হবে না।'

'এর আগেও তো আমরা খুঁজলাম,' মুসা বললো, 'পুলিশ খুঁজলো। কিছুই পাওয়া গেল না।'

'পুলিশের খবর কি?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর। 'কোনো খবর-টবর পেয়েছে?'

'নাহ্, কিচ্ছু না,' জবাবটা দিলো এলিজা।

'মিসেস মরগান,' আসল কথায় এলো কিশোর, 'আমরা ভাবছি, আপনার এখান থেকে সরে যাওয়া উচিত। যতো তাড়াতাড়ি পারেন, ততোই ভালো।'

'না, আমি যাচ্ছি না। বাবাকে দেখতে এসেছি, তার সঙ্গে দেখা না করে

কিছুতেই বেরোচ্ছি না আমি।'

'দেখা করতে তো অসুবিধে নেই,' নরম গলায় বললো রবিন। 'ওশনসাইড ইন কাছেই।'

'আর যদি ওখানে থাকতে না ভাল্লাগে,' এলিজাকে মুখ খুলতে দিলো না কিশোর, 'তাহলে আমাদের ইয়ার্ডে গিয়ে দু'এক দিন থাকতে পারেন। অনেক করে বলে দিয়েছে আমার চাচী।'

'রকি বীচ ছাড়তে বলা হচ্ছে না আপনাকে,' বললো মুসা, 'শুধু এই বাড়িটা থেকে চলে যান।'

এক এক করে তিনজনের মুখের দিকে তাকালো এলিজা। 'ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'আপনাকে যে ভয় দেখিয়ে বের করতে চাইছে কেউ, বুঝতে পারছেন না একথাটা?' কিশোর প্রশ্ন করলো।

'নিশ্চয় পেরেছি। প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বটে, এখন আর পাচ্ছি না। অতো সহজে আর ভয় দেখাতে পারবে না ওরা আমাকে।'

'এতো হালকা ভাবেও দেখবেন না ব্যাপারটা। যে লোক এই কাণ্ড করছে সে আপনার বাবাকে খুব ভালোমতো জানে। আমরা বাড়িটা খালি করে দেখতে চাইছি সে আসে কিনা। বেরিয়ে চলে যান, দিনের আলো থাকতে থাকতেই, যাতে আপনার চলে যাওয়াটা তার চোখে পড়ে। আমি, মুসা আর রবিন পাহারা দেবো বাড়িটা, দূর থেকে। কড়া নজর রাখবো।'

'সত্যিই চলে যেতে বলছো!'

'হ্যাঁ, বলছি। আমরা সিরিয়াস।'

'একটা শয়তানের ভয়ে আমার বাপের বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবো?'

'এসব রহস্যের সমাধান চাইলে এছাড়া আর কোনো পথ নেই।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো এলিজা। তারপর হাসলো। 'চীফ ফ্লেচার অবশ্য বলেছে তোমার কথা। খুঁচিয়ে রহস্য বের করার ওস্তাদ নাকি তুমি, সমাধানও করে ফেলো। অনেক বুদ্ধি। ঠিক আছে, শুনলাম তোমার কথা।' উঠে দাঁড়ালো সে। 'ডরিকে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি। দেখো, কি করতে পারো। কাজ হবে তো?'

'আশা তো করছি। তবে না-ও হতে পারে। না হলে তখন অন্য কথা ভাববো।'

'ডরি, তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে। অন্ধকার হতে বেশি দেরি নেই, বড়জোর আধঘন্টা।' কিশোরের দিকে তাকালো এলিজা। 'তবে এখান থেকে বেরিয়ে সোজা পুলিশের কাছে যাবো আমি। তোমার পরিকল্পনার কথা বলবো। যাতে বিপদে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য পাও।'

চুপ করে কিছু ভাবলো কিশোর। মাথা কাত করলো। 'ঠিক আছে। ভালোই হয় তাহলে।'

'কিন্তু পুলিশ এলে তো সব গোলমাল হয়ে যাবে!' হাত নাড়লো মুসা। 'ওদেরকে দেখলে কি আর ঢুকবে লোকটা?'

'মিসেস মরগান, চীফকে অনুরোধ করবেন, যাতে সঙ্গে সঙ্গে তিনি না চলে আসেন। আপনাদের সাথে আমরাও বেরিয়ে যাবো, অর্ধেক পথ গিয়ে আবার ফিরে আসবো। পাহাড়ের ঢালে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে বসে চোখ রাখবো বাড়ির ওপর। রাস্তা থেকেও কেউ আমাদের দেখবে না, হিলটপ হাউস থেকেও না। চীফকে বলবেন, বাড়ির সব চেয়ে কাছে যে বিশাল ঝোপটা আছে, তার মধ্যে থাকবো আমরা।'

'চলো, জলদি করো,' তাড়া দিলো রবিন। 'অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে তো।'

দ্রুত স্যুটকেস গুছিয়ে আনলো ডরি।

বেরিয়ে গেল এলিজা, পেছনে তার ছেলে। ওদের পেছনে তিন গোয়েন্দা। অফিসের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো এলিজা। 'ডরি, বাক্সটা নিয়েছিস?'

'কিসের বাক্স?' জানতে চাইলো মুসা।

'বাবার জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে পেয়ে গেছি,' এলিজা জানালো। 'তেমন জরুরী বা দামী কিছু নেই ওতে। আমার মায়ের বিয়ের দিনে তোলা একটা ছবি, মা আর আমার দেয়া কিছু চিঠি, ব্যস। ওগুলো আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত জিনিস। আমি চাই না আর কেউ দেখুক।'

'বুঝতে পেরেছি,' কিশোর বললো।

ডরি গিয়ে মলাটের একটা শক্ত বড় বাক্স নিয়ে এলো। 'নানার স্বভাব ভারি অদ্ভুত। কোনো জিনিসই ফেলতে চায় না। একেবারে সাধারণ জিনিসও না।'

'থাকে ওরকম অনেকে,' রবিন বললো।

স্যুটকেস রাখার জন্যে গাড়ির বুট খুললো এলিজা।

চেঁচিয়ে কিশোর বললো, 'তাহলে চলেই যাচ্ছেন, মিসেস মরগান? আর দু'একটা দিন থাকলে হতো না?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি,' চেঁচিয়েই জবাব দিলো এলিজা। 'এই ভূতের বাড়িতে কে থাকে?'

হাসি চাপলো মুসা।

'আপনার আব্বাকে আর দেখতে পারলেন না তাহলে,' কিশোর বললো।

'না পারলে নেই,' তেজ দেখিয়ে বললো এলিজা। 'যে বাপ নিজের মেয়ের ভয়ে পালায়, তাকে না দেখলেও চলবে আমার। অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাদেরকে, কিছু মনে রেখো না। চলি। গুড বাই।'

বাক্সটা মায়ের হাতে তুলে দিলো ডরি। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতে

গেল এলিজা। হঠাৎ ছাউনির পেছন থেকে বলে উঠলো একটা কণ্ঠ, 'দাঁড়ান!'

ঝট করে পাঁচটা মাথা ঘুরে গেল সেদিকে। পড়ন্ত সূর্যের সোনালি আলোয় স্পষ্টই দেখা গেল লোকটাকে। হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আনাড়ি মাছশিকারী।

'মরতে না চাইলে সবাই চুপ,' হুমকি দিয়ে বললো নিমেরো। 'একদম নড়া চলবে না।' এলিজার দিকে নিশানা করলো সে। 'ডরি, বাক্সটা খুলে ভেতরের জিনিস মাটিতে ঢালো।'

'কিছু নেই এতে। শুধু নানার কয়েকটা চিঠি।'

'যা বলছি করো! জলদি!'

'তর্ক করো না, ডরি,' কিশোর বললো। 'যা বলছে করো।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললো ডরি। তারপর বাক্সের ডালা খুলে ভেতরের জিনিসগুলো ঢেলে দিলো মাটিতে। ঝরে পড়লো একগাদা খাম।

'আরি, শুধুই চিঠি দেখছি!' নিমেরো অবাক।

'একগাদা হীরের অলংকার আছে ভেবেছিলেন বুঝি?' ব্যঙ্গ করলো ডরি।

রেগে গেল নিমেরো। 'চুপ! বেশি কথা বলবে না···,' এক পা এগিয়ে এসে থেমে গেল সে। 'স্যুটকেসগুলো বের করে ঘরে নিয়ে যাও। নিশ্চয় ওর মধ্যে কিছু আছে।'

ছেলেরা গিয়ে স্যুটকেস বের করতে লাগলো। এলিজা চিঠিগুলো কুড়িয়ে নিতে লাগলো মাটি থেকে। তারপর আবার কুপারের ঘরের দিকে এগোলো সবাই, পেছনে পিস্তল হাতে রয়েছে নিমেরো।

ঘরে ঢুকে স্যুটকেস খুলতে ছেলেদেরকে বাধ্য করলো নিমেরো। রাগে জ্বলতে লাগলো এলিজা।

কিছুই না পেয়ে অবশেষে নিমেরো বললো, 'ও, সত্যিই নেই। মলাটের বাক্সটা দেখে আমি ভেবেছিলাম···'

'কি ভেবেছিলেন?' ঝাঁঝালো কণ্ঠে বললো এলিজা। 'কি আশা করেছিলেন?'

'কেন, আপনি জানেন না? হুঁম্, বুঝতে পারছি, জানেন না। থাক, আর জেনেও কাজ নেই। দয়া করে এখন সবাইকে সেলারে যেতে হবে।'

'আমি যাবো না!' চিৎকার করে বললো এলিজা।

'হ্যাঁ, মিসেস মরগান, যাবেন। সেলারটা খোঁজা হয়ে গেছে আমার। ওখানেও কিছু নেই। শক্ত ইঁটের দেয়াল, সিমেন্টের মেঝে, বহু বছর ধরে একইভাবে পড়ে আছে। জানালা-টানালা কিছু নেই। আপনাদের এখানে আটকে রেখে নিশ্চিন্তে বাকি কাজটা সারতে পারবো আমি।'

'আপনিই তাহলে সেদিন অফিসে ঢুকেছিলেন,' কিশোর বললো। 'ধাক্কা দিয়ে ফেলেছিলেন আমাকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে স্বীকার করলো নিমেরো। 'সেদিন খুঁজতে খুঁজতে একটা জিনিসই শুধু পেয়েছি।' পকেট থেকে বিরাট এক চাবির গোছা বের করলো সে।

'মিস্টার কুপারের চাবি।'

'দ্বিতীয় গোছা, আমার ধারণা,' হাসলো নিমেরো। 'ফেলে গেছে, যেন আমারই জন্যে। যাক, কথা অনেক হয়েছে, এবার হাঁটো।'

সেলারে ঢুকলো পাঁচজনে। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে নিমেরো বললো, 'থাকতে খুব একটা খারাপ লাগবে না ওখানে। বেশিক্ষণ থাকতেও হবে না। তোমাদের আত্মীয়-স্বজনরা কেউ না কেউ মিস করবেই তোমাদের। খুঁজতে চলে আসবে তখন।'

সেলারের দরজা বন্ধ করে দিলো নিমেরো। তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ হলো।

'নানাটার এই তালার বাতিক না থাকলেই ভালো হতো!' বিরক্ত কণ্ঠে বললো ডরি। 'সব কিছুতেই কেবল তালা আর তালা! বেরোই কি করে এখন?'

'জানি না,' সিঁড়িতে বসে পড়লো কিশোর। চারপাশে চোখ বোলালো একবার। 'বাজে জায়গা। তবে বেঁধে যে রেখে যায়নি এটাই বেশি।' মাথা চুলকালো একবার। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো। তারপর বললো, 'সর্বনাশের মূল হলোগে ওই চিঠির বাক্স। নিমেরো ভেবেছে, নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছো তোমরা, সে-জন্যেই বাধাটা দিয়েছে। নইলে আটকাতো না। আমরাও কাজ করতে পারতাম প্ল্যান মতো।'

'ফাঁদ পাতা হলো ঠিকই,' নিমের তেতো ঝরলো মুসার কণ্ঠে। 'কিন্তু তাতে এখন আটকা পড়লাম আমরাই!'

ষোলো

ওপরে খুটখাট দুপদাপ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারমানে সারা বাড়িতে খুঁজে বেড়াচ্ছে নিমেরো।

'পুলিশ গোপন লাইব্রেরিটা খুঁজে পেয়েছে?' ডরিকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'না।'

'কিসের গোপন লাইব্রেরি?' এলিজা জিজ্ঞেস করলো।

আর গোপন রেখে লাভ নেই। মাকে সব খুলে বললো ডরি।

'কিন্তু ওই পুরনো খবরের কাগজ লুকাতে যাবে কেন?' অবাক হয়ে বললো এলিজা।

'যারা খুঁজতে আসবে, নিশ্চয় তাদেরকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে,' কিশোর

বললো।

কিছুক্ষণ চুপ করে বসে ওপরের শব্দ শুনলো এলিজা। তারপর বললো, 'জ্বলন্ত পায়ের ছাপ তৈরিটা নিশ্চয় নিমেরোর কাজ।'

'কোনো সন্দেহ নেই,' কিশোর বললো। 'তার কাছে চাবি রয়েছে। পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকতো সে। সামনের দরজায় ছিটকানি লাগানো থাকতো তো, সে-জন্যে।'

হঠাৎ নীরবতা নেমে এলো ওপরতলায়। কিছুক্ষণ কোনো শব্দ হলো না। তারপর শোনা গেল পদশব্দ।

'পেছনের বারান্দা দিয়ে কেউ উঠেছে,' কিশোর বললো। 'অন্য কেউ।'

'চলো, চেঁচাই,' এলিজা বললো।

'না না, ওকাজও করবেন না, মিসেস মরগান!' অনুরোধ করলো রবিন। 'নিমেরো ছাড়াও আরও দুটো শয়তান রয়েছে। হিলটপ হাউসের ভাড়াটেরা।'

চুপ হয়ে গেল এলিজা।

পেছন থেকে পায়ের শব্দ ঘুরে চলে এলো সামনের দিকে। ফিসফিসিয়ে কিশোর বললো, 'পেছনের দরজা বন্ধ, ঢুকতে পারেনি। সামনে দিয়ে ঢুকবে।' সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়ে দরজায় কান পাতলো সে।

দু'জন লোকের কণ্ঠস্বর কানে এলো তার। হঠাৎ শোনা গেল একটা চিৎকার, তারপর গুলির শব্দ। ধস্তাধস্তি হলো কিছুক্ষণ, চেয়ার টানার শব্দ হলো, গোঙালো কেউ। অবশেষে কানে এলো জেনারেল ডিকটারের কণ্ঠ, 'একদম চুপ! নড়লে খুলি ফুটো করে দেবো!'

তালায় চাবি ঢোকানোর শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি থেকে নেমে চলে এলো কিশোর।

খুলে গেল সেলারের দরজা। ওপর থেকে ডেকে বললো ডিকটার, 'এই, বেরিয়ে এসো তোমরা।'

ওপরে উঠে নিমেরোর অবস্থা দেখে চমকে গেল এলিজা। অস্ফুট একটা শব্দ করে মাঝপথেই থেমে গেল। তাকিয়ে রয়েছে লোকটার হাতের দিকে। কব্জির কাছটায় রুমাল বাঁধা, রক্তে ভিজে লাল।

'ভয়ের কিছু নেই, ম্যাডাম,' জেনারেল বললো। 'জখম বেশি না।' একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলো এলিজাকে। 'বাধ্য হয়ে গুলি করতে হয়েছে। নইলে মেরেই ফেলতো আমাকে।'

ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়লো এলিজা। 'পুলিশ ডাকা দরকার...'

হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলো জেনারেল। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মিচেল। হাতে একটা কুৎসিত চেহারার রিভলবার।

'ওর কথা বাদ দিন, ম্যাডাম.' নিমেরোকে তুচ্ছ করে বললো জেনারেল।

'ব্যাটা এখানে এসে শয়তানী করছে জানলে আরও আগেই ঘাড় ধরে বের করে দিতাম। আপনাদের আর বিরক্ত করতে পারতো না।'

'বন্ধু নাকি আপনারা?' জিজ্ঞেস না করে পারলো না কিশোর। 'নাকি শত্রু?'

হেসে উঠলো জেনারেল। 'ওর মতো একটা ছিঁচকে চোর আমার বন্ধু হতে পারে না।' তৃতীয় আরেকটা চেয়ার টেনে এনে বসে পড়লো সে। 'ম্যাডাম, হয়তো অবাক হচ্ছেন, আমি এসব জানলাম কি করে? খোঁজখবর রাখতে হয় আমাকে, লাপাথিয়ায় একটা দায়িত্বশীল পদে নিয়োজিত আমি। ওখানকার পুলিশ বাহিনীর চীফ। এই লোকটার নামে একটা ডোশিয়ে আছে। অনেকগুলো নাম আছে তার, সবই অবশ্য তার বানানো। রত্ন চুরি করে সে। কাজটা নিশ্চয় ভালো না, কি বলেন?'

'জঘন্য!' এলিজা বললো। 'কিন্তু...কিন্তু এ-বাড়িতে তো রত্নটত্ন কিছু নেই। ও কেন...আপনারাই বা কেন এসেছেন?'

'আমাদের বাড়ির বারান্দা থেকে দেখলাম, এই শয়তানটা খারাপ আচরণ করছে আপনাদের সঙ্গে। কাজেই না এসে আর থাকতে পারলাম না।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' উঠে দাঁড়ালো এলিজা। 'যাই, পুলিশকে ফোন করিগে...'

'বসুন।'

জেনারেলের নির্দেশ অমান্য করতে পারলো না এলিজা। বসে পড়লো আবার।

'এতোক্ষণ কথা বললাম, অথচ পরিচয়ই দেয়া হয়নি আমার,' জেনারেল বললো। 'আমার নাম ডিকটার, জেনারেল চেক ডিকটার।'

'আমি মিসেস্ এলিজা মরগান। ও আমার ছেলে, ডরি।'

'দিমিত্রি কারিনভের বন্ধু?'

মাথা নাড়লো এলিজা। 'নামও শুনিনি কখনও।'

'ওর আরেক নাম হেনরি কুপার। এইবার চিনেছেন তো?'

'নিশ্চয়ই,' তাড়াতাড়ি বললো কিশোর। 'মিস্টার কুপারের বন্ধু ওনারা। মিডওয়েস্ট থেকে এসেছেন।'

'তুমি কথা বলছো কেন? যাকে জিজ্ঞেস করছি তাকেই বলতে দাও।' আবার এলিজার দিকে তাকালো জেনারেল। 'মিস্টার কুপার আপনার বন্ধু?'

আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলো এলিজা। 'হ্যাঁ,' জবাবটা দিতে গিয়ে মুখে রক্ত জমলো তার।

হাসলো জেনারেল। 'ম্যাডাম বোধহয় সত্যি কথা বলছেন না। ভুলে যাচ্ছেন, আমি পুলিশের বড় কর্তা, ঘাগু সব অপরাধীদের পেট থেকে কথা টেনে বের করি। ওই বয়েসের একজন লোক বন্ধু হতে পারে না আপনার। অন্য সম্পর্ক আছে।'

'যা বলার বলে দিয়েছি আমি!' রেগে উঠলো এলিজা।

হাসি মুছলো না জেনারেলের। নিমেরোর রক্তাক্ত রুমালটার দিকে তাকালো। 'আহ্হা, ব্লীডিং বোধহয় বেশি হচ্ছে। থাকো, আরেকটু ধৈর্য ধরো, এতো সহজে মরবে না। ডাক্তারের ব্যবস্থা করবো, আগে ম্যাডামের সঙ্গে কথা শেষ করে নিই,' এমন ভঙ্গিতে বললো সে, যেন বাচ্চা ছেলেকে বোঝাচ্ছে। 'হ্যাঁ, ম্যাডাম, বলুন।'

এলিজাকে মুখ খুলতে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, 'না না, বলবেন না!'

'তার মানে সত্যিই আন্দাজ করেছি,' হাসি বাড়লো জেনারেলের। 'এবার আর না বলে পারবেন না। আপনি কি চান নিমেরো রক্তক্ষরণে…'

'হ্যাঁ, আমার আব্বা,' আচমকা ফুঁসে উঠলো এলিজা। 'কি হয়েছে তাতে?'

হাসছে জেনারেল।

আরও রেগে গেল এলিজা, 'এতে এতো হাসির কি দেখলেন!'

'হাসবো না, বলেন কি?' দরজায় দাঁড়ানো লোকটার দিকে তাকালো জেনারেল। 'মিচেল, ভালো পুরস্কার পেয়েছি। দিমিত্রি কারিনভের নাতি আর মেয়ে এসে হাজির হয়েছে একেবারে আমাদের হাতের মধ্যে।' এলিজার দিকে ঝুঁকলো সে। 'এবার যা যা জিজ্ঞেস করবো, সত্যি করে বলবেন। আপনি দেরি করলে ওই বেচারা রক্তক্ষরণে মারা যাবে,' নিমেরোকে দেখালো ডিকটার। 'সেটা কি চান? আপনার দোষে একটা লোক মরে যাক?'

'বার বার এক ভয় দেখাবেন না! কি জানতে চান?'

'অনেক দামী একটা জিনিস আছে আমাদের, লাপাথিয়ানদের সম্পত্তি। কিসের কথা বলছি বুঝতে পারছেন আশা করি?'

মাথা নাড়লো এলিজা।

'উনি জানেন না,' কিশোর বললো। 'কিছুই জানেন না। লাপাথিয়ার ব্যাপারে কিচ্ছু না।'

'তুমি চুপ করবে?' ধমকে উঠলো জেনারেল। তারপর কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে বললো, 'বলুন, ম্যাডাম।'

'কিশোর ঠিকই বলেছে। সত্যিই আমি কিছু জানি না। আমার আব্বার নাম যে দিমিত্রি কারিনভ, তা-ও কোনোদিন শুনিনি।'

'তারমানে গোপন কথাটা আপনাকে বলেনি?'

'গোপন? কিসের গোপন?'

'আশ্চর্য! আপনাকে বলার কথা, এটা তার দায়িত্ব। আর আপনার দায়িত্ব আমাকে বলে দেয়া।'

'কিন্তু আমি কিছু জানলে তো বলবো!'

'মিচেল!' চিৎকার করে বললো জেনারেল, লৌহকঠিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে তার। 'সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না! এসো!'

এগিয়ে এলো মিচেল। ডরির কাঁধ ধরে এক ধাক্কায় ঘুরিয়ে দিলো। 'সেলারে!'

'এই, তোমরাও যাও!' তিন গোয়েন্দাকে বললো জেনারেল। 'শুধু এই বোকা মেয়েমানুষটা থাক!'

মাথা নিচু করে ডাইভ দিয়ে পড়লো মুসা, মিচেলের পেট সই করে। তার প্রচণ্ড শক্ত খুলির আঘাতে হুঁক করে উঠলো লোকটা। সাহায্য করতে এগিয়ে এলো রবিন। পেছন থেকে লাথি মারলো মিচেলের হাঁটুর পেছনে। মুসার মাথার আঘাত সামলে নিয়ে হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো সে, কিন্তু রবিনের লাথি খেয়ে সেটা আর সম্ভব হলো না। পড়ে গেল। তার গায়ের ওপর পড়লো মুসা। জাপটে ধরলো। ওপর দিকে উঠে গেল মিচেলের রিভলবার ধরা হাতটা, ট্রিগারে চাপ লেগে গুলি বেরিয়ে কারো কোনো অনিষ্ট না করে সোজা গিয়ে লাগলো ছাতে।

পরক্ষণেই আরেকটা গুলির বিকট শব্দ হলো। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে আরেকজন মানুষ। হাতের দোনলা শটগানের এক নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। চেঁচিয়ে বললো, 'খবরদার, নড়বে না এক চুল!'

মানুষটাকে সবার আগে চোখে পড়েছে কিশোরের।

'নানা!' বলে উঠলো ডরি।

'গুড ইভনিং, ডরি,' হেসে বললো কুপার। 'লিজা, মা আমার, আর কোনো ভয় নেই। অনেক কষ্ট করেছিস তোরা, আর হবে না।'

উঠে দাঁড়াতে গেল জেনারেল। পলকে কুপারের হাতের বন্দুকের নল ঘুরে গেল তার দিকে। 'উঁহুঁ! নড়বে না, চেক। একটা নল খালি হয়েছে, আরেকটায় এখনও আছে। তোমার মুখটা ছাতু করে দেয়ার সুযোগ পেলে খুশিই হবো আমি।'

আবার বসে পড়লো জেনারেল।

'কিশোর,' কুপার বললো, 'অস্ত্রগুলো তুলে নাও।' নিমেরোর পিস্তলটা পড়ে রয়েছে মেঝেতে, মিচেলও তার রিভলবার ফেলে দিয়েছে হাত থেকে, সেগুলো দেখালো সে। 'আমি শিওর, জেনারেলের কাছেও একটা আছে, খুব পছন্দ করে এসব জিনিস, বের করে নাও ওটাও।'

'নিচ্ছি, মিস্টার কুপার,' প্রথমে রিভলবারটার দিকে এগোলো কিশোর। 'সরি, মিস্টার কারিনভ।'

সতেরো

ভোঁতা নাক, বিচ্ছিরি দেখতে, ছোট একটা পিস্তল পাওয়া গেল জেনারেলের কাছে।

'যাও, ওগুলো ডেস্কের ড্রয়ারে ভরে তালা দিয়ে রেখে এসো,' কুপার বললো।

রেখে এসে চাবিটা ফিরিয়ে দিলো কিশোর। আলখেল্লার ভেতরে সেটা লুকিয়ে ফেললো কুপার। একটা আলমারির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ঢিল দিলো শরীর।

এতোক্ষণ পর কাঁদতে শুরু করলো এলিজা মরগান।

'কাঁদছিস কেন, মা? আর কোনো ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে,' সান্ত্বনা দিলো কুপার। 'সর্বক্ষণ শয়তানগুলোর ওপর চোখ রেখেছিলাম আমি। তোর একটা চুল ছেঁড়ার সুযোগও আমি দিতাম না ব্যাটাদেরকে।'

উঠে বাবার কাছে এগিয়ে গেল এলিজা। বন্দুকটা কিশোরের হাতে দিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলো কুপার। 'আমার এই কাপড়চোপড়ে খারাপ লাগছে না তো তোর? মহিলারা আমাকে দেখতে পারে না এসব পরি বলে।'

'মহিলা হলেও আমি তোমার মেয়ে, আব্বা,' কাঁদতে কাঁদতেই বললো এলিজা।

মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো কুপার।

বিচিত্র ভাষায় কথা বলে উঠলো ডিকটার। কিশোর আর রবিনের কাছে ভাষাটা পরিচিত, তবে দুর্বোধ্য, হিলটপ হাউসে মিচেল আর জেনারেলকে বলতে শুনেছিলো।

'ইংরেজিতে বলো,' কুপার বললো। 'বহুদিন ওই ভাষায় কথা বলিনি। এখন বলতে গেলে জিবে জড়িয়ে যায়।'

'আশ্চর্য! মাতৃভাষা ভুলে বসে আছো!'

'এতো বছর বলতে না পারলে তুমিও ভুলতে।' আহত হাতটা চেপে ধরে চেয়ারে কুঁজো হয়ে রয়েছে বেচারা নিমেরো, তাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো কুপার, 'ওই লোকটা কে?'

'নামী কেউ নয়,' জেনারেল জবাব দিলো। 'সাধারণ চোর।'

'ওর নাম নিমেরো,' ডরি বললো নানাকে। 'কিশোরের ধারণা, ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চেয়েছিলো ও।'

'ভয় দেখিয়ে? কিভাবে?'

'জ্বলন্ত পায়ের ছাপ দেখিয়ে,' কিশোর জানালো।

'জ্বলন্ত পায়ের ছাপ? নিশ্চয় সবুজ আগুন। হাহ্ হাহ্! আমাদের পরিবারের ভূতের খবর তাহলে তুমি জেনে গেছ নিমেরো। কায়দাটা রপ্ত করেছো ভালোই। হাতে কি হয়েছে?'

'গুলি খেয়েছে। হাতে পিস্তল ছিলো, জেনারেল কব্জিতে গুলি করে সেটা ফেলেছে।'

'তাই। এই মিয়া, সত্যি সত্যি আমার ছানাপোনাগুলোকে ভয় দেখিয়েছিলে?'

'কেউ প্রমাণ করতে পারবে না সেটা,' গোঁ গোঁ করে বললো নিমেরো।

'আপনার বাড়তি চাবিগুলো ছিলো ওর কাছে,' কিশোর বললো কুপারকে।

'হুঁ। চীফ ফ্লেচারকে খবর দিতে হয়। এটা যে শয়তানী করছে, বুঝতে পারিনি। ডিকটার আর মিচেলের ওপরই নজর ছিলো আমার। ফলে নিজের বাড়ির ওপরই চোখ রাখতে পারিনি।'

কপাল কুঁচকে কুপারের দিকে তাকালো জেনারেল। 'সত্যি বলছো দিমিত্রি, আমাদের ওপর নজর রাখছিলে?'

'রাখছিলাম। আর তোমরা রাখছিলে আমার মেয়ের ওপর।'

'তো, এই তিনটে দিন কোথায় ছিলে জানতে পারি?'

'হিলটপ হাউসের গ্যারেজে। গ্যারেজের দরজায় তালা দেয়া, তবে একটা জানালা আছে উত্তর ধারে। শিকটিক নেই। নিশ্চয় দেখেছো।'

'ইস্, এতোটা বেখেয়াল হলাম কি করে! আসলে বয়েস হয়ে যাচ্ছে, মাথা আর কাজ করছে না ঠিকমতো।'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কিশোর, চীফকে খবর দাও। এসব বজ্জাত লোককে বের করে নিয়ে যাক আমার বাড়ি থেকে।'

'এক মিনিট, দিমিত্রি,' হাত তুললো জেনারেল। 'কিছু রত্নের ব্যাপারে জানার আছে আমার। অনেক বছর আগে আসল মালিকের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো ওগুলো।'

'আসল মালিক নয়, নকল মালিকের কাছ থেকে,' কড়া জবাব দিলো কুপার। 'আজিমভরা হলো আসল মালিক। আমার দায়িত্ব ওগুলো নিরাপদে রাখা।'

'আসল মালিক এখন লাপাথিয়ানরা। আজিমভরা শেষ হয়ে গেছে, ওদের কোনো অস্তিত্বই আর নেই।'

'মিথ্যে কথা!' জ্বলে উঠলো কুপার। 'ম্যাডানহফের দুর্গে মারা যায়নি মিখাইল। আমরা দু'জন একসাথেই পালিয়েছিলাম। তবে পথে আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম। কথা ছিলো, আমেরিকায় এসে দেখা হবে। পরস্পরকে খুঁজে বের করার একটা বিশেষ মেসেজও তৈরি করে নিয়েছিলাম আমরা। তারপর থেকেই অপেক্ষা করছি।'

'আহারে, বেচারা দিমিত্রি,' টিটকারির সুরে বললো জেনারেল, 'সারাটা জীবন অপেক্ষা করেও তার দেখা আর পেলে না। মিখাইল রেলস্টেশনেই পৌঁছতে পারেনি, তার আগেই ধরা পড়ে যায়।' পকেট থেকে একটা ছবি বের করে দিলো সে।

ছবিটার দিকে পুরো একটা মিনিট নীরবে চেয়ে রইলো কুপার। চেঁচিয়ে উঠলো তারপর জেনারেলের দিকে তাকিয়ে, 'খুনী! শয়তান!'

ছবিটা ফিরিয়ে নিলো জেনারেল। 'আমার ইচ্ছেতে কিছু করিনি। দেশের লোকের যা ইচ্ছে, তা-ই করতে হয়েছে...'

'তুমি একটা পিশাচ!'

'আর কি করার ছিলো, বলো? খুনোখুনির ব্যাপারটা আজিমভরাই শুরু করেছিলো, আর তাদের কায়দায়ই শেষও হয়েছে সেটা। পালিয়ে এসে তোমারই বা লাভটা কি হলো, দিমিত্রি? সারাটা জীবন তালা দেয়া ঘরে অনেকটা জেলখানার

মতোই কাটালে। চুলদাড়ি বড় করে, আলখেল্লা পরে, খামখেয়ালি মানুষ সেজে আত্মগোপন করে থাকার চেষ্টা করলে। পরিবার-পরিজন, দেশের মানুষের কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকলে। তোমার মেয়ে বড় হলো, বিয়ে করলো, বাচ্চা হলো, তার কিছুই তুমি দেখতে পারলে না। কি লাভটা হলো এভাবে বেঁচে থেকে?'

আনমনে শুধু মাথা নাড়লো কুপার। কি বোঝাতে চাইলো, বোঝা গেল না।

'আর কিসের জন্যে এতোসব করলে?' আবার বললো জেনারেল। 'না, একটা মুকুট। যেটা কেউ কোনোদিন আর পরতে পারবে না, কারো মাথায় উঠবে না আর ওই জিনিস।'

'তুমি এখন কি চাও?' কোনোমতে যেন প্রশ্নটা বেরোলো কুপারের মুখ থেকে।

'জিনিসটা ম্যাডানহফে ফিরিয়ে নিতে চাই। ওখানকার জাতীয় যাদুঘরে রেখে দেয়া হবে, ওটার আসল জায়গায়। লোকে ইচ্ছে করলেই এসে দেখে যেতে পারবে। বহু বছর আগে তাদেরকে ওরকম কথাই দিয়েছিলো জেনারেলরা।'

'ওই কথার কোনো অর্থ নেই!'

'জানি আমি। আমার নিজেরও বিশ্বাস হয়নি কথাটা, ছেঁদো কথা মনে হয়েছে। কিন্তু কি করবো? লুবাসকির কথা না মেনে পারলাম না। তখন অবস্থা এমন নাজুক ছিলো, সামান্যতম এদিক ওদিক হলেই লোকে বিশ্বাস হারাতো আমাদের ওপর। হয়তো মারাও পড়তে পারতাম।'

'তাই বলে এতোবড় ধোঁকাবাজি করতে পারলে দেশের লোকের সঙ্গে?'

'এখন ওসব আলোচনা করে আর কি হবে, দিমিত্রি? তুমি বুড়ো হয়েছো, আমিও বুড়ো হয়েছি। প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে যা ঘটে গেছে সেসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর লাভ নেই। লাপাথিয়ানরা এখন সুখী। আজিমভরা অত্যাচার করেছে, দেশের মানুষের জন্যে কিছু করেনি, ফলে এখন ওদেরকে ভুলে গেছে লোকে, তাদের জন্যে কোনো করুণা নেই কারো মনে। তুমি যদি এখন তাদের কথা না শোনো, তোমাকে শত্রু বলে ভাববে ওরা। মুকুটটা আটকে রাখলে চোর ভাববে। সেটা কি তুমি হতে চাও? নিশ্চয় চাও না। ওটা আমি নিতে এসেছি, দিমিত্রি। দিয়ে দাও। দেশের লোক তোমাকে আর খারাপ ভাবতে পারবে না। বন্ধুর মতো চাইতে এসেছি, দিয়ে দাও।'

'কোনো দিন তুমি আমার বন্ধু ছিলে না।'

'তাহলে শত্রুও হয়ো না,' অনুরোধের সুরে বললো জেনারেল। 'যা হবার তা হয়ে গেছে। পুরনো ব্যাপার নিয়ে জেদাজেদি করে আর লাভ আছে?'

চুপ করে ভাবতে লাগলো কুপার।

'তোমার নিজের জিনিস বলেও ওটাকে আটকাতে পারো না,' জেনারেল বললো আবার। 'আমেরিকার আইনেও তোমাকে রাখতে দেবে না ওটা. আমার

বিশ্বাস। কারণ ওটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় কারো, রাষ্ট্রীয় জিনিস। একমাত্র জায়গা ওটার, ম্যাডানহফ। তোমার কাছে ওটা রয়েছে জানলে লাপাথিয়ায় কি রকম শোরগোল হবে বুঝতে পারছো? যে করেই হোক, তোমার কাছ থেকে ওটা আদায় করে নেয়ার ব্যবস্থা হবেই। তুমি কি চাও, একটা সামান্য মুকুটের জন্যে আবার খেপে যাক দেশের মানুষ?'

'না, চাই না,' বললো কুপার। 'ওটার প্রতি কোনো লোভ নেই আমার। বন্ধুর জন্যেই লুকিয়ে রেখেছিলাম এতোদিন। দাঁড়াও, আনছি।'

'এখানেই আছে নাকি?'

'আছে। আনছি।'

'মিস্টার কুপার?' ডাকলো কিশোর।

'হ্যাঁ, বলো?'

'আমি বের করে আনি? কলসের মধ্যে রয়েছে ওটা, তাই না?'

'বুদ্ধিমান ছেলে! ঠিক আছে, আনো।'

চলে গেল কিশোর। মিনিটখানেক লাগলো আসতে, এতোক্ষণ ঘরের কেউ কোনো কথা বললো না। বড়সড় একটা প্যাকেট নিয়ে ফিরে এলো সে। নরম কাপড়ে মোড়া প্যাকেটটা রাখলো টেবিলের ওপর।

'খোলো, তুমিই খোলো,' কুপার বললো।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো জেনারেলও। 'দেখার কৌতূহল নিশ্চয় হচ্ছে। খোলো।'

অনেকগুলো কাপড়ের মোড়ক খোলার পর অবশেষে বেরোলো মুকুটটা। চমৎকার একটা জিনিস। খাঁটি সোনায় তৈরি। নানারকম সুন্দর সুন্দর পাথর বসানো। চূড়ার ওপর বসে আছে দুই মাথা লাল ঈগল, মুখ হাঁ করে রেখেছে চিৎকারের ভঙ্গিতে।

'দা ইমপেরিয়াল ক্রাউন অভ লাপাথিয়া!' বিড়বিড় করলো রবিন।

'কিন্তু...কিন্তু ম্যাডানহফের মিউজিয়মে না একটা আছে?' মুসা বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা।

উঠে গিয়ে মুকুটটার কাছে দাঁড়ালো জেনারেল। পাদ্রী যে দৃষ্টিতে ক্রুশের দিকে তাকান, সেই দৃষ্টিতে তাকালো মুকুটটার দিকে। 'ওটা এটার কপি। যে বানিয়েছে, খুব ভালো হাত তার, কারণ কারিনভদের সাহায্য ছাড়াই বানিয়েছে। তবে কারো কারো কাছে ধরা পড়ে গেছে ব্যাপারটা, ওস্তাদ কিছু মানুষ। এই ছিঁচকে নিমেরোটার যেমন...মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি ভালোই ছিলো, কিন্তু খারাপ কাজ করতে গিয়ে সেটা নষ্ট করেছে। এই ব্যাটা বুঝে ফেলেছিলো যে ওটা আসলটা না। নকল মুকুটটা সব সময় কাঁচের বাক্সে থাকে, আর দর্শকদের কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে। ওটাকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ কেউ পায় না। কিছুদিন আগে

এক ফটোগ্রাফার গিয়ে ওটার ছবি তুলতে চাইলো, বইতে ছাপার জন্যে। লোকটা ফটোগ্রাফার, রত্ন বিশেষজ্ঞ নয়, তাই তাকে কাছে গিয়ে ছবি তুলতে দিয়েছি আমরা।'

'কাছে থেকে না দেখে নিমেরো কি করে বুঝলো জিনিসটা নকল?' মুসার প্রশ্ন।

'বললাম না, ও ওস্তাদ লোক। চুরিদারিতে না গিয়ে রত্নের ব্যবসা করলে বড়লোক হয়ে যেতে পারতো।' মুকুটটা আবার কাপড়ে জড়াতে শুরু করলো জেনারেল। 'যাই হোক, দেশের লোকের কাছে ব্যাপারটা গোপনই থাকবে। আসলটা নিয়ে গিয়ে নকলটার জায়গায় বসিয়ে দিয়ে নকলটা সরিয়ে ফেলা হবে। কেউ কিছু জানতে পারবে না।'

'এতোটা শিওর হচ্ছেন কিভাবে?' নিমেরো বললো। 'কেউ বুঝেও ফেলতে পারে। আর আমি গিয়ে যে বলে দেবো না তার কি বিশ্বাস?'

'যতো খুশি বলোগে। কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা?'

মুকুটটা আবার প্যাকেট করে হাতে নিলো জেনারেল। ডান হাত বাড়িয়ে দিলো কুপারের দিকে।

হাত মেলালো না কুপার। ঘুরে দাঁড়ালো আরেক দিকে।

'ঠিক আছে, দিমিত্রি,' জেনারেল বললো, 'আর আমাদের দেখা হবে না। দোয়া করি, ভালো থাকো।'

মিচেলকে নিয়ে বেরিয়ে গেল জেনারেল।

'কিশোর,' কুপার বললো, 'এবার গিয়ে পুলিশকে ফোন করো।'

আঠারো

সাত দিন পর। বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে গেল তিন গোয়েন্দা, কেসের রিপোর্ট দিতে।

মন দিয়ে ফাইলটা পড়লেন পরিচালক। মুখ তুলে বললেন, 'তাহলে সারাক্ষণ কলসির মধ্যেই লুকানো ছিলো মুকুটটা। শয়তান নিমেরো বহুবার যাতায়াত করেছে ওটার পাশ দিয়ে, কিন্তু বুঝতে পারেনি ওর মধ্যেই রয়েছে জিনিসটা।'

'কলসটা খোলার অনেক চেষ্টা করেছে, আমাদের কাছে স্বীকার করেছে সে,' কিশোর জানালো। 'ওর শয়তানীগুলো বেশির ভাগই করেছে রাতের বেলা। কাজেই একমাথা ঈগলটা নজরে পড়েনি তার। কলসির মুখটা সহজেই খুলে যায়, তবে উল্টোদিকে ঘোরাতে হয়, সাধারণত প্যাঁচ যেদিকে থাকে সেদিকে নয়। কুপারের চালাকিটাই ছিলো এটা। একমাথা ঈগল আঁকা থাকবে কলসের গায়ে, ওটার মুখের প্যাঁচ থাকবে উল্টোদিকে, একথা মিখাইলকে জানিয়ে রেখেছিলো

কুপার। প্রয়োজন পড়লে তার অনুপস্থিতিতে যাতে বের করে নিতে পারে মিখাইল।'

'লাপাথিয়ার বিদ্রোহের আগে থেকেই কি চীনামাটির কাজ করতো কুপার?' মিস্টার ক্রিস্টোফার জিজ্ঞেস করলেন।

'না,' জবাব দিলো রবিন। 'কুমোর হয়েছে জীবিকার জন্যে'। চীনামাটির কলস বানানোর জন্যে কুমোর হওয়ার প্রয়োজন পড়তো না তার। জানেন আপনি, অর্ডার দিলেই ওরকম জিনিস হাজারটা বানিয়ে নেয়া যায়।'

'আর অন্যান্য জিনিসে যে দুই মাথা ঈগল এঁকেছে,' মুসা যোগ করলো, 'সেটা তার খেয়াল। পছন্দ করতো বলেই আঁকে। ভালো লাগে বলে।'

'আসল কথাটায় আসা যাক এবার,' পরিচালক বললেন। 'আগুন কিভাবে জ্বেলেছে নিমেরো, সেকথা রিপোর্টে লেখনি।'

'নিমেরোর গাড়ির বুটে ওগুলো পেয়েছেন চীফ ফ্লেচার। কি পেয়েছেন, আমাদের বলেননি তিনি। কেমিক্যালগুলো কি, তা-ও বলেননি। এ-ব্যাপারে তাঁকে চাপাচাপি করেও লাভ হয়নি। সাফ বলে দিয়েছেন, আমাদেরকে বলবেন না।'

'ঠিকই করেছেন,' কারণটা বুঝতে পারলেন পরিচালক। 'ক্ষতিকর জিনিস। মানুষকে ভয় দেখানো যায়। ওরকম একটা তথ্য না ছড়ানোই ভালো।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর, 'এ-জন্যেই বলেননি।'

'ভালো করেছেন। এবার ছোট্ট দু'চারটা প্রশ্ন। ওয়েস্ট-ওয়েজ ম্যাগাজিনে ছবি দেখেই তো নিমেরো এসেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। লাপাথিয়ার ন্যাশনাল মিউজিয়মের মুকুটটা যে নকল সেটা সে বুঝে ফেলেছিলো। তারপর থেকেই খোঁজ করছে, আসলটা কোথায় আছে। খুব চালাক লোক। আন্দাজ করে ফেলেছিলো, কার কাছে আছে ওটা। চলে এসেছিলো আমেরিকায়, দিমিত্রি কারিনভকে খুঁজতে। পত্রিকায় মেসেজ দেখেছে, মিখাইলকে খুঁজছে দিমিত্রি। দাগ দিয়ে রেখেছে সেগুলো। তারপর খুঁজতে খুঁজতে চলে এসেছে রকি বীচে।'

'হুঁ। ওভাবেই এসেছে জেনারেল ডিকটার আর মিচেল, বোঝা গেল। জেনারেলকে দিমিত্রির খোঁজটা মিচেলই দিয়েছিলো।' এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পরিচালক। তারপর বললেন, 'ডরিরা যখন রয়েছে কুপারের বাড়িতে, তখন রাতের বেলা পাইপ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ার শব্দ পাওয়া গেছে। অথচ সমস্ত কল বন্ধ ছিলো। কিভাবে হলো?'

মুচকি হাসলো কিশোর। রিপোর্টে জবাবটা লেখা নেই। মিস্টার ক্রিস্টোফার খেয়াল করেন কিনা দেখতে চেয়েছিলো, সে-জন্যেই লিখতে মানা করেছিলো রবিনকে। বললো, 'হিলটপ হাউসের গ্যারাজে উঠেছিলো কুপার। খাবার তো জোগাড় করা সহজ, কিন্তু পানি ছিলো না ওখানে। তাই রাতের বেলা নেমে

এসেছিলো পানি নেয়ার জন্যে। বাড়ির বাইরে বাগানে পানি দেয়ার একটা কল আছে, এমন জায়গায়, জানা না থাকলে দেখা যায় না। ওটা থেকেই পানি নিয়েছিলো কুপার। পরে অবশ্য কলটা আবিষ্কার করেছি আমি, একটা পাতাবাহারের ঝোপের আড়ালে। শব্দটা যখন হয়েছে তখন বেশ অবাক লাগলেও ব্যাপারটা ততো গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি আমার কাছে, তাই বিশেষ পাত্তা দিইনি।'

'হুঁম্‌ম্‌।' মাথা দোলালেন পরিচালক। আর কোনো প্রশ্নের জবাব বাকি আছে কিনা ভাবছেন বোধহয়। প্রশ্নটা পেয়ে গিয়েই মুচকি হাসলেন। 'আরেকটা ব্যাপার। কিশোর, তুমি যখন ঢুকলে কুপারের বাড়িতে, তখন সামনের দরজা খোলা ছিলো। কুপার নিশ্চয় খুলে ফেলে যায়নি, যেরকম তালা দিয়ে রাখার স্বভাব তার। তালা দিয়ে নিশ্চয় একটা গোছা আলখেল্লার পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিলো। দ্বিতীয় গোছাটা পাওয়া গেছে নিমেরোর কাছে। নিশ্চয় সেটা ছিলো বাড়ির ভেতরে। তাহলে সে প্রথম দিন ঢুকলো কি করে?'

'আপনি তো, স্যার ছবি বানান,' হাসলো কিশোর। 'এতো এতো অ্যাডভেঞ্চার, স্পাই থ্রিলার বানিয়েছেন। চাবি না থাকলে কি করে তালা খোলে চোরেরা, কিংবা নায়ক?'

হাসিটা মুছে গেল পরিচালকের ঠোঁট থেকে। মাথা নাড়লেন। 'বুঝেছি। নিমেরোর মতো একটা চোরের জন্যে চাবি ছাড়া একটা তালা খোলা কিছুই না।'

'না, কিছুই না,' মুসা বললো। 'পকেটনাইফ আর একটা লোহার শলাই যথেষ্ট।'

'এবার বলো, সেদিন তোমরা যখন হিলটপ হাউস থেকে নেমে আসছিলে,' রবিন আর কিশোরকে উদ্দেশ্য করে বললেন পরিচালক, 'গুলিটা কেন করেছিলো কুপার? সে-ই তো করেছিলো, নাকি? শটগান যখন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো কিশোর। 'ও বুঝতে পেরেছিলো হিলটপ হাউসের ভাড়াটেরা বিপজ্জনক লোক, আমাদের ক্ষতি করতে পারে। তাই যেন ওদিকে আর না যাই সে-জন্যে ফাঁকা গুলি করে আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে।'

'পেলো কোথায় শটগানটা?'

'ওরই জিনিস। ছাউনিতে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে রাখে। রাতের বেলা বের করে নিয়ে গিয়েছিলো।'

আর কোনো প্রশ্ন নেই। নীরবতা বিরাজ করতে লাগলো মস্ত অফিস ঘরটায়। দুই কনুই টেবিলে রেখে হাতের তালু একটার সাথে আরেকটা চেপে রেখেছেন পরিচালক।

অবশেষে মুসা কথা বললো, 'এই গল্পটা দিয়ে ভালো একটা ছবি হয়, তাই না, স্যার?'

'না, হয় না,' মাথা নাড়লেন পরিচালক। 'গল্প ভালো, সন্দেহ নেই, কিন্তু ছবি

করতে গেলে আরও অনেক কিছু দরকার হয়। এটাতে সেসব মালমশলা নেই। তবে ইচ্ছে করলে যোগ করে দেয়া যায় সেসব, বানিয়ে বানিয়ে। দেখি, ভেবে। হ্যাপি এনডিং একটা আছে অবশ্য। অবশেষে বহু বছর পর মেয়ের সঙ্গে মিলিত হলো কুপার, নাতির দেখা পেলো।'

'মিসেস মরগান খুব ভালো রাঁধুনি,' ঠোঁট বাঁকিয়ে, চোখ নাচিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করলো মুসা। 'ইতিমধ্যেই গায়ে মাংস লাগতে শুরু করেছে কুপারের। আলখেল্লা পরা ছেড়ে দিয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে গিয়ে কোট প্যান্ট শার্ট টাই জুতো এসব কিনে এনেছে। চুল দাড়ি ছেঁটে ভদ্র চেহারা বানিয়েছে। অন্য রকম লাগে এখন তাকে দেখতে। হাজার হোক মেলিনবাদের ডিউকের ছেলে। মেয়ে আর নাতিকে নিয়ে আসছে শরতে বেলিভিউতে যাবে, জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। বেড়িয়ে আসবে কিছুদিন।'

রবিন বললো, 'প্রায়ই এখন যাই আমরা কুপারের বাড়িতে। তার সাথে কথা হয়। ওর নতুন সাজ দেখে আমরা যাতে হাসাহাসি না করি, সে-জন্যে গেলেই কথায় কথায় বলে দেয়, মেয়ের জামাইয়ের কাছে থাকতে যাবে, লোকে যাতে না বলতে পারে "তোমার শ্বশুর..." '

'পাগল!' রবিনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো মুসা।

'পাগল না হোক,' কিশোর বললো, 'অসম্ভব খামখেয়ালি যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

ঃ শেষ ঃ

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৯১

চমকে জেগে উঠলো কিশোর পাশা। উঠে বসেছে বিছানায়, মেরুদণ্ডে এক ধরনের শিরশির অনুভূতি। কিসে ঘুম ভাঙালো? কোনো একটা চিৎকার।

ঘরের ভেতরে বিচিত্র আলোআঁধারির খেলাই বুঝিয়ে দেয় তাঁবুর বাইরে অগ্নিকুণ্ডটা ভালোমতোই জ্বলছে এখনও। ভয়ংকর বুনো জানোয়ারকে সরিয়ে রাখে আগুন। চারপাশে অসংখ্য জন্তুজানোয়ার ঘোরাঘুরি করছে এখন, তাদের ডাকাডাকিতেই সেটা স্পষ্ট, তবে চিৎকারটা অন্য রকম মনে হয়েছে তার। জানোয়ারের ডাক নয় যেন।

তবে ভুলও হতে পারে। তাছাড়া শুনেছে ঘুমের ঘোরে। আবার এসেছে ওরা আফ্রিকায়। আফ্রিকার বুনো প্রান্তরে এ-যাত্রায় এটা ওদের প্রথম রাত। সন্ধ্যায় সে, মুসা আর রবিন মিলে জ্বেলেছিলো অগ্নিকুণ্ডটা, সেটার আলোই এসে পড়েছে তাঁবুর ভেতরে।

মোট চারটে বিছানায় চারজন শুয়ে আছে। দুটোতে মুসা আর রবিন, আর চতুর্থটায় মুসার বাবা মিস্টার রাফাত আমান।

বুনো জানোয়ার ধরে বিক্রি করার একটা পার্টটাইম ব্যবসা করেন মিস্টার আমান আর কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা মিলে। সুযোগ আর সময় পেলেই তাই ছেলেদের নিয়ে জানোয়ার ধরতে জঙ্গলে চলে আসেন মিস্টার আমান, মাঝে সাঝে তিন গোয়েন্দাকেও পাঠান, একা। এসব কাজে ওরাও ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। আমাজানের ভীষণ অরণ্যে গিয়ে, প্রশান্ত মহাসাগরের ভয়াবহ সব অঞ্চলে গিয়ে নানারকম জন্তু-জানোয়ার ধরে এনেছে ওরা।

আবার শোনা গেল চিৎকারটা। তীক্ষ্ণ, লম্বিত, কানের পর্দা ফুঁড়ে বেরিয়ে যায় যেন। পরক্ষণেই শোনা গেল নারী-পুরুষের মিলিত চেঁচামেচি, কুকুরের ঘেউ ঘেউ। কোলাহলটা আসছে বোধহয় ক্যাম্পের পেছনে পাহাড়ের ওপর আফ্রিকানদের গ্রাম থেকে।

মচমচ করে উঠলো মিস্টার আমানের দড়ির চারপায়া। মুসা এখনও গভীর ঘুমে অচেতন। রবিনেরও সাড়া নেই।

'গোলমালটা কিসের?' কিশোর যে জেগে গেছে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। 'দেখতে হয়।' পায়ের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে বিছানা থেকে নেমে দ্রুত কাপড় পরে নিলেন। বেরোলেন তাঁবুর বাইরে। তাঁদের ভাড়া করা কুলি, পথ-প্রদর্শক আর

চাকরেরা সবাই জেগে গেছে। উত্তেজিত হয়ে কি সব বলাবলি করছে আগুনের চারপাশে শুয়ে-বসে।

ছড়ানো প্রান্তরের লম্বা ঘাসের মধ্যে খসখস শোনা গেল, বেশ জোরালো একটা নড়াচড়া হচ্ছে। আগুনের ধারে একজন বন্দুক-বাহী কুলির পাশে ফেলে রাখা তাঁর ·৩৭৫ ম্যাগনাম রাইফেলটা ঝট করে তুলে নিলেন আমান। নামিয়ে ফেললেন আবার, যখন দেখলেন নড়াচড়া কোনো হিংস্র জানোয়ারে করেনি, একজন মানুষ। ছুটে বেরিয়ে এলো ঘাসের ভেতর থেকে। গাঁয়ের সর্দার। তার পেছনে বেরোলো আরও তিনজন গ্রামবাসী।

'বাওয়ানা (মালিক), জলদি, বাঁচান!' চেঁচাতে শুরু করলো সর্দার। 'চিতাবাঘ! বাচ্চা ধরে নিয়ে গেছে!'

কিশোরও বেরিয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমান, 'যাবে ন্যাকি?'

মাথা কাত করলো কিশোর।

'এসো। খামবু, ডিগা, কাকামি,' ডাকলেন তিনি, 'বন্দুক নিয়ে এসো আমার সাথে।' সর্দারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছাপ ধরে পিছু নিতে পারবেন?'

'পারবো। নদীর দিকে গেছে।'

'কিশোর, দুটো টর্চ নিয়ে এসো।'

টর্চের জন্যে আবার গিয়ে তাঁবুতে ঢুকলো কিশোর। কানে এলো একটা ঘুমজড়িত কণ্ঠ, 'কি হয়েছে?'

'শিকারে যাচ্ছি।'

'কি বললে?' লাফ দিয়ে উঠে বসলো মুসা, ঘুম চলে গেছে। 'এই মাঝরাতে?'

রবিনও জেগে গেছে ততোক্ষণে। 'আমিও যাবো।'

আর একটাও কথা না বলে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে কাপড় পরে নিলো সে আর মুসা।

ঘাসবনের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের দিকে চললো দলটা। গাঁয়ের কিনারে এসে দেখলো, পাতা আর মাটি দিয়ে তৈরি কয়েকটা কুঁড়ের কাছে জটলা করছে অনেক মানুষ। পুরুষেরা চেঁচাচ্ছে, মেয়েরা আর শিশুরা কলরব করছে, কান্না জুড়েছে কেউ কেউ। আর সব শব্দকে ছাপিয়ে বুক চাপড়ে বিলাপ করছে এক মহিলা।

চিতাবাঘের পায়ের ছাপ দেখালো সর্দার। টর্চের আলো ফেলে দেখে দেখে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নদীর দিকে এগোলেন আমান।

বিলাপ করছিলো যে মহিলা তাকে পিছে পিছে আসতে দেখে মুসা জিজ্ঞেস করলো সর্দারকে, 'ও আসছে কেন?'

'ওর ছেলেকেই নিয়ে গেছে।'

অর্ধেক পথ আসতেই ছেলেটাকে পড়ে থাকতে দেখা গেল। হৈ-হট্টগোলে ভয়

পেয়েই বোধহয় বাচ্চাটাকে ফেলে পালিয়েছে চিতাবাঘ। গায়ে একটা কাপড়ও নেই ছেলেটার। গাঢ় বাদামী চামড়ায় অনেকগুলো কাটাকুটি দেখা গেল, নখ আর দাঁতে লেগে নিশ্চয় হয়েছে জখমগুলো। রক্ত পড়ছে। বাচ্চাকে দেখে চিৎকার দিয়ে ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলো মা। নিচু হয়ে বাচ্চাটার নাড়ি দেখলেন আমান। 'বেঁচে আছে।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বাচ্চাকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে চললো মা।

আবার নদীর দিকে চললেন আমান।

'দেরি করা যাবে না,' বললেন তিনি। 'এতোক্ষণে নিশ্চয় মাইলখানেক দূরে চলে গেছে। আশপাশের ঝোপে ঘাপটি মেরে থাকলেও অবাক হবো না। এই, সাবধান থাকবে তোমরা। ঘাড়ের ওপর এসে লাফিয়ে পড়তে পারে। চিতাবাঘকে বিশ্বাস নেই।'

একজায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। ছাপগুলো আর আগের মতো স্পষ্ট নয়। রাফাত আমানের পূর্বপুরুষদের বাড়ি আফ্রিকায়। মস্ত বড় শিকারী তিনি। জন্তুজানোয়ারের আচার-আচরণ মুখস্থ তাঁর। পায়ের ছাপ আর অন্যান্য চিহ্ন ধরে বুনো জানোয়ারকে অনুসরণ করতে শিখেছেন সেই ছেলেবেলাতেই, মুসার চেয়ে অনেক ছোট থাকতে। আফ্রিকার জঙ্গলকে তিনি চেনেন। প্রতিটি উল্টে থাকা পাথর, ভাঙা ঘাসের ডগা দেখে বলে দিতে পারেন ওগুলো কোন্ ধরনের জানোয়ারের কাজ। তবে এসব কাজে তাঁকে হার মানায় তাঁরই সঙ্গী বন্দুক-বাহক আর পথ-প্রদর্শক খামবু। ডাক দিলেন, 'এই খামবু, দেখে যাও।'

জবাব নেই। টর্চ ঘুরিয়ে দেখলেন আমান। সর্দার আছে, গাঁয়ের অন্য তিনজন লোক আছে, ডিগা আর কাকামিও আছে, তিন গোয়েন্দা আছে, তাদের সঙ্গে রয়েছে বিশাল কুকুর সিমবা, কিন্তু খামবু নেই।

'ওকে তো আসতে বলেছিলাম।'

'হ্যাঁ, বলেছেন,' কিশোর বললো।

'মাঝে মাঝে অদ্ভুত আচরণ করে লোকটা। থাক। মনে হয় এই এদিক দিয়েই গেছে। এসো।' ঢাল বেয়ে আবার নেমে চললেন আমান।

রাতের বেলা শিকারের সময় এক ধরনের গোল চ্যাপ্টা টর্চ ব্যবহার করে শিকারীরা, ওগুলোর অনেক সুবিধে, খনি শ্রমিকেরাও এই জাতীয় জিনিস ব্যবহার করে। ফিতে আছে, কপালে লাগিয়ে মাথার সঙ্গে বেঁধে নেয়া যায়। তাতে দুই হাত মুক্ত থাকে। আমানের টর্চটাও কপালে বাঁধা। একহাতে রাইফেল, আরেক হাত খালি। জোরালো আলো গিয়ে পড়েছে পায়ের ছাপের ওপর। খানিক দূর এগিয়ে দ্বিধায় পড়ে গেলেন তিনি। কি যেন একটা গোলমাল রয়েছে ছাপগুলোয়, ধরতে পারছেন না। চিতাবাঘের পায়ের ছাপই—ডিমের মতো লম্বাটে-গোল চারটে আঙুল, আর একটা করে বড় তিনকোণা গোড়ালি। প্রতিটি ডিমের মাথার কাছে চোখা

ছোট গর্ত, নিশ্চয় নখের চাপে হয়েছে। এটাই অস্বাভাবিক লাগছে তাঁর কাছে। চিতাবাঘ বেড়াল গোষ্ঠির প্রাণী। নখ লুকানো থাকে থাবার ভেতরে; হাঁটার সময়ও ওভাবেই থাকে, বেরোয় শুধু আঘাত করার সময়। কিন্তু মাটিতে এই ছাপগুলোর নখ বেরিয়ে আছে, চিতাবাঘ নয়, চিতার ছাপের মতো। চিতা প্রায় চিতাবাঘের মতোই দেখতে হলেও বেড়াল নয়, কুকুর গোষ্ঠির প্রাণী, তাই নখ সব সময় বেরিয়ে থাকে।

ছাপগুলো দেখিয়ে তিন গোয়েন্দাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে আমান বললেন, 'কিন্তু চিতা হতেই পারে না। ঘরে ঢুকে কক্ষনো মানুষের বাচ্চাকে ধরে নিয়ে যায় না ওরা। এটা চিতাবাঘই। অবাক লাগছে, নখ বেরিয়ে রয়েছে দেখে। সারাক্ষণ নখ বেরিয়ে থাকে একমাত্র মরা চিতাবাঘের।'

'মরা? খাইছে!' আঁতকে উঠলো মুসা। চিতাবাঘের ভূত না তো! তাড়াতাড়ি চারপাশে চোখ বোলালো সে, ভয়ে ভয়ে।

রবিনের কাছে কথাটা বিস্ময়কর মনে হলো। তবে এই আজব দেশে বিস্ময়কর বলে কোনো কথা নেই—কথাটা কোন এক ইংরেজ অভিযাত্রী যেন বলেছিলেন, নামটা ঠিক মনে করতে পারছে না এখন সে। তিনি আরও বলেছেন, এখানে যখন-তখন যা-খুশি ঘটতে পারে।

কিশোরের কাছে অতোটা আজব মনে হলো না ব্যাপারটা, মনে হলো রহস্যজনক। সে ভাবলো, ঘটেছে যখন, নিশ্চয় এর কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছাপগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আরেকটা জিনিস চোখে পড়লো তার, 'আংকেল, দেখুন, ছাপগুলোয় রক্ত নেই।'

'ভালো ট্র্যাকার হতে পারবে তুমি,' প্রশংসা করলেন আমান। এটা তিনিও খেয়াল করেছেন। চিন্তিত ভঙ্গিতে ছাপগুলোর দিকে তাকিয়েবললেন, 'ঠিকই আন্দাজ করেছো তুমি। বাচ্চাটাকে আঁচড়ে দিয়েছে চিতাটা, তার নখ আর থাবায় রক্ত লেগে গেছে। শুরুতে ছাপগুলোতে রক্ত লেগেছিলো, হঠাৎ নেই হয়ে গেছে। এটা হতে পারে না, এতো দ্রুত রক্ত শুকিয়ে যেতে পারে না নখ আর থাবা থেকে।'

'আরও একটা ব্যাপার,' কিশোর বললো, 'আমাজানে জাগুয়ারের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে বহুবার এগিয়েছি আমরা, ওগুলোর বাসা খোঁজার জন্যে। লম্বা ঘাস যেখানে ছিলো সেখানে দেখেছি পেটের চাপে ডগা ভেঙেছে কোথাও, কোথাও কাত হয়ে গেছে। চিতাবাঘের বেলায়ও তো সেরকম হওয়ার কথা ছিলো?'

'হ্যাঁ, হয়,' আমান বললেন।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেরকম কিছু হয়নি। অথচ ঘাস দুই ফুট লম্বা, সগর্বে মাথা উঁচু করে রেখেছে ছাপগুলোর মাঝখানে, দুই পাশে, অথচ ওই ঘাসের মধ্যে

দিয়েই গেছে চিতাবাঘ।

মাথা নাড়তে নাড়তে আমান বললেন, 'এরকম চিতাবাঘ আর দেখিনি। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে রহস্যের সমাধান হবে না। এসো।'

এগিয়ে চলেছে দলটা। আমানের পাশে পাশে চলছে সর্দার। চিতাবাঘের কুকীর্তি বয়ান করছে। গত দশ দিনে এই নিয়ে তৃতীয়বার বাচ্চা তুলে নিয়ে গেছে জানোয়ারটা। প্রথম দুটোকে মেরে ফেলেছিলো। যতোই সময় যাচ্ছে দুঃসাহসী হয়ে উঠছে বাঘটা। আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে গাঁয়ের লোক।

'ওটাকে মারুন,' অনুরোধ জানালো সর্দার।

'আফ্রিকায় শিকার করতে আসিনি আমি,' আমান বললেন। 'জন্তুজানোয়ার ধরতে এসেছি। যা-ই হোক, মানুষখেকোকে ছেড়ে দেয়া যায় না। ভাববেন না, ব্যবস্থা একটা হবে।'

নদীর পাড়ে জঙ্গল। বড় গাছপালা আছে, ঝোপঝাড় আছে। একটা গাছের জটলার ভেতর ঢুকে গেছে পায়ের ছাপ। খোলা জায়গার চেয়ে এখানে অনেক বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, কোন ঝোপের ভেতরে ঘাপটি মেরে রয়েছে বাঘটা কিছুই বোঝার উপায় নেই। একটু অসাবধান হলেই ঘাড়ের ওপর এসে লাফিয়ে পড়তে পারে, কিংবা ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারে মাথার ওপরের কোনো ডাল থেকে। উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে সকলের স্নায়ু।

'ওটা কি? ওই যে বড় গাছটার কাছে?' হাত তুলে দেখালো মুসা।

সেদিকে ঘুরে গেল তার বাবার টর্চের আলো। কিছু একটা নড়ছে। হলুদের ওপর কালো কালো ফোঁটা। চিতাবাঘের চামড়া, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঘের মতো চারপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে রয়েছে মানুষের মতো খাড়া হয়ে। একটা মুহূর্ত ওভাবে থাকলো। তারপরই লাফ দিলো আড়ালে সরে যাওয়ার জন্যে। হারিয়ে যাওয়ার আগের ক্ষণে ফিরে তাকালো একবার। বাঘের মুখ নয়, মুখটাও মানুষের মতো, তবে আবছা আলোয় চেহারাটা বোঝা গেল না।

অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

যেখানে দেখা গিয়েছিলো সেখানে চলে এলো দলটা। আশেপাশে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো। কিন্তু আর দেখা গেল না ওটাকে। মানুষ বা জন্তু যা-ই হোক, একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেছে যেন।

দুই

কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না আর, না পায়ের ছাপ, না কিছুর। ঘন ঝোপঝাড় সমস্ত চিহ্ন ঢেকে দিয়েছে। এরপর কি করা বুঝতে পারছে না কেউ। গাঁয়ের লোকেরা আর এগোতে রাজি হলো না কিছুতেই। সাধারণ চিতাবাঘকেই ভয় করে

চলে মানুষ, কারণ খুব খারাপ জীব এরা। আর সেটা যদি মানুষের রূপ নিতে পারে, তাহলে তো কথাই নেই। সাক্ষাৎ ইবলিস হয়ে যায়। বদ প্রেতাত্মা। ইচ্ছে মতো আসতে যেতে পারে ওগুলো। মানুষ, জানোয়ার যে কোনো কিছুর রূপ নিতে পারে। তীর, বর্শা, এমনকি বন্দুকের গুলিকেও পরোয়া করে না। করবে কেন? লাগেই তো না ওদের গায়ে। ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছে লোকগুলো। গাঁয়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো।

'কিন্তু আপনাদের বাচ্চাদের কি হবে?' আমান জিজ্ঞেস করলেন। 'ওরা একে একে মারা পড়ুক, এটাই চান?'

'কিছু করার নেই আমাদের,' অসহায় ভঙ্গিতে বললো সর্দার। 'আপনিও কিছু করতে পারবেন না। চিতাবাঘ হলে মারতে পারতেন, কিন্তু চিতা-মানবকে কি করবেন? ওদের মারা মানুষের সাধ্যের বাইরে। চলুন, ভালো চাইলে ফিরে চলুন আমাদের সঙ্গে। আলো আছে আপনার কাছে, আমাদেরও যেতে সুবিধে হবে। এই অন্ধকারে...শুনুন, শুনুন! টিটকারি মারছে আমাদেরকে! হাসছে!'

বনের গভীর থেকে শোনা গেল একটা অদ্ভুত শব্দ। এই পরিবেশে ওই শব্দ শুনলে অতি বড় সাহসীরও আত্মা কেঁপে ওঠে। শক্ত আঁশওয়ালা কাঠে ভোঁতা করাত চালানো হচ্ছে যেন।

'ব্যাটা যে-ই হোক,' আমান মন্তব্য করলেন, 'চিতাবাঘের ডাক ভালোই রপ্ত করেছে। ওকে ধরবোই আমি। ইচ্ছে হলে আসতে পারেন, না হলে থাকুন।'

শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন তিনি। অবশ্যই সঙ্গে চললো তিন গোয়েন্দা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিছে পিছে চললো গাঁয়ের লোকেরা। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে আরও বেশি বিপদে পড়ার চেয়ে এটাই ভালো মনে করলো ওরা। ঘন ঘাস আর ঝোপ মাড়িয়ে, পড়ে থাকা মরা গাছ ডিঙিয়ে, লতা ঠেলে, গাছপালার পাশ দিয়ে এগিয়ে চললো ওরা। এরকম জঙ্গলে দ্রুত চলা যায় না, গতি খুব মন্থর। দুটো টর্চ জ্বলছে এখন, একটা আমানের কপালে, আরেকটা কিশোরের কপালে। সব ক'টা চোখ খুঁজছে শুধু একটাই জিনিস—হলুদের ওপর কালো ফোঁটা।

থমকে দাঁড়ালেন আমান। 'মনে হয় দেখলাম। বাঁয়ে, একটা উইয়ের ঢিবির ওপরে গাছের ডালে।'

চোখ তীক্ষ্ণ করলো তিন গোয়েন্দা। মুসা দেখলো প্রথমে। তারপর কিশোর। রবিন দেখতে পায়নি। হলুদের ওপর কালো ফোঁটাই। বোধহয় চিতা-মানবের চামড়াই হবে, যেটা গায়ে জড়ানো ছিলো।

চাপা গরগর করে উঠে ছুটে যেতে চাইলো সিমবা।

'চুপ, সিমবা, দাঁড়া!' আদেশ দিলেন আমান।

চুপ করলো না সিমবা, গরগর করতেই থাকলো, তবে আগে বাড়ার চেষ্টা করলো না আর।

'আশ্চর্য!' আমান বললেন। 'তখন যখন দেখলো, কিছুই করলো না, একেবারে চুপ। আর এখন এমন করছে?'

'সোজাসুজি গেলে ব্যাটা আবার পালাবে,' কিশোর বললো, 'আগের বারের মতো।' টর্চটা খুলে মুসার হাতে দিয়ে বললো, 'এটা ধরে রাখো ওর ওপর। আমি ঘুরে ওর পেছনে চলে যাই। দেখি, ডাল থেকে নামানো যায় কিনা। ছুরি আছে আমার কাছে, ভয় নেই,' কোমরে ঝোলানো বড় হান্টিং নাইফের খাপে চাপড় দিলো সে।

'জঙ্গলে এলেই অন্যরকম হয়ে যাও তুমি, কিশোর,' আমান বললেন, 'দেখেছি। সাহস আছে।'

'ওর সাহস সব সময়ই বেশি,' রবিন বললো।

'তা তো নিশ্চয়ই। ভূতকে যে ভয় পায় না…'

'অযথা ভূত-ভূত করো তুমি, মুসা,' বাধা দিয়ে বললেন তার বাবা। 'কতোবার বলেছি, ওসব নেই, তা-ও…লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো শহরে থেকেও তোমার…কি আর বলবো। আসলে, আমাদের বাপ-দাদাদের কুসংস্কার ছাড়েনি তোমাকে…'

'আমি যাচ্ছি,' কিশোর বললো। 'দেরি করলে চলে যেতে পারে। আয়, সিমবা।'

'যাও। খুব সাবধান। তেমন প্রয়োজন না হলে ছুরি চালাবে না। মরে গেলে বিপদে পড়বে। ধরার চেষ্টা করবে। ধরতে পারলে পুলিশের হাতে তুলে দিলেই হবে।'

সর্দার বললো, 'ওকে যেতে দেবেন না, বাওয়ানা। ওর সাহস আছে, বুদ্ধিও আছে, কিন্তু যাদুর জোরের সঙ্গে পারবে না। চিতাবাঘ হয়ে গিয়ে ওকে খুন করে ফেলবে চিতা-মানব।'

সর্দারের কথায় কান দিলেন না আমান। কিশোর আরও দিলো না, কথা শেষ হওয়ার আগেই চলতে আরম্ভ করেছে সে। ঢুকে পড়লো ঘন গাছপালার মধ্যে। অন্ধকারে মিশে নিঃশব্দে এগোলো।

মনে মনে কিশোরের জন্যে দুশ্চিন্তা যে একেবারেই হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু আমল দিলেন না আমান। পুরুষ মানুষের সাহস থাকা ভালো। ঝুঁকি যদি না-ই নিতে পারলো তাহলে পুরুষ কেন? ওর চেয়ে কম বয়েসে আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে রাতের বেলা খালি হাতে বেরিয়ে পড়তেন তিনি, নিশাচর জানোয়ার আর প্রকৃতি দেখার জন্যে।

ওটা মানুষ না হয়ে সত্যিকার চিতাবাঘ হলে অবশ্য বন্দুক ছাড়া কিশোরকে যেতে দিতেন না তিনি। সাধারণ একটা হান্টিং নাইফ দিয়ে চিতাবাঘের বিরুদ্ধে কিছুই করা যাবে না। তবে চিতা-মানবের ব্যাপারে তার কোনো ভয় নেই। আফ্রিকান হলেও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন না তিনি, কোনো রকম কুসংস্কার নেই।

চিতা-মানব মানে মানুষ, চিতাবাঘের ছাল পরে শয়তানী করছে, সাথে অস্ত্র থাকলে বড় জোর একটা ছুরি থাকতে পারে। ওরকম একটা মানুষের জন্যে সিমবাই যথেষ্ট। বুনো কুকুরের রক্ত রয়েছে ওর শরীরে, হিংস্রতা ভোলেনি, আক্রান্ত হলে টুঁটি টেনে ছিঁড়ে ফেলবে শত্রুর।

এগিয়ে চলেছে কিশোর।

আরেকবার চাপা গররর করে উঠলো সিমবা।

'চুপ!' ফিসফিসিয়ে সতর্ক করলো তাকে কিশোর। 'তাড়াহুড়ো করবি না। তাহলে পালাবে।'

ঘুর পথে যেতে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে খোলা জায়গায় আবার নদীর পাড়ে বেরিয়ে এলো ওরা। ঢেউ নেই পানিতে, নিথর হয়ে আছে, যেন কালো আয়নার ওপর প্রতিফলিত হচ্ছে তারাগুলো। অন্য পাড়ে দেখা যাচ্ছে চলমান কতগুলো ছায়া, সারি দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিশোর বুঝতে পারছে, ওগুলো জলহস্তী। হঠাৎ সচল হয়ে উঠলো তার সামনে পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়ি, বিচিত্র ভঙ্গিতে শরীর বাঁকিয়ে ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে পড়লো পানিতে। কুমির। নিশ্চয় পেট ভরা, নইলে হাতের কাছে সহজ শিকার ফেলে এভাবে পালাতো না।

পানির অতো কিনারে আর থাকলো না কিশোর, নিরাপদ নয়, সরে এলো আরেকটু। নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো গাছটার নিচে, যেটাতে চিতা-মানবকে দেখা গেছে। অনেক পুরনো মস্ত এক বাওবাব গাছ, বড় বড় ডালপালা। পিপের মতো মোটা কাণ্ডের ভেতরটা ফাঁপা থাকে এগুলোর, এটারও নিশ্চয় ওরকমই রয়েছে। ওপর দিকে তাকালো সে। ডাল আর পাতার আড়ালে আবছামতো দেখতে পেলো ওটাকে। কড়া একটা গন্ধ এসে লাগলো নাকে। চিড়িয়াখানায় চিতাবাঘের খাঁচার সামনে দাঁড়ালেই ওই গন্ধ পাওয়া যায়, কিশোরের পরিচিত। এখানে এই গন্ধ কেন? গাছের ওপরের ওটা তো মানুষ, চিতাবাঘ নয়।

আর চুপ থাকতে পারলো না সিমবা। গলা ফাটিয়ে ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিলো, লাফিয়ে উঠে ডালের ওপরের জীবটাকে ধরার চেষ্টা করছে। চোখের পলকে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে গেল জীবটা। ঝপাৎ করে গিয়ে পড়লো একটা ঝোপের ওপর।

ছুটে যেতে চাইলো সিমবা। কলার ধরে তাকে আটকালো কিশোর। জীবটা লাফ দিতেই যা দেখার দেখে ফেলেছে। দেখে অবাক হয়েছে। জানোয়ারটা সত্যিই একটা চিতাবাঘ।

পেছনে কুকুর আর মানুষ রয়েছে। কুকুর নিয়ে ওদেরকে মারতে আসে দু'পেয়েরা, একথা জানা আছে চিতাবাঘের, তাই আর এদিকে এলো না। ছুটলো সামনের দিকে। নদীর তীর ধরে।

মিস্টার আমান আর অন্যেরাও বাঘটাকে লাফ দিতে দেখেছেন। রাইফেল তুলে দৌড় দিলেন তিনি। বেরিয়ে এলেন নদীর পাড়ে। তারস্বরে চিৎকার করছে সিমবা।

তিনটে পথ রয়েছে বাঘটার যাওয়ার, কিশোরের দিকে, মুসারা যেদিকে রয়েছে সেদিকে, কিংবা আমান যেদিকে রয়েছেন সেদিকে। চতুর্থ দিকে রয়েছে নদীটা। ওটার দিকে গিয়ে কোনো লাভ নেই, জানে চিতাবাঘ। কাজেই সেদিকে যাবে না।

কিশোরের সাথে রয়েছে ভয়ংকর এক কুকুর, যাকে ভীষণ ঘৃণা করে চিতাবাঘ। মুসাদের সাথে রয়েছে তীব্র আলো, কাজেই সেদিকেও গেল না। তৃতীয় যে পথটা, সেটা অন্ধকার, নিরাপদ ভেবে সেদিকেই ছুটলো ওটা। পড়ে গেল আমানের সামনে।

বাঘটাকে দেখা মাত্রই গুলি করলেন আমান। খুলি ছাতু করে দিলো শক্তিশালী বুলেট। ডিগবাজি খেয়ে উল্টে পড়লো চিতাবাঘ, পড়ে রইলো ওখানেই।

দু'দিক থেকে ছুটে এলো মুসারা আর কিশোর।

নদীর পাড়ের মাটিতে নিথর হয়ে পড়ে আছে জানোয়ারটা। কিন্তু গ্রামবাসীরা ওটাকে ছুঁতে সাহস করলো না। মুসা ওটার গায়ে পা রাখতে যেতেই চেঁচিয়ে উঠলো সর্দার, 'ধরো না, ধরো না! এখনও যাদুতে বোঝাই হয়ে আছে ওটা!'

তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন আমান, 'এখনও বিশ্বাস করেন একথা? ইংরেজি জানেন যখন বোঝাই যাচ্ছে খ্রীষ্টানদের মিশনারি ইস্কুলে গিয়েছেন। বিজ্ঞান আপনার অপরিচিত নয়। তার পরেও একটা মরা চিতাবাঘকে এতো ভয়?'

'মাই ফ্রেণ্ড,' হাসলো সর্দার, 'আপনিও নিগ্রো। আপনার অন্তত এসব কথা অজানা থাকার কথা নয়। ইস্কুলে সব বিষয়ে শেখানো হয় না। এসব জ্ঞান এসেছে আমাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে। আমরা যা দেখেছি আপনিও নিজের চোখেই সেটা দেখেছেন। বাঘটা প্রথমে মানুষ হয়ে গেল, তারপর আবার মানুষ থেকে বাঘ। এর মানে কি? প্রচণ্ড যাদুর ক্ষমতা আছে এটার। অনেক কিছুই করতে পারে।'

মুসার মাথায়ও জট পাকিয়ে গেছে ব্যাপারগুলো। বললো, 'বাবা, আমার মনে হয় সত্যি কথাই বলছে সর্দার। আমাদের চোখের সামনেই তো ঘটলো ঘটনাগুলো। অবিশ্বাস করি কিভাবে?'

রবিন মেনে নিতে পারলো না তার কথা। বললো, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, যদিও নিজের চোখেই দেখেছি। কিন্তু চোখের ভুলও তো হতে পারে? অন্ধকার রাত, এই বনের মধ্যে, ভুল হতেই পারে।'

হেসে আমান বললেন, 'মুসা, তোমাকে দোষ দেয়া যায় না। যা ঘটেছে, এটা আমার কাছেও অদ্ভুত লাগছে। আপাত দৃষ্টিতে রহস্যময় লাগলেও অতোটা জটিল বোধহয় নয় ব্যাপারটা।'

'আমারও তাই ধারণা,' আমানের মুখের কথা টান দিয়ে কেড়ে নিলো যেন কিশোর। 'গোড়া থেকে ভাবা যাক। পায়ের ছাপগুলো অনুসরণ করে গাঁ থেকে

বেরিয়ে এলাম আমরা। একখানে এসে ঘাসের মধ্যে হারিয়ে গেল ওগুলো। আবার যখন বেরোলো, অন্যরকম লাগলো ছাপগুলো। তার কারণ, তখন পরিবর্তন হয়েছে। আঙুলের মাথায় নখের দাগও দেখা গেল। জ্যান্ত চিতাবাঘ কখনোই নখ বের করে হাঁটে না। ছাপগুলো মরা চিতাবাঘের পায়ের।'

ঝুলে পড়লো মুসার চোয়াল। কি বলতে চায় কিশোর? মরা বাঘ আবার হাঁটে কি করে?

তার মনের কথাটা যেন পড়তে পেরেই হাসলো কিশোর। 'মরা বাঘের পা। বুঝলে না? মরা চিতাবাঘের পা কেটে নিজের পায়ে বেঁধে নিয়েছে একজন মানুষ। মনে আছে নিশ্চয়ই, ছাপগুলোর পাশের ঘাস দেবে যায়নি, কিংবা ডগা ভাঙেনি, জাগুয়ার কিংবা চিতাবাঘ চলার পথে যেটা হয়ই। কিন্তু মানুষ হেঁটে গেলে সব সময় সেটা হয় না। এখন প্রশ্ন হলো, শুরুতে ছাপের নখগুলো কোথায় গিয়েছিলো? যে কোনো আফ্রিকান গাঁয়ের আশেপাশে চিতাবাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া যাবেই। এটা নতুন কোনো ব্যাপার নয়, এতে অবাক হওয়ারও কিছু নেই। আজ রাতে তক্কে তক্কে ছিলো লোকটা। বনের ভেতরে দেখেছে একটা চিতাবাঘকে। ওটা এসেছিলো গাঁয়ের কাছে, বোধহয় গরুছাগলের লোভেই। এমনও হতে পারে, লোকটাই একটা বাছুর-টাছুর কিছু বেঁধে রেখে গিয়েছিলো গাঁয়ের ধারে। যাই হোক, বাঘটা এসেছে, তারপর তাড়া খেয়ে পালিয়েছে। তার পায়ের ছাপ পড়েছে। কিছুদূর ওটার ছাপ ধরে ধরে এগিয়েছে লোকটা। যেখানে ঘাসের ভেতর হারিয়ে গেছে, তার পর থেকে নিজের পায়ে চিতার পা বেঁধে আরেক দিকে হেঁটেছে। আমাদেরকে টেনে নিয়ে গেছে বনের ভেতরে। সেখানে ইচ্ছে করে আমাদের দেখা দিয়েছে, তারপর ঢুকে পড়েছে আবার ঘন বনে।'

'তাহলে এই চিতাটা?' মরা বাঘটার গায়ে লাথি মারলো মুসা।

'এটা আবার কি? আসল চিতা। বনের মধ্যে চিতাবাঘ থাকেই। রাতে ডাকেও। ডেকেছিলো, আমরা খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গেছি। এর সাথে লোকটার সম্পর্ক নেই। সে স্রেফ পালিয়েছে।'

'কিন্তু কেন? আমাদেরকে এভাবে ফাঁকি দেয়ার তার ইচ্ছে হলো কেন? আর চিতাবাঘের ছাল গায়ে জড়িয়ে চিতা-মানব সাজারই বা এই শখ কেন?'

'বোধহয় বুঝতেই পারছি,' কিশোরের মতো রবিনও বুঝে গেল ব্যাপারটা। 'লেপার্ড সোসাইটি। ভয়াবহ খুনেদের একটা গোপন সংস্থা এটা।' পত্রিকায় পড়েছে এসব কথা। 'উগাণ্ডায় ওদের জোর ততোটা নেই, তবে কংগোতে প্রবল। আর কংগো সীমান্তের কাছেই রয়েছি আমরা। মধ্য আর পশ্চিম আফ্রিকায়ও ছড়িয়ে আছে ওরা। অত্যন্ত গোপন একটা সংস্থা। চিতাবাঘের ছাল পরে, থাবা পায়ে দিয়ে, আঙুলে ইস্পাতের ধারালো নখ পরে মানুষ শিকারে বেরোয় এই সংস্থার লোকেরা। তাদেরকে শেখানো হয় চিতাবাঘই তাদের দেবতা, চিতাবাঘকে পূজো

করতে হবে, তাহলেই প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী করে দেবে ওদেরকে চিতাবাঘ। আর একবার সেই ক্ষমতা হাতে এসে গেলে যা ইচ্ছে করতে পারবে। যেহেতু চিতাবাঘকে দেবতা মানে ওরা, নিজেদেরকেও চিতাবাঘই মনে করে।'

'আর কাজ পায়নি ব্যাটারা, হুঁহ্,' মুসা বললো, 'চিতাবাঘকে দেবতা! গেল কোথায় শয়তানটা?'

'কি জানি,' হাত ওল্টালো কিশোর। 'বনের মধ্যেই হয়তো ঘাপটি মেরে রয়েছে কোথাও, দেখছে আমাদেরকে। দেবতাকে মারার জন্যে রেগে গেছে আমাদের ওপর। সুযোগ পেলেই শোধ নিতে আসবে।'

'আসুক না দেখি এবার,' গেঞ্জির হাতা ওপরের দিকে ঠেলে দিলো মুসা। 'ভূত না হলেই হয় শুধু।'

তিন

ফেরার জন্যে ঘুরতেই একটা টর্চের আলো গিয়ে পড়লো আরও দুটো চিতাবাঘের ওপর, তবে খুব ছোট ওগুলো, বাওবাবের একটা খোঁড়ল থেকে বেরিয়েছে। দুধ খাওয়ার জন্যে ছুটে গেল নিহত মায়ের কাছে। বেড়ালের বাচ্চার মতো মিউ মিউ করে নিথর, রক্তেভেজা শরীরটায় গা ঘষতে লাগলো।

'আহ্হা,' আফসোস করে বললেন আমান, 'কাজটা খারাপ হয়ে গেল! বাচ্চা আছে ভাবতেই পারিনি!'

'যা হবার তো হয়ে গেছে। এখানে ফেলে রেখে গেলে মরবে,' কিশোর বললো। 'নিয়েই যাই আমরা।'

'হ্যাঁ, তাই করতে হবে।'

'আমি নিচ্ছি,' মুসা বললো। 'আঁচড়ে দেবে না তো?'

'নাহ্, তা বোধহয় দেবে না,' বাচ্চা চিতাবাঘের আচরণ মনে করার চেষ্টা করছে রবিন, বইয়ে পড়েছিলো। 'বেশি ছোট এগুলো। ভয় পেতে শেখেনি এখনও।'

জন্তুজানোয়ারের প্রতি ভালোবাসা মুসার সব সময়েই প্রবল। খুব সহজে ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলে। বাচ্চা দুটোর দিকে এগোলো সে। সাবধানে, দু'হাতে ধরে কোলে তুলে নিলো ওদুটোকে।

'মা টাকেও নিয়ে যাওয়া দরকার, মেরেই যখন ফেলেছি,' আমান বললেন। 'চামড়াটা কোনো মিউজিয়মের কাছে বিক্রি করে দেয়া যাবে।' ইশারায় গ্রামবাসীদেরকে বললেন বাঘটাকে তুলে নেয়ার জন্যে। কোনোরকম আগ্রহ দেখালো না ওরা। চাপাচাপি করলেন না তিনি। বললেন, 'কিশোর, কাজটা আমাদেরকেই করতে হবে।'

'বুশ-জ্যাকেটের পকেট থেকে নাইলনের হালকা দড়ি বের করে জোড়ায় জোড়ায় বাঘটার চারটে পা বাঁধলেন তিনি। রবিন আর কিশোর মিলে সোজা শক্ত একটা ডাল খুঁজে বের করে, কেটেছেঁটে সাফ করে আনলো। বাঘের বাঁধা পায়ের ফাঁক দিয়ে সেটা ঢুকিয়ে দিয়ে একমাথা কাঁধে তুলে নিলেন আমান, আরেক মাথা ওরা দু'জনে। একশো পাউণ্ড ওজনের জানোয়ারটাকে বয়ে নিয়ে ওরা ক্যাম্পে ফিরে চললো।

চলার পথে খুব সতর্ক রইলো সবাই। টর্চের আলো সারাক্ষণই এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো, ঘাপটি মেরে থাকা চিতামানব এসে হামলা চালায় কিনা।

অন্ধকার বন থেকে বেরিয়ে তবে স্বস্তি। চোখে পড়লো ক্যাম্পের আলো। শরীরে উষ্ণ কোমল পরশ বুলিয়ে দিলো যেন।

ক্যাম্পে ফিরে আমান আদেশ দিলেন, 'বড় দেখে একটা খাঁচা নিয়ে এসো। খেলাধুলার প্রচুর জায়গা থাকে যেন। হাজার হোক চিতাবাঘের বাচ্চা, চুপ করে বসে থাকতে পারবে না।'

ট্রাক থেকে গিয়ে একটা সিংহের খাঁচা নামিয়ে আনলো ডিগা আর কাকামি। বড় একটা বেতের ঝুড়িতে কাপড় আর কম্বল দিয়ে নরম বিছানা পেতে দিয়ে সেটা রেখে দিলো খাঁচার এককোণে। ঘুমানোর সময় হলে ওখানে গিয়ে ঘুমাবে বাচ্চাগুলো, বাকি সময় নেমে এসে খেলবে।

ওগুলোকে খাওয়ানোর দায়িত্বটা নিলো মুসা। এসব কাজ আগেও করেছে। মা-হারা বেড়ালের বাচ্চা পোষা তার কাছে কিছুই না। এগুলোও বেড়ালের বাচ্চাই, তবে অনেক বড়, এই যা তফাৎ। ফিডারে করে মানুষের বাচ্চার মতোই দুধ খাওয়ানো যায় বাঘের বাচ্চাকেও।

বিছানায় যেতে আর ইচ্ছে করলো না কারোই। ভোর হয়ে গেছে। ফর্সা হয়ে আসছে পুবের আকাশ। ইতিমধ্যেই রূপালির ওপর গোলাপী আভা ফুটতে শুরু করেছে।

একটা রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি, কিশোর ভাবছে, খামবু। কোথায় গেল? তাকে নাম ধরে ডেকেছিলেন মিস্টার আমান, স্পষ্ট মনে আছে তার। খামবু, ডিগা আর কাকামি, তিনজনকেই ডেকেছিলেন। তবে ওদের সাথে খামবু ছিলো কিনা, সেটা মনে করতে পারছে না কিশোর। এখন মনে হচ্ছে, বোধহয় ছিলো না, তাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়নি। তাহলে কি ক্যাম্পে থেকে গিয়েছিলো? কেন?

একই প্রশ্ন বোধহয় আমানের মনেও দেখা দিয়েছে। বাবুর্চি যখন ধূমায়িত কফির ট্রে হাতে তাঁবু থেকে তাঁবুতে যাচ্ছে, তখন বলে দিলেন, 'খামবুকে বলো আমার সাথে দেখা করতে।'

'সে তো নেই, বাওয়ানা!'

'নিশ্চয় আছে। আমাদের সঙ্গে যায়নি।'

'যায়নি! তাহলে কোথায় গেল?'

'সেটাই তো আমি জানতে চাই।...ওই, আসছে।'

ঝট করে ফিরে তাকালো বাবুর্চি আর তিন গোয়েন্দা। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে খামবু। ভেবেছে, আবছা অন্ধকারে কারো চোখে পড়বে না। লম্বা ঘাস আর হালকা ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে চলে যাবে তাঁবুর ভেতরে। কিন্তু আমানের মতো শিকারীর তীক্ষ্ণ চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি সে। সারা গা খালি, সব সময় যেমন থাকে, পরনে একটা সাফারি প্যান্ট। বগলের তলায় একটা পুঁটুলি।

'ডাকো ওকে,' আমান বললেন।

ধরা পড়ে গেছে। আর লুকানোর চেষ্টা করে লাভ নেই, বুঝতে পারলো খামবু। এগিয়ে এলো। চোখে তীব্র ঘৃণা। লোকটার চোখে এই দৃষ্টি আগেও দেখেছেন আমান, তবে এতোটা খারাপ দেখেননি। তাঁর নির্দেশ আগে কখনও অমান্য করেনি লোকটা, এই প্রথমবার করলো। খুব ভালো পথপ্রদর্শক সে, তাই তাকে প্রথমবারের জন্যে ক্ষমা করে দেবেন ঠিক করলেন।

'খামবু,' তিনি বললেন, 'কাল রাতে তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলেছিলাম। শোনোনি?'

ভোঁতা গলায় জবাব দিলো খামবু, 'শুনিনি।'

'সারারাত কোথায় ছিলে?'

'এখানেই।'

'কিন্তু আমি তো শুনলাম, তুমি ক্যাম্পে ছিলে না।'

'ভুল শুনেছেন। আমি তাঁবুতেই ছিলাম, ঘুমিয়ে। যারা বলেছে, ভুল বলেছে।'

'এই তো দেখলাম ঝোপ থেকে বেরোলে। কোথায় গিয়েছিলে?'

'আপনাকে খুঁজতে, বাওয়ানা।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন আমান। বুঝলেন, এভাবে প্রশ্ন করে লাভ হবে না। সত্যি কথা বলবে না খামবু। অন্য রাস্তা ধরলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'লেপার্ড সোসাইটি সম্পর্কে কি জানো?'

এইবার কাজ হলো। কেঁপে উঠলো খামবু। আরেক দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে জবাব দিলো সে, 'কিছু জানি না, বাওয়ানা।'

পরিষ্কার বোঝা গেল, ভীষণ নাড়া খেয়েছে সে। তার জন্যে দুঃখ হলো আমানের। বুঝতে পারলেন, কোনো ভাবে জড়িয়ে ফেলা হয়েছে খামবুকে, অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কিছু করতে পারছে না সে, বেরোতে পারছে না ওদের খপ্পর থেকে। একে শত্রু ভেবে এর সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেয়ার কোনো মানে হয় না। বরং একে করুণা করা উচিত।

এক পা থেকে আরেক পায়ে শরীরের ভর রাখলো খামবু। 'আমি যাই?'

'খামবু,' আমান বললেন, 'বিপদের মধ্যে রয়েছো তুমি, বুঝতে পারছি। আমাকে বলতে চাও না, ভালো কথা। কিন্তু মনে রেখো, এখানে তোমার শত্রু নেই কেউ, বন্ধু। আমরা তোমার ভালো চাই। সাহায্য করতেও রাজি আছি। প্রয়োজন হলে বলো।'

'লাগবে না। আপনাদের সাহায্য লাগবে না আমার।' বলে রাগ দেখিয়ে এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়ালো খামবু। গটমট করে হেঁটে চলে গেল।

চার

আগুন, তাঁবু আর অনেক মানুষ চোখে পড়লো জেনারেল হুডিনির। নাকে এলো ডিম আর মাংস ভাজার সুগন্ধ। জিবে পানি এসে গেল তার। খিদেয় মোচড় দিলো পেট।

ঝোপের ভেতরেই রয়েছে এখনও জেনারেল। দাঁড়িয়ে পড়লো। হ্যাট খুলে রেখে চিরুণি বের করে চুল আঁচড়ালো। হ্যাটটা আবার তুলে নিয়ে টিপেটুপে ঠিকঠাক করে মাথায় বসালো। যতো যা-ই হোক, সে একজন শ্বেতাঙ্গ শিকারী, অন্তত ভান তো করছে। সেটা বুঝতে দেয়া চলবে না মানুষকে, বরং বোঝাতে হবে সত্যি সত্যি সে পাকা শিকারী। টেনেটুনে সোজা করলো বুশ-জ্যাকেটটা। পরনের সাফারি শর্টস থেকে ধুলো ঝাড়লো হাত দিয়ে চাপড় মেরে।

গাল ফুলিয়ে মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস ছেড়ে যেন গালও ঠিক করার চেষ্টা করলো। নিজেকে একজন কেউকেটা গোছের লোক করে তোলার প্রচেষ্টা। তবে সেটা করা অতো সহজ নয়, কারণ কেউকেটা হওয়ার জন্যে যেসব গুণ দরকার হয়, তার কোনোটাই নেই তার মাঝে। আসলে জেনারেল ডেলমার হুডিনি দ্য হোয়াইট হান্টার, না জেনারেল, না শিকারী। কোনোটাই না।

উত্তর রোডেশিয়ায় একটা খামার করেছিলো সে। কিন্তু চাষাবাদের কিছুই জানে না। কাজেই পুঁজি গেল, ব্যাংকে দেনা বাড়লো, শেষমেশ খামারটা বিক্রি করে দিয়ে দেনা শোধ করতে হলো। কি করে পেট চালাবে ভাবছে, এই সময় একজন বুদ্ধি দিলো, 'শ্বেতাঙ্গ শিকারী হয়ে যাচ্ছো না কেন?'

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনেক কোটিপতি শিকারে আসে আফ্রিকায়। তাদের তখন একজন শ্বেতাঙ্গ শিকারী দরকার হয়, যে সাহায্য করতে পারবে। ওই লোকটা এমন হয়, যে দেশটাকে চেনে, কোথায় শিকার করার মতো জন্তুজানোয়ার পাওয়া যায় জানে, বন্দুক চালাতে পারে, আর নিশানা খুব ভালো হয়।

সাফারিতে (শিকার অভিযান) বেরোয় বিদেশী কোটি-পতি। নেতৃত্ব দেয় তখন সেই ভাড়া করা শ্বেতাঙ্গ শিকারী। ক্যাম্পে খাবার আর পানি ঠিকমতো সরবরাহ হলো কিনা লক্ষ্য রাখে, হাতি, মোষ আর সিংহের খবর নেয়, তাদের চিহ্ন

অনুসরণ করে বিদেশীকে নিয়ে যায় শিকারের কাছে। তাকে গুলি করার সুযোগ করে দেয়। যদি গুলি করে মারতে না পারে বিদেশী শিকারী, শুধু আহত করে জন্তুটাকে, তখন তেড়ে আসা সেই মারাত্মক জানোয়ারকে খতম করার ভার নেয় শ্বেতাঙ্গ শিকারী। মোটকথা, বিদেশী শিকারীর সমস্ত ভালোমন্দ এমনকি জীবনের ভারও থাকে তখন শ্বেতাঙ্গ শিকারীর ওপর। কাজেই, শিকার করা জন্তুর ওপর পা তুলে দিয়ে বিদেশী যখন ছবি তোলে, তখন তার পাশে দাঁড়ানোর অধিকার অবশ্যই থাকে শ্বেতাঙ্গ শিকারীর। এই সম্মানটা পাওয়ার যোগ্য সে।

খুব গর্বের জীবন, বিচিত্র, রোমাঞ্চকর জীবন শ্বেতাঙ্গ শিকারীর। অনেকেই সেটা হতে চায়।

'হুঁহ্, কি যে বলো! আমি হবো শ্বেতাঙ্গ শিকারী? আর লোক পাওনি!' হুডিনি বলেছে বন্ধুকে। 'শিকারের শ-ও জানি না আমি।'

'কখনও কিছু শিকার করোনি?'

'একটা খরগোশকে একবার গুলি করেছিলাম। লাগাতে পারিনি। পালালো।'

'ও। থাক, গুলি করা লাগবে না তোমার। গুলি যা করার তোমার মক্কেলই করতে পারবে।'

'যদি সে মিস করে?'

'বন্দুক-বাহক তো থাকবেই তোমার সাথে। এমন লোককে নেবে, যে গুলি চালাতে জানে। মক্কেল মিস করলেই একনাগাড়ে গুলি চালাতে শুরু করবে তুমি আর বন্দুক-বাহক। একটা না একটা গুলি জায়গামতো লাগবেই। জানোয়ারগুলো তো আর ছোট না।'

'কিন্তু শিকার কোথায় পাওয়া যায় তাই তো জানি না।'

'তোমার জানার দরকার কি? গাইডকে চাকরি দেবে না? সে-ই তো নিয়ে যাবে। আসলে বসিং করা ছাড়া কিছুই করতে হবে না তোমার। কাজটা ওরাই করুক না, কৃতিত্বটা তোমার।'

শুনে খুব ভালো লাগলো হুডিনির। হাসলো। 'শুরুটা কি করে করবো?'

'স্পোর্টস ম্যাগাজিনে বড় করে বিজ্ঞাপন দাও। বড় বড় বুলি আউড়াবে। এই যেমন, দক্ষ শিকারী, অনেক বছরের অভিজ্ঞ, বন্দুকে নিশানা একশোটার মধ্যে একশোটাই সই, শিকারে গিয়ে সাফল্যের আশা শতকরা একশো ভাগ, ইত্যাদি ইত্যাদি। নাম-ঠিকানা দেবে পরিষ্কার করে। ও, আরেকটা ব্যাপার, নামটা যাতে ভারিক্কি হয়, কানে লাগে, সেই ব্যবস্থা করবে।'

'কিভাবে?'

'নামের আগে ক্যাপ্টেন অথবা মেজর-টেজর কিছু একটা লাগিয়ে নেবে। নামের মধ্যে গাম্ভীর্য আসবে।'

বাহ্, ভালো কথা বলেছে। মনে মনে বন্ধুর বুদ্ধির তারিফ করলো হুডিনি।

ভাবলো, লাগাতেই যদি হয়, ক্যাপ্টেন বা মেজর কেন, আরও বড় কিছু লাগাবে, তাতে অনেক বেশি ভারি হয়ে যাবে নাম। সুতরাং, হুডিনি হয়ে গেল জেনারেল ডেলমার হুডিনি, হোয়াইট হান্টার।

অনেক কষ্টে কিছু ধারকর্জ করে আউটডোর পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলো হুডিনি। কয়েকবার দেয়ার পর সাড়া পেলো এক আমেরিকান কোটিপতির কাছ থেকে। তিরিশ দিনের জন্যে সাফারিতে আসতে চান। খরচ-খরচা কেমন লাগবে, যেন জানায় হুডিনি। এক মাসের 'অভিজ্ঞ সাহায্যের' জন্যে পঁয়তিরিশ হাজার ডলার লাগবে, জানিয়ে দিলো হুডিনি। টাকার অভাব নেই আমেরিকান ভদ্রলোকের, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন।

ঠিক হলো, নাইরোবিতে দেখা হবে ওদের। বেশির ভাগ সাফারিই ওই অঞ্চলে হয়।

ভদ্রলোকের নাম মিস্টার ডেভিড রনসন। স্ত্রীকে নিয়ে আসছেন সাথে করে। সময়সীমা ঠিক করে দেয়া হলো। নাইরোবির নরফোক হোটেলের লাউঞ্জে 'বিখ্যাত শিকারীর' সঙ্গে দেখা করলেন মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস রনসন। এই শ্বেতাঙ্গ শিকারীর ওপরই আসছে একটা মাসের জন্যে নিজেদের জীবনের ভার অর্পণ করতে হবে দু'জনকে।

চমৎকার অভিনয় করলো জেনারেল হুডিনি। প্রথমেই শুরু করলো যুদ্ধের গল্প। কি সাজ্যাতিক সব ঝুঁকি নিয়েছিলো, লম্বাচওড়া করে শোনালো। অবশ্যে কোন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো সে, কোন অঞ্চলে, সেসব কিছুই বললো না। বললো, কতো বড় বড় লোককে নিয়ে শিকারে গিয়েছিলো সে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার আর্চডিউক আর নরওয়ের রাজার মতো বিখ্যাত সব ব্যক্তি। মিসেস রনসনের কাছে রীতিমতো হিরো বনে গেল সে, কিন্তু মিস্টার রনসন কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। বড় বেশি 'ভালো' হয়ে যাচ্ছে যেন এই শ্বেতাঙ্গ শিকারীটি। তবে অবিশ্বাস করতে পারলেন না।

নিয়ম অনুযায়ী আগেই রনসনের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে ফেলেছে হুডিনি। সেই টাকায় লোক ভাড়া করেছে, বন্দুক কিনেছে নিজের আর কর্মচারীদের জন্যে। প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে গেম লাইসেন্স জোগাড় করেছে। মোটা টাকা বেতনে অন্য দল থেকে ভাগিয়ে এনেছে অভিজ্ঞ বন্দুক-বাহক, ট্র্যাকার, আর গাইড। তিরিশ দিনের জন্যে খাবার-দাবার কিনেছে। তাঁবু, দড়ির খাটিয়া, ফোল্ডিং বাথ-টাব কিনেছে। জীপ গাড়ি ভাড়া করেছে।

দিনক্ষণ দেখে সাফারিতে বেরিয়ে পড়লো একদিন দলটা। মক্কেলদেরকে গাইড করে নিয়ে চললো জেনারেল হুডিনি, আর জেনারেলকে গাইড করে চললো তার ভাড়াটে কর্মচারীরা।

প্রথম হপ্তাটা সব কিছুই ঠিকঠাক মতো চললো। একটা হাতি মারলেন মিস্টার

রনসন। তাঁর বুলেটে সামান্য জখম হলো হাতিটা, কিন্তু শ্বেতাঙ্গ শিকারী আর তার তিনজন আফ্রিকান সহকারীর গুলিবৃষ্টিতে ধরাশায়ী হলো গজপতি। কার গুলিতে যে হাতিটা মরলো, বোঝা মুশকিল।

একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে তখন। গুলি লেগে গাছ থেকে পড়ে গেল একটা বানর। জেনারেল হুডিনি জানালো, তার বন্দুক-বাহক লোকটার নিশানা ভালো না। কিন্তু মিস্টার রনসনের মনে পড়লো, যদিও স্পষ্টভাবে নয়, মনে হয়েছে আরকি তাঁর, জেনারেলের বন্দুকটাই যেন কেমন আচরণ করছিলো ওই বিশেষ মুহূর্তে, নলটা বোধহয় ওপরের দিকে উঠে গিয়েছিলো, একেবারে বানরটার দিকে।

একটা ওয়াটারবাক, একটা ওয়াইল্ডবীস্ট আর একটা জেব্রা মারা হলো। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই জেনারেলের আচরণ সন্দেহজনক লাগলো রনসনের কাছে। বোকা নন তিনি, তাহলে এতোবড় ধনী হতে পারতেন না। লোক চরিয়েই এতোটা ওপরে উঠেছেন তিনি। তাঁর মনে হতে লাগলো, হুডিনি লোকটা একটা ধাপ্পাবাজ।

তারপর এলো সেই বিশেষ দিনটি, সিংহ শিকারের দিন। তাঁবু থেকে প্রায় শ'খানেক গজ দূরে চলে গিয়েছেন মিসেস রনসন, একটা টমি হরিণকে গুলি করার জন্যে। হাতে একটা ·২৭৫ রিগবি রাইফেল, হরিণ শিকারের চমৎকার অস্ত্র, কিন্তু সিংহের জন্যে খেলনা। তবে তিনি ভয় পাচ্ছেন না, কারণ সাথে রয়েছে বিখ্যাত দুর্ধর্ষ শ্বেতাঙ্গ শিকারী, তাঁর হিরো। শিকারীর হাতে রয়েছে একটা ·৪৭০ ক্যালিবারের নিট্রো এক্সপ্রেস রাইফেল, প্রচণ্ড শক্তিশালী অস্ত্র। হাতি-গণ্ডার সব কিছু ঠেকিয়ে দেয়া যায় এই জিনিস দিয়ে। কাজেই ভয় কি?

উঁচু হাতিঘাসের ভেতর থেকে আচমকা লাফিয়ে বেরিয়ে এলো একটা জানোয়ার। বিশাল এক সিংহ। জেনারেল আর মিসেস রনসনের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো। বিপদের আশঙ্কা করছে না সে, পেটও ভরা। আপাতত শিকারেরও ইচ্ছে নেই। কাজেই গোলমাল না করে চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরলো সে।

হাতে ভারি রাইফেল থাকলে মিসেস রনসনই গুলি করতেন। কিন্তু নেই যখন, কি আর করা? জেনারেলকেই অনুরোধ করলেন সিংহটাকে মেরে দেয়ার জন্যে।

আশপাশে তাকালো জেনারেল। সাথে একজন বন্দুক-বাহকও নেই। তবে তাতে তেমন ঘাবড়ালো না হুডিনি। সিংহটার ভাবসাবে মনে হচ্ছে তেমন সাহসী নয়, ভীতু। হয়তো গুলির শব্দে পালাবে। আর যদি কোনোভাবে মেরে ফেলা যায়, তাহলে তো কথাই নেই। একলাফে হুডিনির দাম আর 'খ্যাতি' দশগুণ বেড়ে যাবে। এতো কাছে থেকে মিস করবে বলে মনে হলো না তার। ভারি রাইফেলটা তুলে গুলি করে বসলো।

এরপর যা ঘটলো, তাতে প্রাণ উড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো জেনারেলের। চোখ উল্টে যে পড়ে যায়নি এটাই বেশি। ভয়ংকর রাগে গর্জে উঠে প্রতিশোধ নিতে ছুটে এলো আহত সিংহ। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে শয়তান

দু'পেয়েদের।

হাত থেকে বন্দুক খসে গেল হুডিনির। ঝেড়ে দৌড় দিলো পেছন ফিরে। মিসেস রনসন বিপদটা বুঝে ফেললেন। কিন্তু কিছু করার নেই। হালকা রাইফেল দিয়েই গুলি চালাতে লাগলেন সিংহের ওপর। কিছুই হলো না। তিনলাফে এসে তাঁকে ধরে ফেললো সিংহ। মাটিতে ফেলে দিয়ে ছিঁড়তে শুরু করলো। ঠিক এই সময় কানে এলো আরেকটা ভারি রাইফেলের শব্দ। পরক্ষণে জ্ঞান হারালেন তিনি।

জ্ঞান ফিরলে দেখলেন তাঁবুতে খাটিয়ায় শুয়ে রয়েছেন। ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করেছে দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ বন্দুক-বাহক লোকটা।

'কি হয়েছিলো?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস।

'ভাগ্য ভালো, সময়মতো দেখে ফেলেছিলো ও,' বন্দুক-বাহককে দেখিয়ে বললেন মিস্টার রনসন। 'গুলি করে মেরেছে সিংহটাকে।'

'জেনারেল কোথায়?'

'চলে গেছে। ভাগিয়ে দিয়েছি। বলে দিয়েছি, আরেকবার আমার সামনে পড়লেই খুন করবো।'

'কিন্তু ওকে ছাড়া নাইরোবিতে ফিরতে পারবো না আমরা।'

'নিশ্চয়ই পারবো। গাইডরাই ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। এই সাফারির মাথাই হলো ওরা। কেন, বুঝতে পারছো না, ও না থাকলে,' বন্দুক-বাহককে দেখালেন আরেকবার রনসন, 'এতোক্ষণে তুমি মরে যেতে? তোমাকে সিংহের মুখে ফেলে হুডিনি তো পালিয়েছিলো। শ্বেতাঙ্গ শিকারী না ছাই! আবার জেনারেল! হুঁহ্! শয়তান কোথাকার! আমাদের ভাগ্য ভালো, তেমন ক্ষতি হওয়ার আগেই মুখোশ খুলে গেছে ব্যাটার! আরও কতো মারাত্মক বিপদে ফেলে দিতো কে জানে!'

তারপর থেকে তিনদিন তিনরাত চলেছে জেনারেল হুডিনি। এই ক'দিনের মধ্যে এই প্রথম বিদেশীদের ক্যাম্প চোখে পড়লো, নাকে লাগলো লোভনীয় খাবারের গন্ধ।

তবে সবার চোখ এড়িয়ে ক্যাম্পের কাছে আসতে পারেনি সে। চুল আঁচড়ানোর সময়ই তাকে দেখে ফেলেছে মুসা। সে একা থাকলে অবশ্য এতো সহজে দেখতো না। তার কোলে রয়েছে একটা চিতাবাঘের বাচ্চা। বাতাসে মানুষের গায়ের গন্ধ পেয়েই বোধহয় ঝোপের দিকে তাকিয়েছিলো ওটা, চঞ্চল হয়ে উঠেছিলো; আর কেন ওরকম করছে সেটা দেখতে গিয়েই জেনারেলকে চোখে পড়ে গেছে মুসার।

এগিয়ে এলো হুডিনি। ভারিক্কি চালে বললো, 'মাই বয়, তোমার মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

অপরিচিত একটা লোকের মুখে 'মাই বয়' শুনতে ভালো লাগলো না মুসার, আর 'মালিক-টালিক' শব্দগুলো শুনতেও পছন্দ করে না। তবু অভদ্রতা করলো না।

বাচ্চাটার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললো, 'গুড মরনিং, স্যার। মালিককে গিয়ে কি নাম বলবো?'

শরীর টানটান করে দাঁড়ালো হুডিনি, সে সাধারণ কেউ যে নয় সেটা বোঝানোরই চেষ্টা। বললো, 'জেনারেল ডেলমার হুডিনি, প্রফেশনাল হান্টার।'

'কে রে, মুসা?' মিস্টার আমান ডেকে জিজ্ঞেস করলেন।

'একজন ভি আই পি, বাবা। দেখো এসে।'

একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়েছে জেনারেল। তার সাথে হাত মেলাতে এগিয়ে এলেন আমান। লম্বাচওড়া করে নিজের পরিচয় দিলো হুডিনি।

এই অঞ্চলের সমস্ত বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ শিকারীর নাম জানেন আমান, আসার সময় খোঁজখবর করেই এসেছেন কিন্তু এই নামটা তো কখনও শোনেননি? সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, 'আসুন। তা এতো সকালে কি মনে করে? কাছেই বুঝি আপনার ক্যাম্প?'

'না। একটা বোকা আমেরিকানকে সাফারিতে নিয়ে গিয়েছিলাম। সাথে তার বৌটা রয়েছে, আরও বড় গাধা। বার বার বোকামি করে বিপদে পড়েছে, আমি বাঁচিয়েছি। শেষে এমন বিপদেই পড়লো আমিও কিছু করতে পারলাম না। আমার কথামতো চলেনি, বিপদে তো পড়বেই। এসব লোককে নিয়ে চলা যায় না। চুক্তি বাতিল করে নাইরোবিতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি ওদের।'

'আর আপনি একা বেরিয়ে পড়লেন? গাড়ি নেই, বন্দুক-বাহক নেই, খাবার নেই!'

'ওসব নিয়ে ভাবি না। এই এলাকা আমার চেনা, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও চলে যেতে পারি একখান থেকে আরেকখানে। আর যতোক্ষণ এটা থাকবে হাতে,' রাইফেলটায় চাপড় দিলো হুডিনি, 'না খেয়েও মরবো না। অনেক শিকার আছে এখানে। আর নিশানাও আমার খারাপ না।'

হাসলেন আমান। 'নাস্তা-টাস্তা তাহলে খেয়েই এসেছেন।'

আমানের কাঁধের পাশ দিয়ে তাকালো হুডিনি। আগুন জ্বলছে। গরম গরম খাবার তৈরি করে প্লেটে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। দেখেই জিবে আরেকবার পানি এসে গেল তার। 'বললে অবশ্য আপনাদের সাথে বসতে পারি। তবে খাবো না কিছু। পেট ভরা।' পেটে চাপড় দিলো সে। 'গরম গরম মোষের কাবাবের মতো খাবার খুব কমই আছে।'

'ও, সকালেই তাহলে মোষ মেরেছেন। একজন লোকের পক্ষে সামলানো বেশ কঠিন।'

এই প্রশংসায় ফুলে ঢোল হয়ে গেল জেনারেল। 'আমার মতো এতো বছর ধরে একাজে থাকলে আপনিও পারবেন, কঠিন লাগবে না আর তখন।' খাবারের দিকে এক পা এগোলো সে। 'সহজে ভয় পাই না আর এখন। বরং বলা যায়, ভয় পাওয়া

কাকে বলে ভুলেই গিয়েছি।' আরেক পা আগে বাড়লো সে।

লোকটার এই বড় বড় বোলচাল একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না মুসার। ভয় পায় না বলাতে একটা দুষ্টবুদ্ধি উঁকি দিয়ে গেল তার মাথায়। চিতাবাঘের বাচ্চাটাকে তুলে দিলো একটা ডালে, এমন জায়গায়, আরেকটু এগোলেই ওটার নিচে চলে যাবে জেনারেল। একটা শুকনো ডাল তুলে নিলো। তারপর অপেক্ষা করতে লাগলো কখন বাচ্চাটার নিচে চলে যাবে হুঁড়িনি।

কথা বলতে বলতে ঠিক ওটার নিচে গিয়ে দাঁড়ালো জেনারেল। পেছন করে-আছে মুসার দিকে। আমান রয়েছেন এখন লোকটার পাশে, এমন ভাবে, ফিরে না তাকালে তিনিও মুসাকে দেখতে পাবেন না।

এটাই সুযোগ। ডালের চোখা মাথা দিয়ে বাচ্চাটার পেছনে জোরে এক খোঁচা মারলো মুসা। ব্যথা পেলো বাচ্চাটা যতোটা, এই বেয়াড়া আচরণে ভড়কে গেল তার চেয়ে বেশি। রাগও যে হলো না কিছুটা তা নয়। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে গাছের ওপর থেকে ঝাঁপ দিলো সে। পড়লো গিয়ে একেবারে জেনারেলের মাথায়। ঘাড়-গলা আঁকড়ে ধরলো।

ভয়ানক কোনো জানোয়ারে আক্রমণ করেছে ভেবে হাত থেকে বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এমন লাফালাফি আর চিৎকার শুরু করলো জেনারেল, যেন তার অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত।

তাড়াতাড়ি লোকটার মাথা থেকে বাচ্চাটাকে সরিয়ে নিলেন আমান। শান্ত হতে বললেন জেনারেলকে।

কিসে তাকে আক্রমণ করেছিলো, দেখে লাল হয়ে গেল জেনারেলের গাল। এমন ভঙ্গি করলেন আমান, যেন তিনি খেয়ালই করছেন না ব্যাপারটা।

'আসুন। এক কাপ কফি অন্তত খেয়ে নিন,' বললেন তিনি।

টেবিলে বসার পর খাওয়ার কথা একবারও বলতে হলো না জেনারেলকে। নিজে নিজেই প্লেট নিয়ে শুরু করে দিলো। ছ'টা ডিম, বড় বড় আট টুকরো হরিণের মাংস, দশ টুকরো মাখন আর মধু মাখানো রুটি আর পাঁচ কাপ কফি খেয়ে কিছুটা শান্ত হলো সে। আমান দেখলেন, তাঁর মেহমান সত্যিই খুব ক্ষুধার্ত। একটা হরিণের রান কাবাব করে আনার নির্দেশ দিলেন বাবুর্চিকে। প্রায় সবটাই সাবাড় করে দিলো জেনারেল। তারপর আরও কয়েক কাপ কফি গেলার পর হুঁশ হলো তার, বেশি খেয়ে ফেলেছে। বড় করে ঢেকুর তুলে কাজের কথায় এলো, 'আসল কথাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। খাওয়ার জন্যে এমন চাপাচাপি শুরু করলেন···আপনাদের হোয়াইট হান্টার কে?'

'কেউ নেই।'

'কি বললেন!' আঁতকে উঠলো যেন জেনারেল। 'শ্বেতাঙ্গ শিকারী নেই? খুব খারাপ কথা, খুব খারাপ। বিপদে পড়বেন। কোত্থেকে এসেছেন?'

'আমেরিকা। লস অ্যাঞ্জেলেস।'

যাক, আরেকটা গর্দভ আমেরিকানকে পাওয়া গেল—ভাবলো হুডিনি। একটা হপ্তাও যদি এর সাথে থাকা যায়, মোটামুটি কিছু খসিয়ে নেয়া যাবে। আর আরও বেশি যদি থাকা যায়...থাক, বেশি আশা করা ভালো না...

'হুঁ, শহরের লোক,' যেন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেছে এমন ভঙ্গি করে মাথা দোলালো হুডিনি, 'বিপদের কথা। বুনো অঞ্চল চেনে না, জন্তুজানোয়ারের স্বভাব-চরিত্র কিছু জানে না। হাঁটতে গেলেই বিপদে পড়বে।'

'হ্যাঁ, তা পড়বে,' স্বীকার করলেন আমান।

'শিকারের ব্যাপারে তাহলে কিছু জানেন না আপনি?'

হাসলেন আমান। 'একেবারেই জানি না বললে ভুল হবে। কিছু কিছু জানি।'

'ওসব জানায় কাজ হবে না এখানে। আপনার ভাগ্য ভালো, আমি যাচ্ছিলাম এপথে। যাক, আর ভয় নেই, আমি সব দেখবো এখন থেকে। না না, পয়সার কথা ভাববেন না, খুব একটা বেশি দিতে হবে না, যদিও আমার ফী অনেক। আপনি ভালো লোক, দেখেই বুঝেছি। ফী-টী কিছু চাইবো না আপনার কাছে। হাজারখানেক ডলার দিলেই চলবে, এক হপ্তায়, এই পকেট মানি আরকি। তবে সাত দিনের বেশি থাকতে পারবো না বলে দিলাম, আগামী হপ্তায় জরুরী কাজ আছে আমার।'

'সাহায্য করতে যে চেয়েছেন, তাতেই আমি খুশি। লাগবে না, সাহায্য লাগবে না আমার, থ্যাংক ইউ। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চাই না। অযথা আপনার নাইরোবি যাওয়া আটকাবো না।'

আতঙ্কিত হয়ে পড়লো হুডিনি। হিংস্র জানোয়ারে বোঝাই ওই বনে আরেকবার একা ঢুকতে চায় না সে কোনো কিছুর বিনিময়েই। আর নেহায়েত কপালগুণে বাঘ-সিংহের পেটে যদি না-ও যায়, না খেয়ে শুকিয়ে যে মরবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তখন যাবে শেয়াল-শকুন আর হায়েনার পেটে। কথাটা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিলো তার। নাইরোবি যাবে সে! একা! সামান্যতম ধারণাও নেই কোনদিকে রয়েছে নাইরোবি। বাঁচতে চাইলে যে করেই হোক তাকে থেকে যেতে হবে এই সাফারি দলে।

লোকটার চোখের উদ্বেগ নজর এড়ালো না আমানের। নরম হয়ে গেলেন তিনি। হুডিনি যে একটা মিথ্যুক, ধাপ্পা-বাজ, বুঝে ফেলেছেন অনেক আগেই, তবু ভয়ংকর জঙ্গলের মধ্যে আবার তাকে ঠেলে দেয়া, অর্থাৎ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার মতো মানসিকতা হলো না তাঁর।

'শ্বেতাঙ্গ শিকারী তো দরকার নেই আমাদের,' মোলায়েম গলায় বললেন তিনি। 'তবে আমাদের মেহমান হয়ে থাকতে চাইলে থাকতে পারেন। আপনাকে পেয়ে খুশিই হবো আমরা।'

হুডিনির মনে হলো পাহাড় নেমে গেল তার কাঁধ থেকে। তবে সতর্ক রইলো, তার এই স্বস্তি যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে। ঠোঁট কামড়ে ধরে ভান করতে লাগলো যেন ব্যাপারটা ভেবে দেখছে ভালোমতো। বললো, 'আমি খুব ব্যস্ত মানুষ। তবু, বিপদে পড়া একজন মানুষকে ফেলে যাওয়া আমার ধর্ম নয়। ঠিক আছে,' হাত নাড়লো সে, 'কি আর করা। থেকেই যাই। ফিসটিস কিছু লাগবে না। জীবনে অনেক টাকাই তো কামিয়েছি, একজনের কাছ থেকে নাইবা নিলাম। পাবেন আমার সাহায্য।'

'সব চেয়ে বড় সাহায্য হবে,' মনে মনে বললেন আমান, 'দয়া করে যদি নিজের মতো থাকো, আর আমাদের কাজে নাক গলাতে না আসো।' শুনিয়ে বললেন, 'আপনার জন্যে একটা তাঁবুর ব্যবস্থা করতে বলি। থাকুন, অসুবিধে হবে না।'

কাছেই বসে সমস্ত কথাবার্তা শুনলো তিন গোয়েন্দা। রবিন আর কিশোর কিছু বললো না বটে, তবে মুসা চুপ রইলো না। ফিসফিস করে বললো, 'চুপচাপ থাকলেই ভালো করবে। নইলে জেনারেলগিরি তোমার আমি ঘুচিয়ে ছাড়বো।' কথাটা অবশ্যই হুডিনি কিংবা মিস্টার আমানের কানে গেল না।

পাঁচ

এতো বেশি খেয়ে ফেলেছে হুডিনি, শোয়া বসা কিছুই ভালো লাগলো না। পেট ভারি হয়ে আছে। খুব অস্বস্তিকর। শেষে ভাবলো, একটু হেঁটে আসা যাক নদীর ধার থেকে। নড়াচড়ায় পেটও খালি হবে, অস্বস্তিও কমবে।

কিন্তু সেখানে গিয়েও শান্তি পেলো না। ফিরে এলো জলহস্তীর তাড়া খেয়ে। হাতিঘাসের ধারালো ডগায় লেগে আঁচড়ে গেছে হাতমুখ। জ্যাকেটের পিঠে বিরাট একটা ছিদ্র—কামড়ে ধরেছিলো জলহস্তী, অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছে সে।

চেঁচামেচি শুনে দেখতে বেরোলেন আমান। তিন গোয়েন্দাও পিছু নিয়েছে তাঁর। পথে দেখা হয়ে গেল হুডিনির সঙ্গে। ঘাসের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে সে।

'কি ব্যাপার?' আমান জিজ্ঞেস করলেন। 'গুলির শব্দ শুনলাম?'

'হ্যাঁ,' সামলে নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে জেনারেল। বড় বড় নিঃশ্বাস পড়ছে। সত্যি বলার প্রশ্নই ওঠে না, শুরু করে দিলো মিথ্যে কথা।

'রক্ত লাগলো কোথেকে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা, 'জলহস্তীর বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'তুমি এসবের কি বুঝবে? জলহস্তী মানেই জলহস্তী। সে কি আর সাধারণ জানোয়ার। লড়াই করে যে বেঁচে ফিরে এসেছি এইই যথেষ্ট। সামান্য রক্ত তো

বেরোবেই। আমারই রক্ত।'

'আর এই আঁচড়গুলো?'

'জলহস্তীর দাঁতের। ওটার মুখের মধ্যেই ঢুকে গিয়েছিলাম বলা যায়।'

'আশ্চর্য।' না বলে পারলো না রবিন। আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো। 'দাঁতের আঁচড় এরকম? হাতিঘাসের খোঁচা লাগলে অবশ্য ওরকম হতে দেখেছি।'

'তুমি কি বুঝবে, বোকা ছেলে!' রেগে উঠলো জেনারেল। 'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ওটার সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি লড়াই করে এসেছি আমি। তিন টনি একটা জানোয়ারের সঙ্গে, কল্পনা করতে পারো? হাত থেকে রাইফেলটা পড়ে গিয়েছিলো। অনেক কষ্টে সেটা তুলে জানোয়ারটার মুখের ভেতর নল ঢুকিয়ে গুলি করলাম।'

'তাই?' কিশোর বললো। 'তাহলে তো নিশ্চয় মরে গেছে। লাশটা কোথায়?'

'অ্যাঁ?' গাল চুলকালো হুডিনি। 'ও, মরার আগে পানিতে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। স্রোত তো বেশি। এতোক্ষণে ভেসে নিশ্চয় অনেক দূরে চলে গেছে।'

মুসা আর হাসি ঠেকাতে পারলো না। 'তবু, গিয়ে দেখা দরকার। যতো দূরেই যাক, নদীর ধার দিয়ে দৌড়ে গেলে বের করে ফেলা যাবে। মরা তো ডোবে না, ভেসে থাকে।' পা বাড়ানোর ভান করলো সে।

তার সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো হুডিনি। যেতে দেবে না। 'বললামই তো, এখন আর গিয়ে কোনো লাভ নেই। জ্যান্ত জানোয়ার চাও তোমরা। মরা লাশ দিয়ে কি করবে?'

নদীর দিক থেকে ভেসে এলো জলহস্তীর ভারি ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ, অনেকটা শুয়োরের মতোই, তবে অনেকগুণ বেশি জোরালো।

'লাশের শব্দ বলে তো মনে হচ্ছে না,' আমান বললেন। 'দেখি তো।' জোর করেই হস্তী-শিকারীকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে পা বাড়ালেন তিনি। সাথে চললো তিন গোয়েন্দা। কি আর করবে? উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করতে করতে হুডিনিও অনুসরণ করলো ওদেরকে।

নদীর তীরে এসেই চোখে পড়লো জলহস্তীটাকে। অর্ধেক পানিতে অর্ধেক ডাঙায় পড়ে ঘুমিয়ে আছে। এই 'বোকা টুরিস্টগুলোকেও' বোকা বানানো যাবে না বুঝেও নিজের কথা প্রতিষ্ঠিত করার শেষ চেষ্টা করলো হুডিনি, 'না না, এটা না। আমারটা ভেসে চলে গেছে।'

'ট্রাক নিয়ে আসি,' আমান বললেন। 'জেনারেল, বসে বসে পাহারা দিন এটাকে। সাবধান, আর গোলাগুলির চেষ্টা করবেন না। জলহস্তী আবার খেপলে কিন্তু সত্যি সত্যি মারা পড়বেন।'

*

সব চেয়ে বড় ট্রাকটা নিয়ে আসা হলো। লোহার মোটা মোটা শিকের তৈরি আঠারো ফুট লম্বা একটা খাঁচা রয়েছে ওটাতে।

বেশি পানিতে নেমে গেছে এখন জলহস্তীটা। অল্পবয়েসী একটা মদ্দা হাতি, খুব সুন্দর। নিখুঁত মাথাটা শুধু ভেসে রয়েছে পানির ওপর।

'আসলেই সুন্দর,' আমান বললেন।

'কিন্তু ভাবসাব তো সুবিধের লাগছে না,' কিশোর বললো। 'রেগে আছে মনে হয়।'

'তোমাকে সই করে কেউ গুলি করলে তুমিও রেগে থাকতে।'

রাগে আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো হাতিটা। তারপর মস্ত লাল মুখটা হাঁ করে বিকট এক হাঁক ছাড়লো, পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে এলো সেই আওয়াজ, যেন বাজ পড়লো। চমকে উঠে পিছিয়ে গেল জেনারেল, চলে গেল সবার পেছনে।

ট্রাকটাকে ঘুরিয়ে পেছনটা নিয়ে আসা হলো একেবারে পানির কিনারে। কারণ, ধরে খাঁচায় টেনে তোলা হবে জানোয়ারটাকে, এভাবে রাখলেই সুবিধে। দুই ইঞ্চি মোটা একটা নাইলনের দড়ির একমাথা শক্ত করে বাঁধা হলো প্রচণ্ড শক্তিশালী ফোর-হুইল-ড্রাইভ একটা ট্রাকের পেছনে বসানো হুকে। আরেকটা মাথা বড় ট্রাকে রাখা খাঁচার সামনে দিয়ে ঢুকিয়ে, ভেতর দিয়ে টেনে বের করে আনা হলো পেছন দিক দিয়ে। জলহস্তীর মাথায় ঢোকার মতো বড় একটা ফাঁস বানিয়ে তৈরি করে রাখা হলো সময়মতো কাজে লাগানোর জন্যে।

'পানিতে ওটার মাথায় ফাঁস পরাবেন কি করে?' জানতে চাইলো রবিন।

'ও-ই সাহায্য করবে,' বললেন আমান। 'খামবু, ওখান থেকে একটা ক্যানু নিয়ে এসো।' খানিক দূরে তীরে বাঁধা কয়েকটা শালতিজাতীয় নৌকা দেখালেন তিনি, গ্রামবাসীদের নৌকা ওগুলো। 'ফাঁসটা ধরে ওটাতে করে চলে যাবো।'

নৌকাটা আনা হলো। তাতে চড়লেন আমান, তিন গোয়েন্দা আর খামবু। জলহস্তী ধরতে ক্যাম্প থেকে আরও যারা এসেছে, তাদের সঙ্গে তীরে রইলো জেনারেল। তাকে আসতে অনুরোধ জানিয়েছিলো অবশ্য মুসা, কিন্তু আমন্ত্রণে সাড়া দেয়নি হুডিনি।

'আমি এখানেই থাকি,' বলেছে জেনারেল। 'জানো-য়ারটাকে ট্রাকে তোলাটাই বেশি কঠিন। তখন সাহায্য করতে হবে। এই কালোদের ওপর তো বিশ্বাস নেই। দরকারের সময়ই পাওয়া যায় না ওদের। একটা না একটা গোলমাল করে বসবেই।'

অতিরিক্ত ভারি নৌকাটা। আস্ত একটা লোহাকাঠ কুঁদে তৈরি করা হয়েছে। পানির মাত্র দুই ইঞ্চি ওপরে রয়েছে কিনারা। আরোহীদের খুব সতর্ক থাকতে হয়।

একটু এদিক ওদিক হলেই নৌকা উল্টে যাওয়ার ভয় আছে।

হাতের দাঁড় দিয়ে নৌকার গায়ে টোকা দিলো মুসা। 'ভারি হওয়ায় একটা জিনিস অবশ্য ভালো হয়েছে। কামড়ে কিছু করতে পারবে না জলহস্তী।'

'বেশি আশা করা উচিত না,' আমান বললেন। 'জলহস্তীর চোয়ালের ভীষণ জোর। মারচিসনে একবার দেখেছিলাম, রেগে গিয়ে একটা গাড়ির পেছন দিকটা বাদামের খোসার মতো চিবিয়ে ভর্তা করে দিয়েছিলো একটা জলহস্তী।'

'আরে, গেল কই!' বলে উঠলো কিশোর। ডুবে গেছে বিরাট মাথাটা। সামান্যতম আলোড়ন নেই ওখানকার পানিতে। শুধু রিঙ তৈরি করে ছড়িয়ে পড়েছে ছোট হালকা ঢেউ, একটু আগে যে ওখানে ছিলো জীবটা তার প্রমাণ।

'ওই পাড়ের দিকে যাচ্ছে,' আমান বললেন।

'কি করে বুঝলে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'ওই যে, বুদবুদ দেখছো না পানিতে? ওটা ধরে যেতে হবে আমাদের। সাবধান, দাঁড়ের আওয়াজ যতোটা কম করে পারো।'

মিনিট কয়েক পরে ভুস করে আবার ভেসে উঠলো মাথাটা। হুউস হুউস করে নাক দিয়ে পানি ছিটাতে লাগলো ফোয়ারার মতো করে। কাছেই নৌকাটাকে দেখে খুশি হলো না মোটেও। ডুব দিলো আবার। এইবার আর ওর গতিপথ নির্দেশ করলো না বুদবুদ।

ছয়

হঠাৎ শূন্যে উঠে গেল নৌকাটা। টালমাটাল অবস্থায় কাত হয়ে রইলো দীর্ঘ একটা মুহূর্ত, তারপর ঝপাৎ করে পড়লো পানিতে, সবাইকে ভিজিয়ে দিয়ে। ভাগ্য ভালো, উল্টে গেল না।

'জলহস্তীদের বিখ্যাত কায়দা,' আমান বললেন। 'আবার চেষ্টা করবে।'

'ওটার মাথাটাই তো দেখলাম না,' মুসা বললো। 'ভাসলো কখন?' ফাঁসটা ধরে রেখেছে সে, মাথাটা আরেকবার ভাসলেই দেবে পরিয়ে।

পাঁচ মিনিট গেল...দশ...পনেরো...জলহস্তীদের দেখা নেই।

'এতোক্ষণ তো ডুব দিয়ে থাকার কথা না,' আমান বললেন। 'যে রকম খেপেছে, এতো সহজে চলে যাবে ভাবিনি।'

'ওটা কি?' বড় বড় কতগুলো পদ্মপাতা দেখালো রবিন। ঠেলে ফুলে রয়েছে একটা পাতা। মনে হয় কিছু লুকিয়ে রয়েছে ওটার নিচে। চুপ করে সবাই তাকিয়ে রয়েছে ওটার দিকে, আস্তে করে কমে গেল ফোলাটা। তারপর যেন পিছলে বেরিয়ে এলো নাকের বিশাল দুটো ফুটো। আরামসে ওটার নিচে লুকিয়ে থেকে দম নিচ্ছিলো জলহস্তীটা, আক্রমণের অপেক্ষায় রয়েছে।

ভুস ভুস করে মাথা তুললো আরও দুটো জলহস্তী। গোল বড় বড় চোখ মেলে দেখতে লাগলো নৌকার আরোহীদেরকে। একটা জলহস্তীর পিঠে ছোটো একটা বাচ্চা।

'দল বেঁধে এসেছে হামলা চালাতে,' শঙ্কিত হলেন আমান।

'জলহস্তীদের তো শুনেছি মেজাজ-মরজি খুব শান্ত,' কিশোর বললো।

'খোঁচা না দিলে তো শান্তই থাকে। গুলি করেই গোলমালটা বাধিয়েছে জেনারেল। নাহ্, এভাবে খেপা একটা জানোয়ারের পিছু নেয়াটা উচিত হয়নি।'

নৌকার আর সবার না হলেও ব্যাপারটা একজনের মনে হয় খুব পছন্দ হয়েছে। খামবুর। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখ। ঠোঁটের কোণে শয়তানী হাসি। আরও খুশি হলো সে, যখন দেখলো, তীরে অলস ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা দুটো কুমির নেমে এসে নৌকাটাকে ঘিরে চক্কর দিতে আরম্ভ করলো।

'ইস্, একথাটাও মনে ছিলো না!' চুল না ছিঁড়লেও আক্ষেপে মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন আমান। 'জলহস্তী আর কুমির অনেক সময় একজোট হয়ে হামলা চালায়। জলহস্তীরা নৌকা উল্টে মানুষকে ফেলে দেয়, আর কুমিরেরা তখন বাকি কাজটা সারে। ওই দেখ, পাতার নিচে জানোয়ারটা নেই।'

ডুব দিয়েছে মদ্দা জলহস্তী। পানিতে বুদবুদের রেখা সোজা এগিয়ে আসছে নৌকার দিকে।

'জলদি!' চেঁচিয়ে উঠলেন আমান। 'জলদি বাও! এই এখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে!'

ঝপাৎ ঝপাৎ করে তিনটে দাঁড় পড়লো পানিতে। গায়ের জোরে দাঁড় বাইতে লাগলেন আমান, কিশোর আর মুসাও হাত চালালো প্রাণপণে। রবিনের হাতে দেয়া হয়েছে এখন ফাঁসটা। চতুর্থ দাঁড়টাও পড়লো পানিতে, খামবুর হাতেরটা, তবে সে সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামনে এগোনোর জন্যে না বেয়ে উল্টোদিকে বাইতে লাগলো, যাতে নৌকা পিছিয়ে যায়। নৌকাটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে বুদবুদের সারির দিকে, জলহস্তীর যাত্রাপথে।

ব্যাপারটা সবার আগে লক্ষ্য করলো কিশোর। চিৎকার করে উঠলো, 'খামবু!' কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততোক্ষণে। এসে পড়েছে জলহস্তী। প্রচণ্ড জোরে নিজের শরীরটাকে ছুঁড়ে দিলো ওপরের দিকে। অর্ধেকেরও বেশি উঠে গেল পানির ওপরে। নামার সময় সোজা বাড়িয়ে দিলো সামনের পা দুটো। সুযোগটা হাতছাড়া করলো না রবিন। ফাঁসটা ছুঁড়ে দিলো জলহস্তীর মাথা সই করে। পরক্ষণেই নৌকার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো জানোয়ারটা। ভীষণ ঝাঁকুনিতে পানিতে ছিটকে পড়লো আরোহীরা।

নৌকাটা উল্টে গেছে। মরিয়া হয়ে ওটাকে সোজা করার চেষ্টা চালাচ্ছে পাঁচজনে, না না, চারজনে। খামবুর সে-রকম কোনো চেষ্টা নেই। দ্রুত সাঁতরে

চলেছে সে তীরের দিকে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক লাগলো কিশোরের কাছে। আগেও আফ্রিকায় এসেছে ওরা, জন্তুজানোয়ার ধরেছে। আফ্রিকানদের এতোটা কাপুরুষ হতে দেখেনি। সঙ্গীদেরকে বিপদের মুখে ফেলে খামবুর মতো এভাবে পালাতে চায়নি কেউ।

সেসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তার সময় নেই এখন। বাচ্চাটাকে গিয়ে তীরে নামিয়ে দিয়ে এসেছে মা জলহস্তী। দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে এসে আক্রমণে সামিল হলো অন্য দুই পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে যোগ দিয়ে। নৌকাকে ঘিরে আর সাঁতরাচ্ছে না এখন কুমির দুটো। লেজের প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে জলহস্তীদের সরিয়ে দিয়ে শিকারের কাছে পৌঁছার চেষ্টা চালাচ্ছে।

নৌকাটা যেমন উল্টে দিয়েছে, সোজাও করে দিলো আবার মদ্দাটাই। তবে ওটাতে আর চড়ার অবকাশ হলো না কারো। বিশাল হাঁ করে কামড়ে ধরলো নৌকার একটা ধার। উঁচু করে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে শুরু করলো, বেড়াল যেমন করে ইঁদুরকে ঝাঁকিয়ে মারে। তারপর এক কামড়ে ডিমের খোসার মতো গুঁড়িয়ে দিলো। লোহাকাঠের এতো শক্ত একটা নৌকা, যার মধ্যে পেরেক ঢুকতে চায় না, সেটাকে ভেঙে ফেলতে লাগলো অবলীলায়।

আর কোনো উপায় না দেখে তীরের দিকে সাঁতরাতে শুরু করলো মুসা। তার সঙ্গী হলো কিশোর আর রবিন। জোরে জোরে চাপড় মারছে পানিতে, শব্দ করে কুমিরকে ভড়কে দেয়ার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ কি মনে করে পেছনে ফিরে তাকালো মুসা। 'আরি, বাবা কই!'

দেখা গেল তাঁকে। মুখ নিচু করে পানিতে ভাসছেন। আবার ফিরে এলো তিনজনে। দু'দিক থেকে তাঁর বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিলো মুসা আর কিশোর। রবিন পেছন থেকে সাহায্য করলো। ঠেলে নিয়ে চললো তাঁকে তীরের দিকে। কামড়ে নৌকাটাকে ভাঙার সময় কাঠের টুকরো পানিতে পড়েছে। ওরকম একটা টুকরো তুলে নিলো রবিন। বাড়ি মেরে কুমিরগুলোকে ঠেকানোর চেষ্টা করবে।

জলহস্তীগুলো আর আক্রমণ করতে এলো না। নৌকাটাকে ভেঙে দিয়েই ওদের কাজ খতম হয়েছে ভেবে খুশি। কুমিরগুলোও বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না। আসলে ওগুলো আকারে ছোট, ভীতু, বড় হলে অন্য ঘটনা ঘটতো। বড়গুলোকে ভয় দেখিয়ে ঠেকানো খুব কঠিন।

যাই হোক, নিরাপদেই তীরের কাছে পৌঁছুলো ওরা। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো ডিগা আর কাকামি। আমানকে টেনে তুলতে সাহায্য করলো।

পাড়ের বালিতে চিত করে শুইয়ে দেয়া হলো তাঁকে। খানিকক্ষণ সেবাযত্ন করতেই চোখ মেললেন তিনি। দেখলেন, বুকে হাত বুলিয়ে কিশোর দেখছে পাঁজরের হাড়টাড় ভেঙেছে কিনা।

'কি হয়েছিলো, বাবা?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'বোধহয় গলুইয়ের বাড়ি লেগেছিলো। তারপর আর বলতে পারবো না।'

'এখন কেমন লাগছে?'

নড়ার চেষ্টা করলেন আমান। ব্যথায় বিকৃত করে ফেললেন মুখ। 'পিঠে কিছু হয়েছে।'

'চলো, ক্যাম্পে নিয়ে যাই।'

'দাঁড়াও। আগে খাঁচায় ভরো ওটাকে। ডিগা, ট্রাকটাকে টান দাও গিয়ে।'

ছুটে গেল ডিগা। লাফিয়ে উঠলো ট্রাকের কেবিনে। এঞ্জিন স্টার্ট দিলো। গিয়ার দিয়ে আস্তে করে গাড়ি টান দিলো সামনের দিকে। জলহস্তীর গলায় আটকে রয়েছে ফাঁস, টান টান হতে লাগলো দড়ি।

বেশ জোরালো একটা দড়ি টানাটানির খেলা হবে, ভাবলো কিশোর। তিন টন ওজনের জলহস্তী টানবে বিপরীত দিকে, ওদিকে গাড়ির এঞ্জিনের ক্ষমতাও প্রচণ্ড।

'আস্তে,' ডিগাকে হুঁশিয়ার করলেন আমান। 'শ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলো না। আস্তে টানবে, আবার ঢিল দেবে, টেনে টেনে নিয়ে এসো কাছে।'

কিসে কি হচ্ছে, কি করতে হবে বুঝতে পারছে না জলহস্তী। ওর শত্রুরা নেই পানিতে, চলে গেছে। তার গলায় পেঁচিয়ে রয়েছে কি যেন, অনেকটা শাপলার ডগার মতো। আস্তে আস্তে টেনে নেয়া হচ্ছে তাকে। মাঝে মাঝে নড়ে ওঠে সে, উল্টো দিকে টান দেয়, তখন ঢিল হয়ে যায় অন্য পাশের টান, আসলে ঢিল দিয়ে দেয় ডিগা, সেটা বুঝতে পারে না জলহস্তী। আবার সে নড়াচড়া বন্ধ করে দিলেই টান লাগে। এক সময় দেখলো তীরে পৌঁছে গেছে।

ট্রাক আর খাঁচাটা চোখে পড়লো। এই দৃশ্য যে কোনো জানোয়ারকে ঘাবড়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। মাথা ছোঁড়াছুঁড়ি করে চেঁচাতে লাগলো সে।

'বন্দুকটা বের করে দাও,' আমান বললেন।

কি বলছেন তিনি, বুঝতে পারলো কিশোর। ট্রাকের ড্রাইভিং সীটের নিচের বাক্স থেকে অস্ত্রটা বের করলো সে। দেখতে বড় পিস্তলের মতো, তবে বুলেট ছোঁড়ে না ওটা। ভেতরে ভরা থাকে কিউরেয়ারের ক্যাপসুল। শরীরে বেশি ঢুকে গেলে মারাত্মক হয়ে ওঠে এই ওষুধ। কিন্তু মাপমতো দিতে পারলে সহজেই জলহস্তীর মতো বিশাল জানোয়ারকেও তন্দ্রালু করে তোলা যায়, তখন তাকে সামলানো সহজ হয়।

সাবধানে জানোয়ারটার কাছে এগিয়ে গেল কিশোর। পিস্তলটা ওটার উরু বরাবর ধরে টিপে দিলো ট্রিগার। চমকে গেল হলহস্তী, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হ্যাঁচকা টান মারলো দড়িতে, তারপর জলহস্তীর নাচন শুরু করে দিলো তীরের বালিতে। কেউ বাধা দিলো না তাকে। ওষুধের ক্রিয়া শুরু হওয়ার অপেক্ষা করছে ধৈর্য ধরে। মিনিট দশেক নাচাকুদার পর ভারি হয়ে এলো জলহস্তীর শরীর। চোয়াল আর

চেপে রাখতে পারছে না, ঝুলে পড়ছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে গোঙাতে শুরু করলো অবশেষে।

'ডিগা, টান দাও,' নির্দেশ দিলেন আমান।

আগে বাড়লো ট্রাক। টান টান হয়ে গেল দড়ি। ঘুমের ঘোরেই যেন বাধা দিলো জলহস্তী, গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু বেশিক্ষণ পারলো না। একপা দু'পা করে এগোতে লাগলো খাঁচার দিকে। শক্ত লোহার সিঁড়ি নামিয়ে রাখা হয়েছে খাঁচার পেছন থেকে। সিঁড়িতে উঠতে চাইলো না জানোয়ারটা। তবে দু'একবার প্রতিবাদ করেই হাল ছেড়ে দিলো। সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঢুকে পড়লো খাঁচায়।

লাগিয়ে দেয়া হলো খাঁচার দরজা।

ওঠার চেষ্টা করলেন আমান। জোরে এক গোঙানি দিয়ে শুয়ে পড়লেন আবার। রবিন, কিশোর, মুসা আর কাকামি প্রায় বয়ে নিয়ে গিয়ে ট্রাকে তুললো তাঁকে। খুব সাবধানে, ঝাঁকুনি বাঁচিয়ে চলতে শুরু করলো দুটো ট্রাকই, যাতে আমানও ব্যথা না পান, জলহস্তীটাও চমকে গিয়ে আবার গোলমাল শুরু না করে।

তাঁবুতে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হলো আমানকে। তাঁকে ঘিরে বসলো মুসা, কিশোর আর রবিন।

'পিঠের বাঁ দিকে কোনো সাড়া পাচ্ছি না,' আমান জানালেন।

'ডাক্তার ডাকা দরকার,' মুসা বললো।

হাসলেন আমান। 'শহর পেয়েছো নাকি, যে চাইলেই পেয়ে যাবে? ডাক্তার লাগবে না আমার। আর ওরা এলে কি বলতো, জানি। বিশ্রাম নিতে বলতো, একআধটু মেসেজ করতে বলতো পিঠে। সেটা তাদের পরামর্শ ছাড়াই করিয়ে নিতে পারবো ডিগাকে দিয়ে। ইস্, আমার কপালই খারাপ। যতোবারই জানোয়ার ধরতে বেরোই, একটা না একটা অঘটন ঘটবেই। ঠিক অচল হয়ে যাবো। এবারেও গেলাম, অন্তত সাতদিন তো নড়তেই পারবো না। কিশোর, যা করার এখন তোমাদেরকেই করতে হবে, আমাকে বাদ দিয়ে।'

'তা করা যাবে। যা যা ধরতে এসেছি সব নিয়েই বাড়ি ফিরবো, বাদ পড়বে না কোনোটাই।'

'সেটা তোমরা পারবে, জানি। সেসব নিয়ে ভাবছিও না। দুশ্চিন্তা অন্য কারণে।'

'কি কারণ?' প্রায় একই সঙ্গে জানতে চাইলো রবিন আর মুসা।

চোখ মুদলেন আমান। অপেক্ষা করছে ছেলেরা। অবশেষে চোখ খোলে তিনি বললেন, 'শুনলে হয়তো নার্ভাস হয়ে যাবে। তবে শোনাটাও তোমাদের উচিত। কাল যে চিতামানবের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমাদের, আমি জানি সে কে।'

'গাঁয়ের কেউ?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'না। আমাদের ক্যাম্পেরই লোক।'

অবাক হলো মুসা। 'আমাদের ক্যাম্পের?'

'হ্যাঁ। খামবুকে কেমন মনে হয়?'

'ভালোই তো। চমৎকার লোক। খুব ভালো ট্র্যাকার। তবে গোঁয়ার বেশি, কথাবার্তা সব সময় শুনতে চায় না। এই যেমন কাল রাতে তুমি ডাকলে, তার পরেও সঙ্গে গেল না।'

'কাল রাতে ও ক্যাম্পে ছিলো না। আজ ভোরে আমরা যখন বন থেকে ফিরে এলাম, দেখি ঝোপের ভেতর থেকে চুপি চুপি বেরোচ্ছে। ওর সাথে কথা বলেছি। বেশ নার্ভাস হয়ে ছিলো। কথার জবাব দিতে পারলো না ঠিকমতো। মনে হলো কোনো কিছুর ভয়ে ভীত হয়ে আছে সে। ওর অসুবিধেটা কি, জিজ্ঞেস করলাম, বললো না। এড়িয়ে গেল। আমার বিশ্বাস, ও লেপার্ড সোসাইটির লোক না হয়ে যায় না।'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'কেন হচ্ছে না?' আমানের হয়ে বললো কিশোর। 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছো, আমরা যখন জলহস্তীটার কাছ থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম, তখন খামবু কি করেছে?'

'করেছি,' মাথা ঝাঁকালো মুসা। 'অদ্ভুতই লেগেছে আমার কাছে। আমরা বাইছিলাম সামনের দিকে, আর ও মনে হলো বাইছিলো পেছনের দিকে। ও ওরকম না করলে হয়তো সময় মতো সরে যেতে পারতাম আমরা, নৌকাটা ভাঙতে পারতো না জলহস্তী।'

'ও ওরকম করেছে নৌকাটাকে জলহস্তীর মুখে ফেলার জন্যে,' আমান বললেন। 'সোজা কথায়, আমাদেরকে খুন করাতে চাইছিলো সে, জলহস্তী আর কুমিরকে দিয়ে।'

'কিন্তু তাতে তো নিজেকেও বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিলো?'

'কিভাবে বিপদ থেকে বেরিয়ে গেল দেখলে না? ও জানে, কি করে পালাতে হয়। আমরা নৌকা ঠিক করতে গেলাম, আর ও সোজা সাঁতরে চলে গেল। একটা মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'আর তীরে ওঠার পর খুব রেগে গিয়েছিলো মনে হয়েছে,' রবিন বললো। 'এমন ভাবে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলো, যেন পারলে খেয়ে ফেলে।'

'আমিও দেখেছি,' কিশোর বললো। 'আর একবার যখন খুনের চেষ্টা করেছে, আরও করবে। সফল না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাবে।'

'কিন্তু কেন? কি অপরাধটা করেছি আমরা তার কাছে?'

'শুধু তার কাছেই নয়, পুরো লেপার্ড সোসাইটির কাছেই অপরাধ করেছি আমরা।' সোসাইটি সম্পর্কে পত্রিকায় যা যা পড়েছে, বলে গেল কিশোর, 'মুসা,

আফ্রিকাকে কালো মহাদেশ বলা হতো একসময়, আজও তাই রয়েছে। তোমাদের দেশ এটা, কিন্তু তার পরেও নিশ্চয় স্বীকার করবে কথাটা। নিশ্চয় জানো, গত কয়েক দশকে আফ্রিকার অসংখ্য দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, শ্বেতাঙ্গ বিদেশীদের তাড়িয়েছে এখান থেকে। আমেরিকার মতোই গণতন্ত্র আর প্রেসিডেন্ট সিসটেম চালু করার চেষ্টা করছে। অনেকে সফলও হয়েছে। তবে ওই সাফল্য বেশির ভাগটাই শহরকেন্দ্রিক। শহরের বাইরে বুনো অঞ্চলে এখনও বুনো রয়ে গেছে আফ্রিকানরা, একেবারে আদিম, প্রাগৈতিহাসিক বললেও ভুল হবে না। আফ্রিকার দুর্গম বনাঞ্চলগুলোতে খুঁজলে এখনও মানুষখেকো মানুষের সন্ধান মিলবে। বিদেশী পেলেই ধরে ধরে খাবে ওরা, বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না। ওরা তো বটেই, এখানকার শিক্ষিত মানুষেরাও বিদেশী দেখতে পারে না। শ্বেতাঙ্গদের চেয়ে বেশি ঘৃণা করে তাদেরকে, এদেশের-যারা গিয়ে বিদেশীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তা করুক, সেটা আমরাও করি। রাজাকারদের কে দেখতে পারে?'

'রাজাকার কি?'

'ও, জানো না। আমাদের, মানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদেরই কিছু জাতভাই খান সেনাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের বিরোধিতা করেছিলো। ওদের নাম রাজাকার। স্বাধীনতার বিরুদ্ধ শক্তি—আমাদের ঘৃণার পাত্র।'

'তাহলে তো ঠিকই আছে। বেঈমানদেরকে কেন পছন্দ করবে আফ্রিকানরা?'

'না, তা করা উচিতও নয়। আমি সে-জন্যে তাদেরকে দোষও দিচ্ছি না। আমার বক্তব্য হলো, শিক্ষিত মানুষেরা কেন বোঝে না কিংবা বুঝতে চায় না, আমেরিকায় থাকলেই কোনো নিগ্রো তার স্বজাতির বিরুদ্ধে চলে গেল না। তোমরা কি গিয়েছো? আমেরিকানরা এসে যদি এখন আফ্রিকা দখল করতে চায় অন্যায় ভাবে, কার হয়ে কথা বলবে?'

'অবশ্যই আফ্রিকানদের।'

'অথচ এখানকার আফ্রিকানরা সেটা বোঝে না। যেহেতু তোমরা আমেরিকায় থাকছো, কাজেই তোমরা আমেরিকান। এদেশী রক্ত থাকুক না তোমাদের শরীরে, তোমরা এদের শত্রু। আর আমি আর রবিন তো সত্যিকার অর্থেই বিদেশী। আমাদের ওপর আক্রোশ তো থাকবেই, বিশেষ করে রবিনের ওপর, কারণ তার চামড়া শাদা। এখানকার গোপন সংস্থা মাউ মাউ-এর নাম শুনেছো হয়তো। শ্বেতাঙ্গ আর তাদের দোসরদের খুন করার জন্যে গড়ে উঠেছে ওই সংস্থা। উনিশশো বায়ান্ন সালে চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিলো ওরা, তারপর ঝিমিয়ে যায়। কয়েক বছর চুপ থেকে আবার মাথা চাড়া দেয় আটান্ন সালে। পূর্ব আফ্রিকাতেই এদের তৎপরতা বেশি। বিশ হাজারেরও বেশি লোককে খুন করেছে এই টেরোরিস্টরা। দলের অনেকেই অবশ্য খুনখারাপি পছন্দ করে না, কিন্তু ওদেরকে তা করতে বাধ্য করে সোসাইটি।'

'কি করে বাধ্য করে? ওরা না করলেই হলো।'

'না, হলো না। শক্তসমর্থ যুবকদের ধরে নিয়ে আসে ওরা। অত্যাচারের ভয় দেখায়। তাতেও রাজি না হলে বলে বৌ-বাচ্চা-আত্মীয়-পরিজনদের শেষ করে দেবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেয়ও। রাজি না হয়ে আর পারে না। তখন দেবতার নামে শপথ করানো হয় তাকে, যে শ্বেতাঙ্গ আর তাদের দোসরদের দেখলেই খুন করবে। শপথ শেষে খাওয়ানো হয় বিশেষ খাবার। তার মধ্যে থাকে মানুষের মগজ, রক্ত, ভেড়ার চোখ আর মাটি।'

ওয়াক থুহ্ করে থুথু ফেললো মুসা। 'লেপার্ড সোসাইটির লোকেরাও একই রকম নাকি?'

'হ্যাঁ। আর মাউ মাউদের চেয়েও পুরনো। ভালো ভালো লোককে ধরে এনে খারাপ বানিয়ে দেয়। মানুষ খুন করতে বাধ্য করে। চিতাদেবতার নামে শপথ করানোর পর তাদেরকে পরতে দেয় চিতাবাঘের ছাল। বিশ্বাস করায়, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারি বানিয়ে দেবে তাদেরকে চিতাদেবতা। এমন একটা সময় আসবে মানুষ খুন করতে করতে, যখন এই শক্তির অধিকারি হবে ভক্তরা, তারা তখন ইচ্ছে করলেই চিতাবাঘ হয়ে যেতে পারবে। আবার চাইলে চোখের পলকে মানুষ। সোসাইটির উচ্চপদস্থরা সবাই উইচ ডক্টর বা ওঝা। এই ওঝাদেরকে যমের মতো ভয় করে আফ্রিকানরা, জানোই তো। তাদের কথা অমান্য করার সাহস করে না কেউ।'

'তার মানে খামবুকেও বাধ্য করা হয়েছে? আমাদেরকে খুন করতে বলা হয়েছে?'

'মনে তো হচ্ছে সেরকমই।'

'তাহলে এক্ষুণি তাকে বের করে দেয়া উচিত। আমি যাচ্ছি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বাধা দিলেন আমান। 'মাথা গরম করো না। একটু আগেই তো বললে ও চমৎকার লোক, ভালো ট্র্যাকার। ওকে যেমন আমাদের দরকার, এ-সময় ওরও আমাদেরকে দরকার। কারো সাহায্য ছাড়া ভয়াবহ ওই ফাঁদ থেকে বেরোতে পারবে না ও। একটা খুনীকে সাথে রাখা খুবই বিপজ্জনক, এটা ঠিক, কিন্তু তাকে তাড়ালে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। বেরিয়ে গিয়ে আরও রেগে যাবে ও। আমাদের খুন না করে ছাড়বে না। তার চেয়ে ভেতরেই থাকুক, ওর ওপর চোখ রাখা সহজ হবে। মোটকথা, এখন থেকে খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদের।'

'আসলে তোমার ইচ্ছেটা কি? কিভাবে কি করতে চাও?'

'এখনও জানি না। একটা কিছু বেরিয়ে আসবেই। আপাতত কিছু বলবো না আমরা খামবুকে। ও ওর মতো থাকুক। আমরা যে সন্দেহ করছি এটা যেন সে বুঝতে না পারে।'

সাত

অনেকগুলো সমস্যা, হিসেব করছে কিশোর, একসঙ্গে এসে হাজির হয়েছে। সমস্যা সে পছন্দই করে, কিন্তু সেটা রকি বীচে হলে। এখন অতোটা পছন্দ করতে পারছে না। এক নম্বর সমস্যা, মিস্টার আমানের দুর্ঘটনা। দুই নম্বরঃ জানোয়ার সংগ্রহের দায়িত্বটা এখন পুরো এসে পড়েছে তাদের ওপর। তিন নম্বরঃ চিতা-মানব। আর চার নম্বরঃ জেনারেল হুডিনি।

আমানের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো জেনারেল, ছবি তোলার সময় পোজ দেয়ার জন্যে। যে লোকটা চিতাবাঘের ছাল ছাড়াতে বসেছে, তার সাথে গিয়ে তর্ক শুরু করলো। ঘাসের ওপর পড়ে আছে মরা জানোয়ারটা। জেনারেল গিয়ে ওটার ওপর পা তুলে দাঁড়িয়েছে, হাতে রাইফেল। শেষে আর কিছু না বলে সরে দাঁড়ালো লোকটা। ডিগাকে ক্যামেরা আনতে বললো জেনারেল।

এগিয়ে গেল কিশোর। তাকে দেখে বলে উঠলো হুডিনি, 'পাশা যে। ঠিক সময়ে এসেছো। নিশ্চয় ভালো ছবি তুলতে পারো তুমি, আমেরিকান ছেলেরা নাকি পারে। ডিগা ভালো পারবে না। ছবিটা তুমিই তুলে দাও।'

'কেন?' হুডিনির মতলবটা ঠিক বুঝতে পারছে না কিশোর।

'কেন আবার কি? শুধুই একটা ছবি, তেমন কোনো কারণ নেই। শ্বেতাঙ্গ শিকারী হয়েছি, আমার কিছু ছবি থাকা দরকার। মরা চিতাবাঘের গায়ে পা রেখে ছবি তুললে খুব ভালো হবে।'

'কিন্তু এটাকে তো আপনি মারেননি।'

'তাতে কি? লোকে তো আর বুঝবে না।'

'কিন্তু আপনি যে কাজটা করেননি সেটার জন্যে বাহবা চাইছেন কেন?'

'ও, হিংসে লাগছে? তাহলে তুমিও একটা তুলে নিও। হাজার হাজার চিতাবাঘ মেরেছি আমি, জানো? তখন সাথে ক্যামেরা ছিলো না, নইলে ছবি কি আর তোলা যেতো না। এখন ক্যামেরা আছে, মরা একটা বাঘও আছে, ছবিটা না হয় তুলেই নিলাম। তুমি আমারটা তোলো, আমি তোমারটা তুলে দেবো। তোমার ছবি যাকে খুশি গিয়ে দেখিয়ে বলো তুমিই মেরেছো।'

হেসে ফেললো কিশোর। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, জেনারেল, আমার ছবি লাগবে না। দাঁড়ান, ঠিক হয়ে দাঁড়ান।' ডিগার হাত থেকে ক্যামেরা নিয়ে চোখে লাগালো সে। ছবি তুলে ওটা আবার ডিগাকে ফিরিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করলো।

আনমনেই হাসছে কিশোর। জেনারেলের মতো এমন লোক আর দেখেনি। খাওয়া আর এরকম ছবি তোলাতুলি নিয়ে যতোক্ষণ থাকবে, ততোক্ষণ কোনো ভয় নেই। কিন্তু ওর মতো একটা লোককে সাফারি কিংবা জন্তুজানোয়ার ধরার

সময় সাথে নিয়ে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। এই ভুয়া শ্বেতাঙ্গ শিকারীর ওপর নজর রাখতে হবে। নইলে যে কোনো সময় নিজেকে তো বটেই, দলের সবাইকে ভীষণ বিপদে ফেলে দিতে পারে লোকটা।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো কিশোর। ইতিমধ্যেই বিপদে পড়ে গেছে জেনারেল। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে উন্মাদ নৃত্য জুড়েছে। পাগলের মতো খামচাখামচি করে গা থেকে ছিঁড়ে খুলে ফেলতে লাগলো জ্যাকেট, শার্ট, প্যান্ট। শরীরের এখানে ওখানে থাবা মারছে, ঝাড়ছে। এক জায়গায় কিছুতেই যেন স্থির রাখতে পারছে না পা।

কি হয়েছে আন্দাজ করে ফেললো কিশোর। সৈনিক পিঁপড়ে। মরা চিতাবাঘের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে এসেছিলো, ওটার গায়ে যখন পা রেখেছে জেনারেল, তখন জুতো বেয়ে গায়ে উঠে পড়েছে। এখন ইচ্ছে মতো কামড়াচ্ছে।

দৌড় দিলো কিশোর।

'আরে,' চেঁচিয়ে উঠলো জেনারেল। 'জলদি করো না! খেয়ে ফেললো তো! মেরে ফেললো!'

কিশোর যখন তাকে কোনো গুরুত্বই দিলো না, অবাক হয়ে গেল জেনারেল।

ভয়াবহ সৈনিক পিঁপড়ের ব্যাপারে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে কিশোরের। আমাজানের জঙ্গলে দেখেছে, কি ভয়ংকর ধ্বংসলীলা চালায় এই পিঁপড়ে। আফ্রিকান পিঁপড়েগুলোও সমান মারাত্মক, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বরং বেশি। দল বেঁধে এগোয়। চলার পথে জীবন্ত যা কিছু পড়ুক, খতম করে দেবে। মানুষ, এমনকি হাতিও রেহাই পায় না ওদের আক্রমণ থেকে। জ্যান্ত খেয়ে ফেলে!

'আগুন! আগুন জ্বালো!' চিৎকার করে আদেশ দিলো কিশোর। 'ক্যাম্পের চারপাশে আগুন জ্বেলে দাও!'

ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে পড়েছে অনেক পিঁপড়ে। মূল দলটা রয়েছে পেছনে, কমপক্ষে মাইলখানেক লম্বা হবে। ওগুলো ঢুকতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না।

জেনারেলের দিকে সে-জন্যেই নজর দিলো না কিশোর। সোজা এসে আমানের তাঁবুতে ঢুকলো সে। অসহায় একজন মানুষকে আক্রমণ করলে সহজেই শেষ করে দিতে পারবে পিঁপড়েরা। আহত আমানকে এখন প্রায় অসহায়ই বলা চলে।

'পিঁপড়ে!' চেঁচিয়ে বললো কিশোর।

ওই একটা শব্দই যথেষ্ট, সমস্ত চিত্র পেয়ে গেলেন আমান। বললেন, 'এখানে ঢোকেনি এখনও! জলদি গিয়ে জলহস্তীটাকে বাঁচাও!'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে আবার দৌড় দিলো কিশোর। খাঁচার দরজা খুলে জলহস্তীটাকে বের করে দেবে প্রয়োজন হলে, তবু অসহায় একটা জানোয়ারকে পিঁপড়ের শিকার হতে দেবে না। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে এতোবড়

দানবটাও। বুঝে গেছে বিপদ। অথচ তখনও ট্রাকের চাকা বেয়ে উঠতে আরম্ভ করেনি পিঁপড়েরা। লাফিয়ে ট্রাকের ড্রাইভিং সীটে উঠে বসলো কিশোর। ভালোই চালাতে পারে, যদিও ড্রাইভিং লাইসেন্স পায়নি এখনও। এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ট্রাকটাকে ক্যাম্প থেকে কয়েক শো গজ দূরে সরিয়ে আনলো।

ওর এরপরের ভাবনা হলো চিতাবাঘের বাচ্চাদুটো। ইস্, মুসা আর রবিন থাকলে এখন অনেক উপকার হতো। ক্যাম্পে নেই ওরা। পয়েন্ট টু-টু রাইফেল আর এয়ারগান নিয়ে বেরিয়েছে পাখি শিকার করতে। বাচ্চাদুটোকে বাঁচাতে হবে, আর সিমবাকেও। জলহস্তীর ট্রাক রেখে দৌড়ে আবার ক্যাম্পে ফিরে এলো সে। দু'চারটা পিঁপড়ে উঠে পড়েছে তার শরীরে। থাবা দিয়ে, ঝাড়া মেরে ফেলার চেষ্টা করলো।

অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে জানোয়ারেরা, সৈনিক পিঁপড়ের দলকে আসতে দেখলে। পালানোর সময় আছে বুঝেও যেন বোঝে না, অনড় হয়ে যায়, বোধহয় প্রচণ্ড আতঙ্কেই। অথচ চেষ্টা করলে ছুটে পালিয়ে যেতে পারে। দেখলো সিমবা আর বাচ্চাদুটো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে, আর গায়ের পুরোনো শার্টটা খুলে নিয়ে ওদের আশপাশের মাটিতে বাড়ি মারছে খামবু। বাঘ-সিংহকে ভয় পায় না যে সিমবা, পিঁপড়ের ভয়ে সে-ই এখন কেঁচো হয়ে গেছে।

কিশোরকে অবাক করলো খামবু। এই কি সেই লোক, খুনী, যে মানুষ খুন করতে পিছ পা নয়? ইচ্ছে করলে পালিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তা না করে কয়েকটা জানোয়ারকে বাঁচাতে জীবনের ঝুঁকি নিতে যাচ্ছে। পিঁপড়ে উঠে পড়েছে শরীরে, যত্রতত্র কামড়াচ্ছে, টেরই পাচ্ছে না যেন সে। সেদিকে নজর না দিয়ে কিভাবে জানোয়ারগুলোকে বাঁচাবে সেই চেষ্টা করছে।

এরকম চরিত্রের একজন খুনীকে অপছন্দ করবে কে? মিস্টার আমান ঠিকই করেছেন। এরকম একটা লোক বিপজ্জনক হলেও তাকে সাথে রেখে দেয়া, তাকে অশুভ শক্তির কবল থেকে রক্ষা করা উচিত।

নিজেদের তাগিদেই ক্যাম্পের চারপাশ ঘিরে আগুন জ্বেলে দিয়েছে কুলিরা। বাইরের পিঁপড়ে আর ঢুকতে পারছে না, ভেতরে যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে হয় মেরে ফেলা হচ্ছে, নয়তো তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। আগুন দেখে গতিপথ বদল করে ফেলেছে মূল দলটা। মোড় নিয়ে রওনা হয়ে গেছে পাশের বনের দিকে। কিশোর আন্দাজ করলো, জলহস্তীর ট্রাকটা ওদের গতিপথে পড়বে না।

হাঁপ ছাড়লো কিশোর। এতোক্ষণে জেনারেলের দিকে নজর দেয়ার সময় পেলো। একটা সুতোও নেই আর এখন শ্বেতাঙ্গ শিকারীর পরনে, একেবারে দিগম্বর। নাচাকুদা কিছুটা কমেছে, তবে শরীরের এখানে ওখানে খামচাখামচি আর চুলকানো বেড়েছে। এখনও কামড়াচ্ছে তাকে পিঁপড়েরা। বিশাল একেকটা, আধ ইঞ্চি লম্বা শুধু শরীরটাই, পা বাদ। ধারালো বাঁকা চিমটা দিয়ে কামড়ে ধরছে

মাংসে, কেটে না আনা পর্যন্ত আর ছাড়ছে না। ধরে টান দিলেও ছাড়ে না। মাথা ছিঁড়ে যায়, কিন্তু চিমটা বেধানোই থাকে মাংসে।

ছুরি বের করলো কিশোর। ছেঁড়া মাথাগুলো চেঁছে ফেলতে লাগলো জেনারেলের শরীর থেকে।

সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধ নেই হুডিনির। খেঁকিয়ে উঠলো, 'এতোক্ষণ পরে এলে!' কোলাব্যাঙের ঘড়ঘড় বেরোলো তার গলা দিয়ে। একনাগাড়ে চেঁচিয়ে শুকিয়ে খসখসে করে ফেলেছে গলা। আবার কাপড় পরতে শুরু করলো সে। শরীরের কাঁপুনি তখনও বন্ধ হয়নি।

বাবুর্চির দিকে ফিরলো কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, 'কফি আছে?'

'অনেক।'

'বানাও।'

'বানানোই আছে।'

রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলো বাবুর্চি, আগুনের কাছে, ফলে একটা পিঁপড়েও তার কাছে ঘেঁষেনি। পুরোপুরি সুস্থ আছে সে। কামড়-খাওয়াদেরকে সেবা করার কাজে লাগলো এবার। কড়া, গরম কফি একটা ক্যান্টিনে ভরে এনে দিলো কিশোরের হাতে। খানিকটা জেনারেলকে খেতে দিয়ে ক্যান্টিনটা ঝুলিয়ে রাখলো নিজের কাঁধে, যদি আর কারও প্রয়োজন হয়, চায়।

কফি খেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ করলো হুডিনি। বড় বড় কথা আর গালগল্প শুরু করে দিলো আবার। এমন ভঙ্গিতে ক্যাম্পের চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো, যেন সেনা-বাহিনী পরিদর্শন করছে কোনো জেনারেল।

'আমার হাতে ভার থাকলে,' হুডিনি বললো, 'এটা কিছুতেই ঘটতো না। ঘটতে দিতাম না। সহজেই ঠেকানো যেতো এসব।'

'কিভাবে?' জানতে চাইলো কিশোর।

'কি আবার। পিঁপড়ে মারার বিষ দিয়ে। নিশ্চয় আছে তোমাদের কাছে?'

'সাপ্লাই ওয়াগনে কয়েক বাক্স আছে বোধ হয়। তবে ওসব দিয়ে সাধারণ পিঁপড়ে মরে, সৈনিক পিঁপড়ের কিছু হয় না।'

'হয়, দিতে জানলেই হয়। তোমরা কিচ্ছু জানো না। এখনও ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছে এই ক্যাম্প, বুঝতে পারছো সেটা? পারছো না। বাচ্চা ছেলে, বুঝবে কি? আগুন দেখে আপাতত ঘুরে গেছে দলটা, কিন্তু যে কোনো সময় মত পালটে আবার ফিরে আসতে পারে। তবে ভয় নেই, আমি যখন আছি, সব ঠিক করে দেবো।'

সাপ্লাই ওয়াগন কোনটা জেনে নিয়ে সোজা সেদিকে এগিয়ে গেল হুডিনি। বাক্স আর প্যাকেট ঘেঁটে পিঁপড়ে-মারা বিষের একটা টিন নিয়ে নেমে এলো।

মনে মনে হাসলো কিশোর। ওই বিষ দিয়ে সৈনিক পিঁপড়ে মারবে? হাহ্ হাহ্!

চেষ্টা করে দেখুকগে। শুধু কামড় খেয়ে আবার ফিরে আসতে পারলে হয়।

শুকনো ঘাসকুটো, লতাপাতা আর ডাল দিয়ে আগুন জ্বেলেছে কুলিরা। কোনো কোনো জায়গায় সেগুলো পুড়ে গেছে। ধিকিধিকি আগুন রয়েছে এখন শুধু ওখানে।

সে-রকম একটা জায়গা বীরদর্পে লাফিয়ে পেরোলো জেনারেল। মূল সারিটা অনেকখানি সরে গেছে। দলছুট কিছু পিঁপড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘোরাফেরা করছে এখানে ওখানে। সেগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে, তবে নিরাপদ দূরত্বে। পা বেয়ে উঠে এসে যাতে আবার কামড়াতে না পারে। কিছুটা বিষ ছিটালো ওগুলোর গায়ে। একটুও শঙ্কিত মনে হলো না পিঁপড়েগুলোকে, যেমন চলাফেরা করছিলো, তেমনি করছে।

একফুট লম্বা একটা সারি দিয়ে এগিয়ে চলেছে পিঁপড়েরা, গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে। এক বন থেকে বেরিয়ে আরেক বনে ঢুকেছে সারিটা। যে বন থেকে বেরিয়েছে সেদিকে চললো হুডিনি। ঢুকে পড়লো ঘন ঝোপঝাড়ের ভেতরে।

তারপর, সন্তুষ্ট হয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো ক্যাম্পে। পিঁপড়েদের চলার বিরাম নেই, কোনো ব্যাঘাত ঘটেছে বলেও মনে হলো না। একটা ঘণ্টা ধরে ওরা আসতেই থাকলো, আসতেই থাকলো, তারপর কমে এলো ধীরে ধীরে।

বিপদ কেটে গেছে। আগুনে নতুন করে আর কুটো ফেললো না কুলিরা। ধীরে ধীরে নিভে গেল আগুন।

আত্মবিশ্বাস আবার পুরো ফিরে এসেছে হুডিনির। কিশোরের দিকে তাকিয়ে চওড়া হাসি হেসে বললো, 'কি করলাম, নিজের চোখেই তো দেখলে। ভাগ্যিস বিষের কথা মনে হয়েছিলো আমার। দেখলে, কি রকম কাজটা হলো। এরপর এরকম বিপদে পড়লে আশা করি আর অসুবিধে হবে না। কি করতে হবে সে তো শিখিয়েই দিলাম তোমাকে।'

বিষে যে একটা পিঁপড়েও মরেনি, সেকথা বলার ইচ্ছে হলো একবার কিশোরের। বললো না। কে যায় পাগলের সঙ্গে তর্ক করতে। বরং হেসে, যেন জেনারেলের কথাতেই সায় জানিয়ে চুপ করে রইলো সে।

আট

বনের ভেতর থেকে ভেসে এলো হৈ-হট্টগোল। চেঁচামেচি, খেঁকখেঁক, কাশি, সব যেন একযোগে শুরু হয়ে গেল। তার মধ্যে শোনা গেল অনেকটা মানব শিশুর যন্ত্রণাকাতর চিৎকারের মতো শব্দ, আর মায়ের আর্তনাদ।

কান পেতে শুনছে কিশোর। বুঝতে পারছে, কারা হট্টগোল করছে। বেবুন। আগের দিনই বনের মধ্যে বেবুনের বিশাল একটা দল দেখেছে। কি

হয়েছে ওগুলোর?

মিস্টার আমানের তাঁবুতে ঢুকে অর্ডার শীটটা বের করলো সে। হ্যাঁ, আছে, বেবুনের নাম লেখা রয়েছে। একটা সার্কাস দল দুটো বেবুন চায়।

গিয়ে দেখবে নাকি? ভাবলো সে। বলা যায় না, এই গোলমালের মাঝে কোনো ভাবে দুটো বেবুনকে পাকড়াও করে ফেলতে পারে। তাছাড়া, কেন এই গণ্ডগোল সেটা জানারও প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে তার।

বনের দিকে রওনা হলো সে। জেনারেল হুডিনি বিষের টিন নিয়ে যে পথে গিয়েছিলো সেই পথ ধরে। বনের ভেতর ঢুকতেই চোখে পড়লো ডালে ডালে বসে রয়েছে বেবুনেরা, অসংখ্য, চারদিকে, ভীষণ রেগে আছে। বুঝলো, মস্ত বোকামি হয়ে গেছে। সাথে করে বন্দুক আনা উচিত ছিলো। আর একা আসাও একদম ঠিক হয়নি।

সবখানে শুধু বেবুন আর বেবুন। মাটিতে বেবুন, গাছের ডালে বেবুন, ঝোপের আড়ালে বেবুন। এদেরকে অনেকে বলে কুকুরমাথা বানর, কুকুরের মতো দেখতে মাথার জন্যে। ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে। দ্রুত আন্দাজ করার চেষ্টা করলো সে, ক'টা বেবুন আছে। শ'তিনেকের কম নয়।

বেবুনের স্বভাব তার জানা। বইয়ে পড়েছে। তাছাড়া আগের বার যখন আফ্রিকায় (পোচার দ্রষ্টব্য) এসেছিলো, তখন নিজের চোখেই দেখে গেছে। মহাবিপদের মধ্যে এসে ঢুকেছে সে, বুঝতে অসুবিধে হলো না। জীববিজ্ঞানী এবং বিশিষ্ট শিকারীদের মতে, ক্ষণে ক্ষণে বদলায় বেবুনের মেজাজ-মরজি। এখুনি ভালো এখুনি খারাপ। এখুনি হয়তো মোমের মতো গলে যাবে, পরক্ষণেই হয়ে উঠবে ভয়াবহ হিংস্র।

বিশাল আকৃতির বানর ওরা। কয়েকটা বেবুন মিলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে একটা চিতাবাঘকে। ওদেরকে ভয় করার আরেকটা প্রধান কারণ হলো, ওরা বুদ্ধিমান। অনেকটা মানুষের মতোই রেগে যায়। আঘাত করলে পাল্টা আঘাত হানে, পাথর ছুঁড়ে মারলে ওরাও পাথর ছুঁড়ে মারবে। আর নিশানাও খুব ভালো। ডালকে লাঠি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, মানুষের মতোই।

বেবুনেরা জানে, রাইফেলের রেঞ্জ কতো, কতো দূর থেকে আঘাতটা মারাত্মক হবে। নিরাপদ দূরত্বে চলে গিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে শিকারীর দিকে তাকিয়ে মুখ ভেঙচায়, তাকে রাগিয়ে দেয়ার জন্যে। দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ, এইট-পাওয়ার বিনকিউলারের সমান।

দল বেঁধে চাষীর খেতে চড়াও হয় ওরা। একটা বেবুন তখন গাছের মগডালে বসে পাহারা দেয়। বিপদ দেখলেই হুঁশিয়ার করে দেয় দলটাকে।

নারী-পুরুষের প্রভেদ বোঝে। কে সশস্ত্র কে নিরস্ত্র টের পায়। বন্দুকধারী কাউকে দেখলে তীক্ষ্ণ সংকেত দেয়, বন্দুক ছাড়া পুরুষকে দেখলে মৃদু সংকেত,

আর নিরস্ত্র মেয়েমানুষকে দেখলে কোনো শব্দই করে না।

একজন রেঞ্জার একবার কিশোরকে বলেছিলেন, তাঁর গাড়িটা নাকি চিনতো বেবুনেরা, ওটার কাছ থেকে দূরে থাকতো। ওদের কাছাকাছি যেতে হলে আরেকটা গাড়ি ব্যবহার করতে হতো তাঁকে। আসকারি, অর্থাৎ আফ্রিকান-গেম স্কাউটদের পোশাক চেনে বেবুনেরা, তাদের সঙ্গে বিচিত্র আচরণ করে। মাঝে মাঝেই খেতের ফসল রক্ষা করার জন্যে আসকারিদের ডেকে আনে চাষীরা। ওরা এসে ক্ষতিকর জানোয়ারকে গুলি করে মারে, কিংবা ভয় দেখিয়ে তাড়ায়। গণ্ডার, মোষ, জলহস্তী, বুনো শুয়োর এমনকি হাতিকেও তাড়ানো যায়, কিন্তু বেবুনকে নয়। ইউনিফর্ম দেখলেই আর থাকে না খেতে। যেন ভোজবাজির মতো নিমেষে গায়েব হয়ে যায়। আসকারীরা চলে গেলেই আবার ফিরে আসে খেত লুট করার জন্যে।

বেবুনদের কাছে যাওয়ার জন্যে ইউনিফর্ম খুলে গ্রামবাসীদের মতো সাধারণ পোশাক পরে নেয় আসকারীরা। পিঠের ওপর রাইফেল লুকিয়ে রেখে সাবধানে এগোয়। তারপরেও গাছে বসা বেবুনপ্রহরীর চোখে পড়ে যায় ওটা, সংকেত দেয়, আর চোখের পলকে পালায় বেবুনের দল।

কোন জিনিসটা খেতে ভালো, ভালো করেই জানে বেবুনেরা। অন্যান্য জানোয়ারের মতো এক ধরনের খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে না। মানুষের মতোই বিভিন্ন খাবার খায়। ফলমূল থেকে শুরু করে শাকসব্জি, পোকা, কেঁচো, শামুক, পাখি, এমনকি শুয়োর, ভেড়া, ছাগল, মুরগী আর কুকুরও খায় সুযোগ পেলে।

খাওয়ার বেলায় মানুষের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশি সুবিধা ভোগ করে বেবুন। পেট ভরে গেলে আর খেতে পারে না মানুষ, কিন্তু বেবুন পারে। পারে মানে পেটে ঢোকায় না, গালের বাড়তি থলেতে ভরে রাখে খাবার, পরে পাকস্থলী খালি হলে তাতে চালান করে দেয়।

কাঁকড়াবিছেকে বেশির ভাগ জানোয়ারই ভয় করে ওগুলোর মারাত্মক বিষের জন্যে। কিন্তু বেবুন পরোয়াও করে না বিছেকে। লেজের মাথায় কোন জায়গায় হুল থাকে, জানে ওরা। ধরে হুলটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বিছেটাকে গালে পুরে দেয়।

বেবুনের সঙ্গে লাগতে না গেলে সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করতে আসে না বেবুন। তবে সব সময় এই নিয়ম ঠিক থাকে না। অনেকটা মেজাজের ওপর নির্ভর করে সব কিছু। হয়তো কোনো কারণে রেগে আছে বেবুনেরা, সামনে পড়ে গেলে তখন ঝালটা মানুষের ওপরই মেটাতে চায় ওরা।

তিনশোর বেশি রেগে যাওয়া বেবুনের মুখোমুখি হয়েছে কিশোর। ওদেরকে সে রাগায়নি, তবে অন্য কেউ রাগিয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কে? ওদের ক্যাম্পের কেউ?

প্রথমে কিছু বুঝতে পারলো না সে। তারপর চোখ পড়লো মাটিতে পড়ে থাকা ফ্যাকাশে সবুজ গুঁড়োগুলোর ওপর। পিঁপড়ে মারার বিষ! ওই মাথামোটা

জেনারেলটার কাজ। ছড়িয়ে রেখে গেছে এখানে।

কিন্তু তাতে বেবুনদের কি? ওরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান, অন্তত বিষ খাওয়ার মতো বোকামি করবে না।

জোরালো একটা চিৎকার শোনা গেল আবার, মেয়েমানুষের বিলাপের মতো। ডালে বসে আছে একটা মেয়ে বেবুন। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে একটা বাচ্চাকে। হঠাৎ বুঝে ফেললো কিশোর, বাচ্চাটার কষে লেগে থাকা সবজে ফেনা দেখে।

বড়দের মতো চালাক হয়ে ওঠেনি এখনও বাচ্চাটা, ভুল করে বোধহয় কৌতূহলের বশেই বিষ খেয়ে ফেলেছে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে এখন। শরীর মোচড়াচ্ছে। মৃত্যু আর বেশি দূরে নেই।

জেনারেল হুডিনিকে শাস্তি দিতে পারছে না বেবুনেরা, কিন্তু তার সঙ্গী আরেকটা মানুষ রয়েছে হাতের কাছেই। খুনের নেশা দেখতে পেলো কিশোর ওগুলোর চোখে। বিশাল শ্বদন্ত বের করে ভয়ংকর ভঙ্গিতে খেঁকিয়ে উঠলো ওগুলো, রাগে চিৎকার করে লাফালাফি শুরু করলো ডালে ডালে।

কিশোর জানে, সামান্যতম ভুল করলেই এখন যমদূতের মতো তার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে বেবুনের দল। মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। পাথর ছুঁড়ে ভয় দেখানোর চেষ্টা করলে মরবে, হুমকি দিলে মরবে, ঘুরে দৌড় মারলেও পালাতে পারবে না।

পিছিয়ে যাবে? সেই চেষ্টাই করলো। খুব আস্তে এক পা ফেললো, আরেক পা···পেছনে খেঁকিয়ে উঠলো কয়েকটা বেবুন। ফিরে চেয়ে দেখলো, ওদিকের পথও রুদ্ধ করে দিয়েছে বেবুনেরা। চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে তাকে।

এগিয়ে আসতে আরম্ভ করলো বেবুনেরা। ওদের মিলিত চিৎকারে কান ঝালাপালা। লাফিয়ে এগোচ্ছে এক পা, পিছাচ্ছে, তারপর আবার এগোচ্ছে। তবে পিছানোর চেয়ে অগ্রগতিই বেশি, যদিও খুব ধীর।

পালানোর চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিলো কিশোর। অন্য কিছু করা দরকার। বেবুনেরা যদি এতোটাই বুদ্ধিমান হয়, দেখা যাক ওদের সাথে একটা সমঝোতায় আসা যায় কিনা।

পিছানোর চেষ্টা করলো না আর সে। বরং এক পা আগে বাড়লো। তার দৃঢ় ভঙ্গি থমকে দিলো বেবুনদের। পিছিয়ে গেল ওরা, নেমে এলো হঠাৎ নীরবতা।

শান্ত কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করলো কিশোর। মুখে যা আসছে তা-ই বলে যাচ্ছে। তার ভাষা বুঝতে পারছে না বেবুনেরা, তবে কণ্ঠের আবেদন বুঝতে পারছে। শান্ত, মোলায়েম কণ্ঠস্বর, তাতে ভয়ের ছোঁয়া নেই।

কথা বলছে কিশোর, আর বার বার তাকাচ্ছে অসুস্থ বাচ্চাটার দিকে। আস্তে করে কাঁধ থেকে কফির ক্যান্টিনটা খুলে বাড়িয়ে ধরলো বেবুন-মায়ের দিকে।

একবার ঝাঁকানি দিলো ক্যান্টিনটা, ভেতরে ছলছল শব্দ শোনা গেল। ক্যান্টিনের মুখটা তুলে আনলো নিজের মুখের কাছে, পান করার ভঙ্গিতে, কিন্তু করলো না। আবার ওটা বাড়িয়ে ধরলো। কথা বন্ধ করছে না, বলেই যাচ্ছে একনাগাড়ে।

আরেক পা আগে বাড়লো কিশোর। চেঁচিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল বেবুন-মাতা। কিন্তু তাকে পালাতে দিলো না পেছনের বেবুনেরা। আটকে ফেললো।

তিনটে বয়স্ক বিজ্ঞ বেবুন যেন তার সাথে আলোচনায় বসলো, ভাবভঙ্গিতে তা-ই মনে হচ্ছে। নিজেদের ভাষা, অর্থাৎ ছোট ছোট ঘোঁৎ ঘোঁৎ আর চাপা খেঁক খেঁক মিলিয়ে কথা বলছে। যেন বলছে, 'মানুষটা খারাপ না। সাহায্য করতে চায় বাচ্চাটাকে।'

মাকে বোঝানো কঠিন হলো। বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলো বার বার। কিশোরকে আরও দুই পা আগে বাড়তে দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো। দুটো দল হয়ে গেল যেন বেবুনেরা। একদল মেয়েটার পক্ষে, আরেক দল বয়স্কদের পক্ষে। তর্কাতর্কি বাধিয়ে দিলো যেন। ওদের দাঁত খিঁচানো আর গর্জন আবার অস্বস্তিতে ফেলে দিলো কিশোরকে।

চেঁচামেচি না কমা পর্যন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সে। তারপর আবার নরম গলায় কথা বলতে লাগলো। আরেকবার বাড়িয়ে দিলো ক্যান্টিনটা।

শেষে বাচ্চাটাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো কিশোরের পক্ষে। বড় বড় গোল চোখ মেলে কিশোরকে দেখতে দেখতে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিলো। কিশোর নড়লো না। মায়ের কোল থেকে নামার চেষ্টা করতে লাগলো বাচ্চাটা। মানুষের বাচ্চার মতোই স্বাভাবিক কৌতূহল, নতুন জিনিসটা নিয়ে খেলার জন্যে ছটফট করছে।

জোরে জোরে গোঙাতে শুরু করলো। শেষে মা রেগে গিয়ে ওটার লাল নিতম্বে জোরে এক চড় লাগিয়ে দিলো। বাচ্চাটাকে নিয়ে আরেকবার সরে পড়ার চেষ্টা করলো, পারলো না, চারদিক থেকে ঘিরে আটকে ফেলা হয়েছে তাকে।

কিশোরের মাত্র কয়েক ফুট দূরে রয়েছে মা আর বাচ্চাটা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সে। ভয় এখনও কাটেনি পুরোপুরি, তবে সেটা চোখে মুখে ফুটতে দিচ্ছে না।

হাঁটুতে ভর দিয়েই ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে লাগলো সে। বুকের খাঁচায় ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ডটা। বিপজ্জনক পরীক্ষা চালাতে যাচ্ছে সে। তেতো এই কালো কফিতে কি বিষের ক্রিয়া কাটবে? এমনও হতে পারে, কফি খেয়ে বিষক্রিয়া আরও বেড়ে গিয়ে বাচ্চাটার মৃত্যু ত্বরান্বিত করতে পারে। আর তা যদি হয়, তারপর আর মিনিটখানেকও বাঁচবে না 'ডাক্তার'। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে তাকে।

তাকিয়ে রয়েছে বেবুনেরা, চোখে সন্দেহ। তবে কিশোরের আচরণ আর কণ্ঠস্বর আশ্বস্ত করলো ওদেরকে।

অন্যান্য বুনো জানোয়ারের মতোই সাহসিকতাকে শ্রদ্ধা করে ওরা। কিশোর পালাতে চেষ্টা করলে বাঁচতে পারতো না। তার শান্ত কণ্ঠ আর সাহস থামিয়ে দিয়েছে বেবুনগুলোকে। বিস্মিতও হয়েছে ওরা।

অবশেষে বাচ্চাটার নাগালের মধ্যে পৌঁছে গেল কিশোর। খপ করে ক্যান্টিন চেপে ধরলো বাচ্চাটা। ছাড়লো না কিশোর। খুব সাবধানে, চারপাশের রাগতঃ গুঞ্জনকে উপেক্ষা করে আরও কয়েক ইঞ্চি এগোলো। ক্যাপ খুললো ক্যান্টিনের। তারপর আস্তে কাত করে কয়েক ফোঁটা কফি ঢাললো।

একটা ফোঁটাও মাটিতে পড়তে দিলো না বাচ্চাটা। হাঁ করে মুখে নিয়ে নিলো তিক্ত তরল। আরও ঢাললো কিশোর। বাচ্চাটার গলার ভেতরে পড়তে লাগলো কফি। তরল পদার্থ গলায় আটকে যাওয়ায় মুখ বন্ধ করে গলা টান করলো বাচ্চাটা, মাথা ঝাড়া দিলো একবার, তারপর আবার মুখ খুললো। ঢেলে দিতে লাগলো কিশোর।

মরবে, না বাঁচবে বাচ্চাটা? চোখ বন্ধ করে আবার শরীর মোচড়াতে আর কাঁদতে শুরু করলো ওটা। শঙ্কিত হয়ে হুমকি দিতে লাগলো মা। অন্য বেবুনেরাও দাঁত বের করে শাসাতে লাগলো কিশোরকে। চারপাশে শুধু বিকট মুখভঙ্গি আর হলদে ধারালো দাঁত ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না তার।

ক্যান্টিনটা নামিয়ে রাখলো সে। মোচড় দিয়ে মায়ের বাহুপাশ থেকে বেরিয়ে এলো বাচ্চাটা, মাটিতে মুখ গুঁজে হাঁপাতে আর ফোঁপাতে লাগলো। ওটার প্রতিটি নড়াচড়া, প্রতিটি শব্দ আতঙ্কিত করে তুলেছে কিশোরকে। দুরুদুরু করছে বুক। ওই ছোট্ট জানোয়ারটার বাঁচামরার ওপরই এখন নির্ভর করছে তার জীবন।

হেঁচকি উঠতে লাগলো বাচ্চাটার। শুরুতে দ্রুত, তারপর অনেকটা সময় বিরতি দিয়ে দিয়ে। শেষে, অনড় হয়ে মাটিতে পড়ে রইলো ওটা।

মরে গেল নাকি! আতঙ্কে ঠাণ্ডা ঘাম ফুটলো কিশোরের কপালে আর ঘাড়ে। তবু ভয় প্রকাশ পেতে দিলো না। বাচ্চাটার পেটে হাত রেখে জোরে চাপ দিতে লাগলো। মুখ দিয়ে ফোয়ারার মতো ছিটকে বেরোলো সবজে-হলুদ দই। যতোক্ষণ একটা ফোঁটাও বেরোলো, ততোক্ষণ চাপতেই থাকলো সে।

আর কিছু করার নেই। এবার শুধু অপেক্ষা। আবহাওয়া তেমন গরম নয়। কিন্তু দরদর করে ঘামছে সে। স্নায়ুর চাপ সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠেছে।

তার চারপাশের খেঁকখেঁক এখন একটানা গর্জনে রূপ নিয়েছে। এগিয়ে এসে নিথর বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁদতে শুরু করলো মা।

হঠাৎ, শক্ত হয়ে গেল ছোট জীবটার পেশি, কেঁপে কেঁপে খুলে গেল গোল চোখের পাতা।

থেমে গেল গর্জন, নেমে এলো স্তব্ধ নীরবতা। একটা দুটো করে কিচির মিচির শুরু হলো, তবে তাতে আর রাগের ছোঁয়া নেই। উঠে দাঁড়ালো বয়স্ক একটা বেবুন,

গাছের দিকে রওনা দিলো। ওটার সঙ্গী হলো আরেকটা, আর একটা, তারপর আরও।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ওখানেই বসে পড়লো কিশোর। ক্যান্টিনটা তুলে নিয়ে ক্যাপ লাগাতে শুরু করলো। আরও দশ মিনিট থাকলো ওখানে। কাছাকাছি একটা বেবুনও নেই আর তখন; সব সরে গেছে। বসে রয়েছে শুধু দুটো জানোয়ার, মা আর তার বাচ্চা।

আস্তে করে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। তার প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছে মা। বেবুন-মাতার হলদে-ধূসর চোখে স্পষ্ট কৃতজ্ঞতা, যে কোনো ডাক্তারের হৃদয়কে উষ্ণ করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কিচমিচ শুরু করেছে বাচ্চাটা। ছোট ছোট ধূসর হাত বাড়াচ্ছে ক্যান্টিনটার জন্যে।

ঘুরে ক্যাম্পের দিকে রওনা হলো কিশোর। পেছনে উত্তেজিত চিৎকার জুড়েছে বাচ্চাটা। মায়ের হাত থেকে ছুটে যাওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

আচ্ছামতো পিটালো ওকে মা। কিন্তু নিরস্ত করতে পারলো না বাচ্চাকে। চেঁচানি আরও বাড়লো ওটার।

মমতার কাছে পরাস্ত হলো রাগ আর জেদ। হাত থেকে ছেড়ে দিলো বাচ্চাকে। কিশোরের কাঁধে ঝোলানো ক্যান্টিনটার জন্যে পিছে পিছে চললো ওটা।

ক্যান্টিনের লোভে মানুষের পিছে চলেছে বাচ্চা বেবুন, আর বাচ্চার পেছনে মা।

ক্যাম্পে ফিরে এলো কিশোর, খালি হাতে নয়, যা আনতে গিয়েছিলো তা নিয়ে। দুটো বেবুনকে ধরতে তার ব্যয় হয়েছে হৃদপিণ্ডের কিছু উত্তেজিত লাফালাফি, ঘাম, আর ভালোবাসা। টোপ হলো একটা সাধারণ ক্যান্টিন।

নয়

এতো লোকজন, দেখেই থমকে গেল মা-বেবুন। তার হাত ধরলো কিশোর। আরেক পাশ থেকে বাচ্চাটার হাত ধরলো। তারপর দুই সঙ্গীকে নিয়ে হেঁটে ঢুকলো ক্যাম্পে, যেন বেড়াতে বেরিয়েছিলো তিনজনে, ফিরে এসেছে।

নির্বাক হয়ে গেছে ক্যাম্পের লোকেরা। ওদেরকে চমকে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছে কিশোর।

সবাই বেশ খুশি। এতো সুন্দর দুটো নমুনা ধরে আনতে পারায় স্বাগত জানালো কিশোরকে। কিন্তু সবাই অবাক, এভাবে বাধ্য করলো কি করে বেবুন দুটোকে?

হৈ-চৈ শুনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো রবিন আর মুসা। ফিরে এসেছে শিকার

থেকে।

প্রথমে অবাক হলো মুসা। চোখ বড় বড় করে দেখলো এই আজব দৃশ্য। চেঁচিয়ে বললো, 'খাইছে!' তারপর হাসি ফুটলো মুখে। রসিকতার সুরে বললো, 'বাহ্, কি দারুণ একটা পরিবার!' ছুটে গিয়ে মিস্টার আমানের তাঁবুর কানা তুলে ধরে বললো, 'বাবা, দেখ কাণ্ড! বেবুনের পরিবার। বাবা, মা আর ছেলে।'

হাসতে শুরু করলো রবিন।

কিশোরও হাসলো। বেবুন দুটোকে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকলো।

খাটিয়ায় কাত হয়ে শুয়ে বেবুন দুটোকে দেখলেন আমান। 'সুন্দর। এর চেয়ে ভালো নমুনা আর হয় না। দুটো দেখছি। আরেকটা কোথায়?'

'এই তো,' কিশোরকে দেখালো মুসা।

আমানও হাসতে লাগলেন। 'ভুল বলেছো। ওকে বেবুনের সঙ্গে মানাচ্ছে না। তুমি হলে বেশি মানাতো।'

হো হো করে হেসে উঠলো রবিন আর কিশোর। মুসাও হাসলো, তবে তাতে জোর নেই।

'আমার কিন্তু বেবুন হতে আপত্তি নেই,' হাসতে হাসতে বললো কিশোর। 'ভীষণ চালাক ওরা। উন্নত জীব।'

তিনশো বেবুনের সঙ্গে তার মোকাবেলার কাহিনী খুলে বললো সে।

'হুঁ,' সব শুনে বললেন আমান। 'মাথা ঠাণ্ডা রেখে বুদ্ধি খরচ করতে পারলে জিত হবেই।'

'কিন্তু এই বেবুন দুটো এভাবে চলে এলো,' বললো কিশোর, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। একটুও ভয় করলো না?'

'বেবুনেরা মানুষকে ভয় পায় না। হয়তো ওদের সমগোত্রীয়ই কিছু ভাবে। ক্যাম্পের আশেপাশে ঘুর ঘুর করে ওরা খাবারের লোভে। গাড়ির জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে খাবার চায়। আক্রান্ত হলে গাঁয়ে গিয়ে মানুষের সাহায্য চায় বেবুনেরা, এরকম গল্প অনেক শোনা যায়। এই কিছুদিন আগেও এরকম একটা গল্প শুনেছি। রোডেশিয়ায় রেল লাইনের কাজ করছিলো একদল শ্রমিক, এই সময় সিংহের গর্জন আর বেবুনের চিৎকার শুনতে পায় ওরা। একটু পরেই ঝোপের ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে কয়েকটা বেবুন, লাইনের ওপর বসে পড়ে এমন ভাবে তাকাতে লাগলো লোকগুলোর দিকে, যেন সাহায্য চাইছে। ওভারশিয়ারের কাছে রাইফেল ছিলো। সে গিয়ে সিংহগুলোকে তাড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত নড়লো না বেবুনগুলো। মানুষের কাছে যেমন সাহায্য চায় বেবুনেরা, তেমনি মানুষকে সাহায্য করেছে বলেও শোনা যায়।'

'সহজেই পোষ মানে নাকি?' রবিন জিজ্ঞেস করলো।

'বানর গোষ্ঠির সব জানোয়ারই সহজে পোষ মানে। উন্নত মগজ। তাছাড়া

মানুষের মতো হাত রয়েছে, আর সেই হাতের ব্যবহারও জানে। এই জন্যেই আর সব বুনো জানোয়ারের চেয়ে আলাদা ওরা। আঙুলের ব্যবহার দেখতে চাও? ওই যে, দড়িটা দিয়ে মা-বেবুনটার গলা বাঁধো। আরেক মাথা খাটিয়ার পায়ায় বেঁধে দিয়ে দেখ কি করে।'

তা-ই করলো কিশোর। অবাক হয়ে গেল মা-বেবুনটা। ব্যাপারটা মোটেও পছন্দ হলো না তার। প্রথমে টানাটানি করে দড়ি ছোটানোর চেষ্টা করলো। পারলো না। বসে পড়ে আঙুল বোলালো গলার দড়িতে। গিঁটটা পেয়ে যেতেই আঙুল দিয়ে খুঁটতে আরম্ভ করলো ওটা। মিনিটখানেকের মধ্যেই গিঁট খুলে দড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

হাসলেন আমান। 'আর কোন জানোয়ার পারবে এই কাজ? এদেরকে মানুষের পূর্বপুরুষ বলাটা কি অন্যায়?'

কিছুটা ভড়কে গেছে এখন মা-বেবুনটা। ছেলের হাত ধরে সরে পড়তে চাইলো। কিন্তু বাচ্চাটার হাত ছাড়লো না কিশোর। বাচ্চাকে ছাড়াতেও পারলো না, সরতেও পারলো না বেবুনটা।

'খাঁচায় ভরে ফেলি,' কিশোর বললো। 'নইলে পালাবে।'

'না, যাবে না। ছেড়ে দিয়েই দেখ না।'

ছেলের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো মা। তিন লাফে চলে গেল তাঁবুর দরজার কাছে। যখন দেখলো, কেউ পিছু নেয়নি ওদের, তাড়া করেনি, ধরার চেষ্টা করছে না, ফিরে বসে বড় বড় গোল চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো কিশোরের দিকে।

হেসে বললেন আমান, 'তুমি এখন ওদের বন্ধু হয়ে গেছ। ওরা বুঝতে পারছে সেটা। খাঁচার আর দরকার নেই। চেষ্টা করেও ওদেরকে তাড়াতে পারবে না আর। যাবে, আবার আসবে, যাবে, আসবে। বন্ধনটা আরও শক্ত করো। ওই যে, ওখান থেকে দুটো কলা তুলে নিয়ে দিয়ে দাও।'

দুটো কলা ছিঁড়ে আনলো কিশোর। সাধতে হলো না। আপনা আপনিই এসে প্রায় ছোঁ মেরে একটা কলা তার হাত থেকে নিয়ে নিলো বাচ্চাটা। দেখাদেখি মা-টাও এসে সহজ ভঙ্গিতে কলাটা নিয়ে নিলো কিশোরের হাত থেকে।

আরাম করে বসে কলা খেতে লাগলো মা ও ছেলে। কিশোরের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না।

মুসাকে বললেন আমান, 'খাতিরটা তুমিও করে ফেলতে পারো। আর তোমার করাই ভালো, জন্তুজানোয়ারের দেখাশোনার ভার যখন তোমার ওপর। তুমিও দুটো কলা দাও।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মুসার সঙ্গেও ভাব হয়ে গেল বেবুন দুটোর। নামও দিয়ে ফেললো সে। বাচ্চাটার নাম 'টামি', আর মায়ের নাম 'কোরিন'।

বেবুন দুটোকে চিতাবাঘের বাচ্চা দুটোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে

গেল মুসা। মা-বেবুনটা চিতাবাঘ দেখেই কুঁকড়ে গেল। বেবুনের সঙ্গে চিতাবাঘের জাত শত্রুতা। এর কারণ, বেবুনের মাংস সব চেয়ে বেশি পছন্দ করে চিতাবাঘ। বাচ্চাটার এখনও সেই অভিজ্ঞতা হয়নি। কাজেই দিব্যি গিয়ে খেলা জুড়ে দিলো চিতাবাঘের বাচ্চার সঙ্গে। কোরিন দেখলো, বাচ্চাগুলো টামির কোন ক্ষতি করছে না। শেষে সে-ও গিয়ে খেলায় যোগ দিলো। জাত শত্রুতা ভুলে গেল আধ ঘণ্টার মধ্যেই।

দশ

পরদিন ভোরবেলা হন্তদন্ত হয়ে আমানের তাঁবুতে ঢুকলো কাকামি। 'বাওয়ানা, একটা কথা!'

'কি কথা, কাকামি?'

'টরি নেই,' টরি হলো একটা চিতাবাঘের বাচ্চার নাম। আরেকটার নাম রেখেছে মুসা নরি।

বড় করে হাই তুললো কিশোর। মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বললো, 'দেখগে, কোন ঝোপটোপের মধ্যে খেলা করছে।'

'একটা লোককে দেখলাম, ধরে নিয়ে পালালো। গাঁয়ের লোক। তাড়া করেছিলাম, ধরতে পারলাম না।'

'টরিকে চুরি করবে কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'কেন করেছে, জানি বাওয়ানা। কাল রাতে গাঁয়ে গিয়েছিলাম। মোড়লের খুব অসুখ। ওঝা এসে বললো একটা ছাগল বলি দিতে হবে। মোড়লের বাড়ির সামনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে হবে ছাগলটাকে। মোড়লের ছাগলের পাল থেকে কালো একটা ছাগল ধরে এনে তার বাড়ির সামনে খুঁটিতে বাঁধা হলো। তারপর চারপাশে আর নিচে শুকনো ডাল রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো। পুড়ে ছাই হয়ে গেল ছাগলটা। ওই ছাই গরম গরম খানিকটা নিয়ে, একটা ব্যাঙ থেঁতলে তার রস নিয়ে মেশালো ওঝা। সেই ওষুধ খেতে দিলো মোড়লকে।'

'ব্যাটারা আস্ত পিশাচ!' বলে উঠলো মুসা। 'তারপর? মোড়ল ভালো হলো?'

'নাহ্। অসুখ আরও যেন বাড়লো। ভীষণ ব্যথা। হাত-পা কাঠের মতো শক্ত হয়ে গেছে। ওঝাকে শাসিয়েছে মোড়লের ছেলে, তার বাপ মরলে ওঝাকেও মরতে হবে।'

'ওঝা ভয় পেয়েছে?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো।

'পেয়েছে। বলছে, তার ওষুধের কোনো দোষ নেই। দোষটা গাঁয়ের লোকের, কারণ তারা তার ওষুধে বিশ্বাস রাখেনি। তাছাড়া ছাগলটা পেয়ে গেছে ওরা খুবই সহজে। আরও কঠিন কিছু দরকার। যেটা পাওয়া অত্যন্ত কঠিন।'

'সেটা কি? নিশ্চয় চিতাবাঘ?'

মাঝা ঝাঁকালো কাকামি। 'ওঝা বললো, মোড়ল সাধারণ মানুষ নয়, এতো বড় একটা গাঁয়ের নেতা। ছাগলের বলিতে যখন তার রোগ সারেনি, নিশ্চয় তার প্রাণের বিনিময়ে অন্য কিছু চায় দেবতা। অনেক ভাবনাচিন্তার পর ওঝা ঠিক করলো, মোড়লকে চিতাবাঘের হৃৎপিণ্ড খাওয়ানো দরকার। আজকে সূর্য ডোবার আগে যদি একটা চিতাবাঘকে ধরে নিয়ে তার হৃৎপিণ্ড খাওয়ানো যায় মোড়লকে, তবেই শুধু তার অসুখ সারবে। তারপরে হলে হবে না।'

'ব্যাটা একটা মস্ত শয়তানী করেছে,' রবিন বললো। 'এতো সহজে চিতাবাঘ ধরা যায় না। ধরতে হলে হপ্তার পর হপ্তা, এমনকি কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে। সে-জন্যেই চালটা চেলেছে ধড়িবাজ ওঝা।'

'হ্যাঁ, শয়তানীটা করেছে ওঝা ইচ্ছে করেই। কঠিন একটা কাজ চাপিয়ে দিয়েছে গাঁয়ের লোকের ওপর, যাতে ওরা সেটা করতে না পারে। তাহলে ওঝার আর কোনো দোষ থাকবে না। সে বলবে, তোমাদেরকে ওষুধ আনতে বলে-ছিলাম, পারোনি, আমি কি করবো?'

'হুঁ, বুঝতে পারছি,' মাথা দোলালেন আমান। 'ওঝাটা বোধহয় ভিন্ গাঁয়ের?'

'হ্যাঁ, বাওয়ানা।'

'এ-জন্যেই সে জানতো না, কাছেই চিতাবাঘ রয়েছে, ধরাছোঁয়ার মধ্যেই। তাহলে অন্যকিছু বলতো। গাঁয়ের লোক জানে আমাদের এখানে দুটো চিতাবাঘের বাচ্চা রয়েছে। একটা ধরে নিয়ে গেছে মোড়লকে খাওয়ানোর জন্যে।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো মুসা। কোমরের খাপ থেকে একটানে বের করলো বড় হান্টিং নাইফটা। 'চিতাবাঘের হৃৎপিণ্ড খাওয়াচ্ছি আমি ব্যাটাকে। এই কাকামি, এসো।'

'থামো, মুসা, পাগলামি করো না!' বাধা দিলেন তার বাবা। 'একা ছুরি হাতে গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না তুমি। গুলি করে মারলেও পুলিশ এসে ধরবে। তার চেয়ে অন্য কিছু ভাবো।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। উঠে দাঁড়ালো। 'চলো, যাই। রবিন, ওষুধের বাক্সটা বের করো।'

'জলদি করো!' অস্থির হয়ে উঠেছে মুসা। 'এতোক্ষণে মেরেই ফেললো কিনা কে জানে!'

কাকামির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ী পথ ধরে ছুটে চললো গাঁয়ের দিকে।

দূর থেকেই কানে এলো কাঠের ঢাকের দিড়িম দিড়িম শব্দ। কোলাহল করছে গাঁয়ের লোকে। মেয়েরাই বেশি চেঁচামেচি করছে। নিশ্চয় অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা। তবে সব কণ্ঠ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে একটামাত্র কণ্ঠ, গলা

ফাটিয়ে চিৎকার করছে, নিশ্চয়ই ওঝা। বলির প্রস্তুতি চলছে। জোরে জোরে মন্ত্র পড়ছে সে।

চারপাশে কুঁড়ের সারি। মাঝখানে মস্ত উঠন। সেখানেই বলির প্রস্তুতি চলছে। ছুটে ভেতরে ঢুকে পড়লো তিন গোয়েন্দা। আরেকটু দেরি করলেই আর টরিকে জ্যান্ত পেতো না।

শক্ত করে মাটিতে পোঁতা রয়েছে একটা খুঁটি। তাতে পিঠ লাগিয়ে মানুষের মতো দাঁড় করিয়ে বাঁধা হয়েছে টরিকে। গলায়, বুকে আর পেছনের পায়ের হাঁটুর সামান্য নিচে দড়ির বাঁধন। থাবা দুটো সামনে ঝুলে রয়েছে অসহায় ভঙ্গিতে, অনেকটা মানুষের হাতের মতো। করুণ স্বরে মিউ মিউ করছে সে।

তার সামনে নাচছে ওঝা। মুখ আর শরীরে নানা রঙের আঁকিবুকি। কপালের সঙ্গে চামড়ার ফালি দিয়ে বাঁধা অ্যান্টিলোপ হরিণের শিং। তার পেছনে মাথার চারপাশ ঘিরে চামড়ার ফালির ভেতরে গুঁজে দেয়া হয়েছে ইগ্রেট আর উটপাখির পালক। সিংহের কেশর কেটে গলায় বেঁধে দেয়া হয়েছে। ফুলে থাকা কেশরগুলো ঠেলে রয়েছে চিবুক আর থুতনির কাছে, মনে হচ্ছে লম্বা দাড়ি গজিয়েছে।

তার গলায় একটা বিচিত্র মালা। কুমিরের দাঁতের ছড়া, আর লকেটটা একটা টিনের কৌটা। নাচার সময় দোল খায় হার, দাঁতগুলো টিনের গায়ে বাড়ি লেগে ঝনঝন করে। এটা করেছে পরিবেশটাকে অবাস্তব আর ভারি করে তোলার জন্যে।

গলায় আরও একটা মালা আছে, হায়েনার নখের। কোমরে জড়ানো শুধু একটুকরো জিরাফের চামড়া। তার নগ্ন পা আর শরীরে কুমিরের চর্বি মাখানো, বিশ্রী গন্ধ ছড়াচ্ছে।

লাফাচ্ছে, বাঁকা হচ্ছে, শরীর মোচড়াচ্ছে, চেঁচাচ্ছে সে। হাতের ছুরিটা চমকাচ্ছে সকালের রোদে। বার বার ছুরির মাথাটা খোঁচা মারার ভঙ্গিতে নিয়ে আসছে ভীত চিতা-শিশুর মুখের কাছে।

বলির পশু আর ওঝাকে ঘিরে নাচছে গ্রামবাসীরা। সুর করে দুর্বোধ্য মন্ত্র পড়ছে, প্রার্থনা করছে, চিৎকার করছে সমানে। ওদের পেছনে মুগুর দিয়ে ফাঁপা গাছের গুঁড়িতে বাড়ি মারছে ঢাক বাদকরা। ওই গাছের গুঁড়িগুলোই ঢাক।

টরির বিপদ দেখে নিজের বিপদের কথা ভাবলো না মুসা। নর্তকদের সারির ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়লো। কোমর থেকে খুলে নিলো ছুরিটা। সোজা গিয়ে টরির বাঁধন কেটে দিয়ে কোলে তুলে নিলো চিতাশিশুকে। তার বাহুতে মুখ গুঁজে কুঁই কুঁই করতে লাগলো ওটা।

তার পাশে চলে এলো রবিন, কিশোর আর কাকামি। আচমকা থেমে গেছে সমস্ত হট্টগোল। তাজ্জব হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গ্রামবাসীরা, হাঁ হয়ে গেছে। অলৌকিক ক্ষমতাবলে ওঝা নিশ্চয়ই এখন বিদেশীগুলোকে খতম করে দেবে, সেই অপেক্ষাই করছে ওরা।

ওঝার চোখে বিষ দৃষ্টি। মুসার চোখে চোখে তাকালো। ছেলেটা লম্বায় তার চেয়ে ইঞ্চিখানেক বড়ই হবে। বিশাল বুকের ছাতি। শক্ত হয়ে আছে হাতের পেশি। ছুরিটা এখন হাতে নেই, কোমরে গুঁজেছে আবার।

ওঝার উদ্দেশ্য আন্দাজ করে ফেলেছে মুসা, লোকটার ছুরি তোলা দেখেই তাড়াতাড়ি টরিকে কাকামির হাতে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। পা ফাঁক করে রেখেছে আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে। ছুরি মারার জন্যে ওঝা ছুটে আসতেই খপ করে তার কব্জি চেপে ধরলো সে। জোরে এক মোচড় দিতেই ককিয়ে উঠলো ওঝা, ছুরিটা খসে গেল আঙুলের ফাঁক থেকে। এক ধাক্কায় তাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে কিশোরের দিকে তাকালো।

গ্রামবাসীদের দিকে তাকিয়ে কিশোর বললো, 'আমি মোড়লের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

ইংরেজি বোঝে না গাঁয়ের লোকে। তার দিকে তাকিয়ে রইলো। সোয়াহিলি ভাষায় অনুবাদ করে দিলো কাকামি।

ঝাঁজালো কণ্ঠে ওঝা জাবাব দিলো, 'সে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। খুব অসুখ।'

টরিকে যে খুঁটিতে বাঁধা হয়েছিলো তার পেছনের কুঁড়েটার দিকে তাকালো কিশোর। গাঁয়ের সব কুঁড়ের চেয়ে এটাই বড়। দু'হাতে ভিড় ঠেলে কুঁড়ের বন্ধ দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো সে। ঠেলা দিয়ে খুললো। ঢুকে পড়লো ভেতরে। তার পেছনে ঢুকলো ওষুধের ব্যাগ হাতে রবিন, মুসা, আর টরিকে নিয়ে কাকামি। ওদের পেছনে ঢুকলো ওঝা, তার পরে গাঁয়ের লোক। দেখতে দেখতে ভরে গেল ঘরটা।

খড়ের একটা বিছানায় শুয়ে আছে মোড়ল। সেই সর্দার লোকটা, রাতের বেলা যার সঙ্গে খুনী চিতাবাঘকে খুঁজতে বেরিয়েছিলো তিন গোয়েন্দা আর মিস্টার আমান। দুর্বল ভঙ্গিতে একটা হাত তুলে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা?'

'হ্যাঁ আমরা,' জবাব দিলো কিশোর। লোকটা ইংরেজি বোঝে, কাজেই অসুবিধে হলো না কথা বলতে। 'বাচ্চাটাকে মেরে ফেলার অনুমতি দিলেন কেন?'

'এটা ওর বুদ্ধি,' ওঝাকে দেখালো মোড়ল। লোকটার ওপর খুব একটা সন্তুষ্ট বলে মনে হলো না। 'আমি এসব করতে বলিনি। আমি জানলাম ক্যাম্প থেকে বাচ্চাটাকে চুরি করে আনার পর। কাজটা মোটেই ঠিক করেনি। হাজার হোক, মানুষখেকোটাকে মেরে গাঁয়ের লোকের উপকার করেছো তোমরা।'

'আশ্চর্য! উপকারের প্রতিদান এভাবে দেয় মানুষ?' না বলে পারলো না মুসা।

'অন্যায় করেছে ওরা,' স্বীকার করলো মোড়ল। 'যা ভাবছো, ততোটা খারাপ নয় আমাদের গাঁয়ের মানুষ। আসলে ওরা আমাকে ভালোবাসে। তাই আমাকে বাঁচানোর জন্যেই একাজ করেছে। ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না।'

'আপনি থামালেই পারতেন?'

'চেষ্টা করেছি। শোনেনি। ওরা চায় আমি ভালো হয়ে উঠি। তাছাড়া, সত্যি কথাটাই বলি, ততোটা জোর দিয়ে আমিও ওদেরকে নিষেধ করিনি। কে না বাঁচতে চায় বলো? ওঝা বললো, একটা চিতাবাঘের হৃৎপিণ্ড খেলেই ভালো হয়ে যাবো। ভাবলাম, যেটাকে এনেছে মেরে ফেলুক। পরে তোমাদেরকে আরেকটা বাচ্চা ধরে দেবো, তাহলেই হবে। এদেশে চিতাবাঘের তো আর অভাব নেই। আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছো নিশ্চয়?'

হাসলো কিশোর। মোড়লের হাতটা ধরে মৃদু চাপ দিলো। 'পারছি। মরতে আমিও চাই না। কিন্তু এরকম ফালতু একটা ব্যাপার কি করে বিশ্বাস করলেন? আপনি শিক্ষিত মানুষ। কি করে ভাবলেন একটা চিতাবাঘের হৃৎপিণ্ড সারিয়ে তুলবে আপনাকে? এ-তো পুরনো কুসংস্কার।'

চোখ বন্ধ করে আবার খুললো মোড়ল। শান্তকণ্ঠে বললো, 'সব পুরনো রীতিনীতিই যেমন ভুল নয়, তেমনি আধুনিক সব কিছুই শুদ্ধ নয়। কুসংস্কার তোমাদের মধ্যেও আছে। আমেরিকার মতো দেশেও আছে।'

ছেলেকে বোঝাচ্ছে যেন বাবা, এমনি ভঙ্গিতে কথাটা বললো মোড়ল।

অস্বীকার করতে পারলো না কিশোর, 'তা আছে। অনেক কিছুই শেখার আছে এখনও মানুষের। আমেরিকানদেরও অনেক কিছু শেখার আছে আফ্রিকানদের কাছ থেকে। যা-ই হোক, ওসব আলোচনার সময় এটা নয়। জিনিস নিয়ে এসেছি আপনার জন্যে।' রবিনের হাত থেকে কালো বাক্সটা নিলো সে।

'কি আছে ওটাতে?'

'ওষুধ। আমি ডাক্তার নই। দুর্গম এলাকায় এসেছি। অসুখে পড়লে ডাক্তার পাবো না। তাই একজন আরেকজনকে যাতে কিছুটা সাহায্য করতে পারি, সে-জন্যে জরুরী কিছু ওষুধ সঙ্গে রাখি। গায়ে তো অনেক জ্বর আপনার। দেখি, কতো আছে?'

সামান্য একটু মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিলো মোড়ল।

কিন্তু ব্যাগ খুলে কিশোর থার্মোমিটারটা বের করতেই জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগলো ওঝা। দ্রুত বললো কিছু।

সেটা অনুবাদ করে শোনালো কাকামি, 'ও বলছে, এই জিনিস নাকি চেনে। এটাতে বিষ ভরা রয়েছে। মোড়লকে মেরে ফেলবে।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ওঝাকে ধমক দিলো মোড়ল। কিশোরের হাত থেকে নিয়ে থার্মোমিটারটা নিজেই মুখে পুরে দিলো।

রুমাল বের করে তার কপালের ঘাম মুছে দিলো কিশোর। অসুস্থ মানুষটার নাড়ি টিপে ধরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলো। নাড়ি দেখা শেষ করে মুখ থেকে থার্মোমিটারটা বের করে বললো, 'খারাপ তো লাগবেই। একশো তিন

জ্বর। নাড়ির গতি নব্বই। কখন থেকে শুরু হয়েছে এটা?'

'মাঝরাত থেকে।'

'তার আগে?'

'মাথা ধরা ছিলো। শীত শীত লাগছিলো। এতো জোরে কাঁপছিলাম, মনে হচ্ছিলো গুঁড়ো হয়ে যাবো। সবাই বলছিলো গরম লাগছে, অথচ আমার মনে হচ্ছিলো প্রচণ্ড শীতকাল।'

'খিদে আছে?'

মাথা নাড়লো মোড়ল। বিকৃত করে ফেললো মুখচোখ। 'খাওয়ার কথা ভাবলেই বমি আসে। কি করে যে হৃৎপিণ্ডটা খেতাম! জানি, খাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে আসতো। বেঁচেছি।'

'ব্যথা আছে?'

'সারা গায়ে। হাড়ের জোড়ায় জোড়ায়। কোথায় যে নেই সেটাই বুঝতে পারছি না।'

'মনে হচ্ছে, ম্যালেরিয়ায় ধরেছে আপনাকে। অ্যাটাকটা খুব বেশি।'

ব্যাগ থেকে ছোট একটা পুস্তিকা বের করলো কিশোর। ম্যালেরিয়া লেখা পৃষ্ঠাটা বের করে পড়লো। তারপর বের করলো দুটো শিশি। একটাতে লেখা রয়েছে প্যালোড্রিন, আরেকটাতে কুইনিন। প্রথমটা থেকে একটা বড়ি নিলো, দ্বিতীয়টা থেকে দুটো। ওঝা সব চেয়ে কাছাকাছি রয়েছে। তাকে বললো, 'এক গেলাস পানি।'

ঝটকা দিয়ে মুখ সরিয়ে নিলো ওঝা। কাকামি বেরিয়ে গিয়ে গাঁয়ের কুয়া থেকে উটপাখির ডিমের খোসায় করে পানি নিয়ে এলো। সাগ্রহে ট্যাবলেটগুলো নিয়ে পানি দিয়ে গিলে ফেললো মোড়ল। ওঝার প্রতিবাদে কানই দিলো না।

'এবার ঘুমানোর চেষ্টা করুন,' মোড়লকে বললো কিশোর। 'কয়েক ঘণ্টা পর আবার আসবো। আশা করি ততোক্ষণে অনেকটা ভালো হয়ে যাবেন।'

'কিন্তু ভালো না হলে আমার লোকেরা ক্ষতি করবে তোমার। আর না আসাই ভালো।'

'আমি আসবো।' উঠে কুঁড়ে থেকে বেরোতে গেল কিশোর।

মুসার হাতে এখন টরি। হঠাৎ তার হাত থেকে বাচ্চাটাকে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করলো ওঝা। জোর করে ধরে রাখলো সেটা মুসা। তারপর কাকামির হাতে দিয়ে ছুরি বের করতে গেল আবার।

'না না,' তাড়াতাড়ি বাধা দিলো কিশোর। 'আমরা মাত্র চারজন। চল্লিশজনের সঙ্গে পারবো না। টুকরো টুকরো করে ফেলবে আমাদেরকে। কাকামি, কি বলছে ব্যাটা?'

'বলছে, বাচ্চাটাকে রেখে যেতে। মোড়ল ভালো হয়ে গেলে ফেরত দেবে,

নইলে দেবে না। ওটাকে মেরে তখন হৃৎপিণ্ড খাওয়াবে।'

রাগে জ্বলে উঠলো মুসা, 'নিজের হৃৎপিণ্ড খাওয়াক না হারামজাদা!'

'তর্ক করে লাভ হবে না, মুসা। দিয়েই দাও। নইলে ছাড়বে না আমাদেরকে। মোড়ল অসুস্থ, তার জায়গায় রয়েছে এখন তার ছেলে। সে নিশ্চয় ইংরেজি পড়েনি। বাপের কথা না শুনে ওঝার কথাই শুনবে। টরিকে রেখেই যেতে হবে। তারপর তার কপাল ভালো হলে মোড়ল সেরে উঠবে।' মোড়লের দিকে তাকিয়ে কিশোর বললো, 'কয়েক ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে তো?'

'দেখবো চেষ্টা করে, বাঁচাতে পারি কি না। আমার কথা এখন আর শুনবে বলে মনে হয় না। তবু ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করবো,' মোড়ল বললো।

টরিকে রেখে ফিরে চললো তিন গোয়েন্দা আর কাকামি। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার সময় হঠাৎ একটা ঢিল এসে পড়লো মুসার পিঠে। ঝট করে ফিরে তাকিয়ে দেখলো কেউ নেই, শুধু একটা ঝোপের ডাল নড়ছে।

'থাক, কিছু বলো না,' কিশোর বললো, 'চলে এসো। নিশ্চয় ওঝাটা। হাতে বিষমাখানো তীর থাকতে পারে। চলো।'

'ব্যাটাকে কায়দামতো পেলে হয় একবার!' দাঁতে দাঁত চাপলো মুসা।

তিনটের সময় আবার গাঁয়ে এলো ওরা। নারী-পুরুষ-শিশুরা হাসিমুখে স্বাগত জানালো ওদেরকে।

'নিশ্চয় ভালো হয়েছে,' কিশোর বললো।

এখনও তেমনি ভাবেই খড়ের বিছানায় শুয়ে রয়েছে মোড়ল। তবে রোগযন্ত্রণা আর নেই। চোখ উজ্জ্বল। কিশোরদেরকে দেখে হেসে হাত বাড়িয়ে দিলো, 'অনেক ভালো হয়ে গেছি। এখন শুধু দুর্বল লাগছে, আর কিছু না।'

জ্বর মাপলো কিশোর। চার ডিগ্রি কমেছে। নাড়ি দেখলো। একেবারে স্বাভাবিক। শীত শীত লাগা আর মাথাব্যথাও সেরে গেছে।

উদ্বিগ্ন হয়ে চারপাশে তাকাচ্ছে মুসা।

বুঝতে পারলো মোড়ল। একটা লোককে ডেকে আদেশ দিলো, 'বাচ্চাটা দিয়ে দাও।'

টরিকে এনে মুসার হাতে তুলে দিলো লোকটা।

মোড়ল ভালো হয়ে যাওয়ায় এখন সবাই খুশি, একজন বাদে। সে ওঝা। অত্যন্ত বাজে একটা দিন কেটেছে তার জন্যে। লোকে তাকে দেখলে মুখ টিপে হাসে। তার যাদুবিদ্যার ওপর আর কারো আস্থা নেই। ছাগল বলি দিয়ে মোড়লকে ভালো করতে পারেনি। চিতাবাঘের বাচ্চা হাতে পেয়েও বলি দিতে পারেনি, তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। তিনটে ছেলেকে পর্যন্ত ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে তার যাদুর জোর। অথচ ওই ছেলেগুলোই দিব্যি সারিয়ে তুললো মোড়লকে। ওদের কাছে ওঝার এটা বিরাট পরাজয়।

রাগে জ্বলছে সে। যাকে পাচ্ছে তাকেই কর্কশ গলায় কি কি যেন বলছে।

'কি বলছে?' কাকামিকে জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'বলছে, মোড়লের অসুখ সারেনি। এটা আসলে মৃত্যুর আগের শেষ চমক। ওই যে বাতির আগুন নেভার আগে দপ করে জ্বলে ওঠে। আকাশ থেকে তারা খসে পড়ার আগে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লোকদের বোঝাচ্ছে, মোড়ল মারা যাবেই। তোমরা ওদেরকে শাদা বিষের বড়ি খাইয়ে মারার পরিকল্পনা করেছো। কাঁচের যে শলাটা মুখে ঢুকিয়েছো চোষার জন্যে…'

'থার্মোমিটারের কথা বলছে হাঁদাটা,' মুসা মুচকি হাসলো।

'হ্যাঁ। বলছে, ওটার ভেতরে রয়েছে মারাত্মক বিষ। ওই বিষ খেলে প্রথমে মানুষ ভালো হয়ে ওঠে, তারপর মারা যায়। মোড়ল মরবেই। তার প্রেতাত্মা গাঁয়ের লোককে ভীষণ শাস্তি দেবে, কারণ ওরা ওঝাকে বিশ্বাস করেনি।'

'লোকে বিশ্বাস করছে?'

'দোটানায় পড়ে গেছে ওরা। যতোক্ষণ মোড়ল সুস্থ থাকবে, তোমাদেরকে কিছু বলবে না। কিন্তু যদি মারা যায়, মহাবিপদে পড়ে যাবে তোমরা। ওদের চোখে তখন আবার ওঝা বড় হয়ে যাবে।'

'আর আমরা ছোট হয়ে যাবো।'

'হ্যাঁ। ইঁদুরের মতো মারবে তখন তোমাদের।'

মোড়লকে আরেক ডোজ ওষুধ খাওয়ালো কিশোর। একটা প্যালোড্রিন, আর দুটো কুইনিন। দরজায় গোলমাল শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখলো, ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে ডিগা। পাহাড় বেয়ে দৌড়ে আসার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। কুঁড়েতে ঢুকে বললো, 'বাওয়ানা…মোষ…অনেক!'

এর বেশি আর শোনার প্রয়োজন মনে করলো না কিশোর। ক'দিন ধরেই মোষের ওপর চোখ রাখা হচ্ছে। লস অ্যাঞ্জেলেসের চিড়িয়াখানা তিনটে সুন্দর মোষ চেয়েছে। মোড়লের দিকে ফিরে বললো, 'আমাকে এখন যেতে হবে। আবার এসে দেখে যাবো।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, বাবা।' মোড়লের কৃতজ্ঞ কণ্ঠস্বর আর হাসি যেন শীতল পরশ বোলালো কিশোরের শরীরে। তার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক মনে হলো ওই মুহূর্তে।

দরজার দিকে এগোলো ওরা। জনতার গুঞ্জনকে ছাপিয়ে শোনা গেল ওঝার তীক্ষ্ণ, কর্কশ কণ্ঠ। অনুবাদ করে দিলো কাকামি, 'বলছে, মোড়ল মরবে! মোড়ল মরবে!'

'আর তা হলে তার চেয়ে বেশি খুশি বোধহয় আর কেউ হবে না,' বিড়বিড় করলো কিশোর।

এগারো

মোট তিনটে মোষ ধরা পড়লো। আরও ধরতে পারতো ওরা, কিন্তু প্রয়োজন নেই। তিনটেই চেয়েছে লস অ্যাঞ্জেলেস চিড়িয়াখানা।

রাতের খাবারের আগে আর বেরোতে পারলো না তিন গোয়েন্দা। খাওয়ার পর বেরোলো। পাহাড়ী পথ ধরে উঠতে লাগলো গাঁয়ের দিকে। মোড়লকে দেখতে যাচ্ছে। কথা দিয়েছিলো, আবার আসবে।

যার যার ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে গাঁয়ের লোক। কোনো কোনো কুঁড়ের ছোট জানালায় প্রদীপের ম্লান আলো কাঁপছে, ওসব ঘরে লোক জেগে আছে। আর যেগুলো অন্ধকার, ওগুলোর বাসিন্দারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিঃশব্দে এগোলো তিন গোয়েন্দা। গ্রামবাসীদের জাগিয়ে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ওঝার সাথে আরেকবার মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে নেই ওদের।

মোড়লের দরজার কাছে এসে থামলো ওরা। ভেতরের কথা শোনার জন্যে কান পাতলো কিশোর। কোনো সাড়া নেই। আস্তে করে দরজার পাল্লায় হাত লাগিয়ে ঠেলা দিলো। ঢুকে পড়লো ভেতরে। মুসা আর রবিন ঢুকলো তার পেছনে।

ঘরে বানানো প্রদীপের মৃদু আলো জ্বলছে। আলোর চেয়ে অন্ধকারই বেশি। অসংখ্য ছায়া নাচছে ঘরের দেয়ালে। বাতাসে জলহস্তীর চর্বির গন্ধ, প্রদীপের জ্বালানী তেলের। ঘুমে অচেতন হয়ে আছে মোড়ল। তার প্রায় পুরো শরীরটাই অন্ধকারে, মুখটা শুধু দেখা যাচ্ছে আবছামতো।

ঘুমই এখন সব চেয়ে প্রয়োজন মানুষটার, ভাবলো কিশোর। থাক, জাগিয়ে দিয়ে বিরক্ত করে লাভ নেই।

তবু, আপনাআপনি যদি জেগে যায় মোড়ল, এই আশায় কিছুক্ষণ বসবে ঠিক করলো সে। মুসা আর রবিনকে নিয়ে চলে এলো ঘরের অন্ধকার কোণে। মাদুরের ওপর বসে পড়লো।

মোড়লের ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস। ওষুধে ভালো কাজ হয়েছে।

বসে বসে সারাদিনের ঘটনাগুলো ভাবতে লাগলো ওরা। চোখ জড়িয়ে আসছে মুসার। কিশোরের চোখেও ঘুম। রবিনেরও। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর ঘড়ি দেখলো কিশোর। এর মধ্যে ঘুম ভাঙলো না মোড়লের, একবার নড়েওনি। আর বসে থাকার মানে হয় না। সকালের আগে ঘুম ভাঙবে না মোড়লের।

উঠতে যাবে, এই সময় হালকা পায়ের শব্দ কানে এলো ওদের। কেউ আসছে। বসে পড়লো আবার। চুপ করে রইলো।

আস্তে, নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। খুব সাবধানে ঢুকলো একটা মূর্তি। হয়তো মোড়লের অনেক স্ত্রীর একজন, খাবার নিয়ে এসেছে।

নিঃশব্দে আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ঘুমন্ত মোড়লের দিকে এগোলো মূর্তিটা। অন্ধকার থেকে আলোয় বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ওকে চিনতে পারলো তিন গোয়েন্দা। ওঝা! বাঁ হাতে ছোট একটা চামড়ার থলে, ডান হাতে চোখা শিকের মতো একটা জিনিস।

মোড়লের পাশে গিয়ে প্রদীপের দিকে মুখ করে বসে পড়লো লোকটা। তার মুখ দেখা যাচ্ছে এখন। অবাক হয়ে ভাবলো কিশোর, হিংস্র জানোয়ারের চেয়ে হিংস্র মানুষের মুখ এতো কুৎসিত দেখায় কেন?

কেন এসেছে ওঝা? ক্ষতি করতে? নাকি মোড়লকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তার নিজের তৈরি ওষুধ খাওয়াতে?

ঘুমন্ত মোড়লের দিকে তাকিয়ে পুরো একটা মিনিট চুপ করে বসে রইলো ওঝা। তারপর চোখা শলার মাথাটা আস্তে করে রাখলো মোড়লের বাহুতে।

জাগলো না মোড়ল। হঠাৎ বুঝে ফেললো কিশোর, জিনিসটা কি? আফ্রিকায় এগুলোকে বলে চুক। একধরনের শজারুর কাঁটা। মাথাটা এতো চোখা, চামড়ায় ঢুকে গেলেও তেমন ব্যথা লাগে না। অনেকটা ইনজেকশনের সুচের মতো।

কাঁটাটা দিয়ে নিশ্চয় মোড়লের চামড়ায় ফুটো করছে ওঝা। কিন্তু কেন?

কাজ শেষ করে কাঁটাটা নামিয়ে রাখলো ওঝা। ব্যাগ খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিলো। আবার যখন বের করলো, এক আঙুলের মাথায় দেখা গেল কালো কিছু লেগে রয়েছে, ময়দার লেইয়ের মতো ঘন। জিনিসটা চামড়ার ফুটোয় ঘষতে যাবে, এই সময় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো কিশোর। চেঁচিয়ে বললো, 'এই, কি করছেন?'

ইংরেজিতে বলেছে কিশোর। কথাটা বুঝলো না ওঝা, তবে চিৎকারটাই যথেষ্ট। বরফের মতো জমে গেল যেন সে। মোড়লও জেগে গেল।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এসেছে তিন গোয়েন্দা। ওদেরকে দেখে উঠে বসলো মোড়ল। ওঝাকে দেখলো। মাটিতে পড়ে থাকা চুকটা দেখলো। বুঝে ফেললো যা বোঝার।

চমকটা দ্রুত কাটিয়ে উঠলো ওঝা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো পালানোর জন্যে। ঝাপটে ধরলো তাকে মুসা। রবিন আর কিশোরও দু'দিক থেকে হাত চেপে ধরলো। আটকা পড়লো ওঝা।

প্রথমে কিশোরের চিৎকার, তারপর ঘরের মধ্যে এই হুটোপুটি গ্রামবাসীদের কানে গেল; মোড়লের কুঁড়ের কাছাকাছি যাদের কুঁড়ে রয়েছে, তাদের। কি হয়েছে দেখতে বেরোলো ওরা। মোড়লের দরজা খুলে উঁকি দিলো ভেতরে।

ওঝাকে ধরে রেখেছে তিন কিশোর, দৃশ্যটা অবাক করলো ওদেরকে। ভেতরে

এসে ঢুকলো। লোকজন দেখে ওঝাকে ছেড়ে দিলো তিন গোয়েন্দা। আবার দরজার দিকে রওনা হলো ওঝা।

'ধরো, ধরো ব্যাটাকে!' আদেশ দিলো মোড়ল। 'নিয়ে এসো এখানে!'

দরজা আগলে দাঁড়ালো লোকেরা। ওঝাকে বেরোতে দিলো না বটে, তবে তার গায়ে হাত দেয়ারও সাহস করলো না। শেষে তিন গোয়েন্দাই টেনে নিয়ে এলো ওকে মোড়লের কাছে।

একধরনের নীরবতা নেমে এলো ঘরের ভেতর, আদালত কক্ষে যেমন থাকে খুনীর বিচারের রায় ঘোষিত হওয়ার আগে।

'এই লোকটা,' শান্তকণ্ঠে বললো মোড়ল, 'আমাকে খুন করতে এসেছিলো। এই যে দেখ, চুক,' গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলছে সে। 'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। ঘুমের মধ্যেই আমার হাতে ফুটো করেছে এটা দিয়ে, এই যে দেখ। আর ওর ডান হাতের আঙুলে দেখ, কালো জিনিস লেগে আছে।' মেঝেতে পড়ে থাকা চামড়ার থলেটা দেখিয়ে বললো, 'এর মধ্যে দেখ, কালো আঠার মতো জিনিস পাবে।'

এগিয়ে এসে থলেটা খুললো একজন বয়স্ক লোক। একটা কাঠি নিয়ে ঢুকিয়ে দিলো থলের ভেতরে। কালো আলকাতরার মতো জিনিস লেগে গেল কাঠির মাথায়। ওঝার আঙুলে লেগে থাকা কালো জিনিসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলো সেটা। একই জিনিস বুঝে মাথা ঝাঁকালো।

'কি ওটা জানো?' জিজ্ঞেস করলো মোড়ল।

'বিষ-টিষ নাকি?' মুসা জানতে চাইলো।

'হ্যাঁ। কিশোর, আরেকবার বাঁচালে আমাকে। নইলে এতোক্ষণে আমার লাশ দেখতে পেতে তোমরা।'

'এতোই মারাত্মক?' মুসার প্রশ্ন। 'জিনিসটা কি?'

'বোধহয় বুঝতে পারছি,' মাথা ঝাঁকালো রবিন। 'মৃচু গাছের রস থেকে তৈরি, তাই না?' মোড়লের দিকে তাকিয়ে বললো সে। 'তীরের মাথায় মাখান আপনারা।'

'হ্যাঁ।' কিছুটা অবাকই মনে হলো মোড়লকে। 'অনেক কিছু জানো দেখছি।'

'এ-জিনিস আগেও দেখেছি আমি,' কিশোর বললো, 'ল্যাবরেটরিতে, অ্যাকোক্যানথেরা বলে। এই গাছের নিচে সব সময়ই প্রচুর পোকামাকড়, প্রজাপতি আর হামিং বার্ড মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়।'

'হ্যাঁ। মৃচুর লাল ফুল থেকে মধু খেতে আসে ওগুলো। বিষ খেয়ে মারা যায়।'

'তীরে লাগানোর জন্যে বিষটা বের করেন কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'মৃচু গাছের বাকল কেটে এনে কয়েক ঘণ্টা ধরে জ্বাল দিয়ে ঘন সিরা তৈরি করি। তার সঙ্গে সাপের বিষ, মাকড়সার বিষ আর বিষাক্ত গাছ গাছড়ার রস মেশাই। তারপর তাতে একটা জ্যান্ত ছুঁচো ফেলে দিয়ে আবার জ্বাল দিতে থাকি।'

'বিষটা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে কিনা কি করে বোঝেন?'

'মানুষের বাহুতে কাঁধের কাছাকাছি একটা ফুটো করি। হাত বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে দিই। খানিকটা বিষ নিয়ে ওই রক্তে লাগাই। বিষের ছোঁয়ায় কালো হয়ে যায় রক্ত। রক্তের ধারা বেয়ে কালো রঙ উঠতে থাকে ওপরের দিকে। যদি জখমের কাছে পৌছার আগেই কালো হওয়া থেমে যায়, তাহলে বুঝি বিষের ক্ষমতা কম। যদি খুব দ্রুত কালো হতে থাকে, আর জখমে পৌছার আগে না থামে, তাহলে বুঝি শক্তিশালী হয়েছে। জানোয়ার মরবে।'

কথার ফুলঝুড়ি ছোটালো ওঝা। সে থামলে তিন গোয়েন্দাকে বুঝিয়ে দিলো মোড়ল, 'ও বলছে, ওর ব্যাগে বিষ নেই। ভালো ওষুধ। বেশ, দেখি পরীক্ষা করে।'

বয়স্ক লোকটা, যে থলে খুলেছে তাকে কিছু বললো মোড়ল। মাটি থেকে চুকটা তুলে নিলো লোকটা। ওঝার তুমুল প্রতিবাদে কান না দিয়ে তার হাতের চামড়ায় জোর করে একটা ফুটো করলো। রক্ত বেরিয়ে এলো সরু ধারায়, বাহু বেয়ে নেমে এলো কনুইয়ের কাছে।

কাঠি দিয়ে কালো লেইয়ের মতো জিনিস তুলে সেই রক্তে লাগিয়ে দিলো বয়স্ক লোক্টা। সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে গেল রক্ত। অবিশ্বাস্য গতিতে উঠে যেতে লাগলো জখমের দিকে।

চেপে ধরে রাখা হয়েছে ওঝাকে। শরীর মুচড়ে, ঝাড়া দিয়ে ওদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে সে। চোখে আতঙ্ক। তাকে কিছু বললো মোড়ল। সেটা আবার অনুবাদ করে শোনালো তিন গোয়েন্দাকে, 'ওকে বললাম, জলদি স্বীকার করুক। নইলে মরবে।'

সর্পিল গতিতে ক্ষতের কাছে চলে যাচ্ছে বিষ। অর্ধেক গেল···আরও খানিকটা···ক্ষতের কাছে পৌছতে আর দেরি নেই। ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন ওঝার চোখ। শেষে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে ঢিল করে দিলো শরীরটা, কি যেন বললো।

মোড়লের আদেশে তার রক্ত মুছে ফেলা হলো। একেবারে পরিষ্কার করে দেয়া হলো, যাতে কোনোভাবেই জখমে বিষ না লাগে।

অনেক প্রশ্ন করা হলো ওঝাকে। জবাব দিলো সে। কি কি বলছে সেটা ইংরেজিতে তিন গোয়েন্দাকে শোনালো মোড়ল, 'সব স্বীকার করেছে সে। তোমাদের ক্ষমতাকে হিংসে করছিলো। তার সমস্ত যাদুবিদ্যার জোরেও আমাকে সুস্থ করতে পারেনি সে, অথচ তোমরা ছোট ছোট কয়েকটা শাদা বড়ি দিয়েই আমাকে সারিয়ে তুললে, এটা সহ্য হচ্ছিলো না তার। লোকে তাকে দেখে হাসাহাসি করেছে, মুখের ওপর টিটকারি দিয়েছে, এটা একজন ওঝার জন্যে অত্যন্ত অপমানের ব্যাপার। ওদের মুখ বন্ধ করার জন্যে তাই আমাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সে। আমাদের বাপ-দাদাদের আমলে হলে, এমনকি এখনও

আরও ভেতরের কোনো গাঁয়ে হলে এই অপরাধের জন্যে পুড়িয়ে মারা হতো তাকে। কিন্তু আমরা অতোটা নিষ্ঠুর নই। ছেড়ে দেবো। বলে দেবো, আর যাতে কোনোদিন এই গাঁয়ের ত্রিসীমানায় দেখা না যায় তাকে।'

রায় ঘোষণা করলো মোড়ল। জিনিসপত্র কুড়িয়ে নেয়ার সুযোগ দেয়া হলো ওঝাকে। তারপর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয়া হলো। শাসিয়ে দেয়া হলো, রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই যেন এই এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

ক্যাম্পে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা।

ভালো ঘুম হলো না কিশোরের। একটা অস্বস্তি খচখচ করছে মনের মধ্যে। তার মনে হচ্ছে, এটাই শেষ নয়। এতো সহজে ছেড়ে দেবে না ওঝা। প্রতিশোধ নেয়ার চেষ্টা করবেই। আবার কোনো শয়তানী চাল চালবে। মোড়লের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ওঝার চোখে তীব্র ঘৃণা দেখতে পেয়েছে সে।

বারো

অন্ধকার রাত। যেতে হবে বিপজ্জনক পথ দিয়ে। যেখানে-সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে সিংহ, হাতি কিংবা বুনোমোষ। মানুষ দেখলেই আক্রমণ করতে পারে।

সেই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রতিশোধের জ্বালায় জ্বলে মরছে ওঝা। যে করেই হোক–মুঠো শক্ত করলো সে, যে ভাবেই হোক, বিদেশীগুলোকে বুঝিয়ে দিতে হবে, তার মতো ক্ষমতাশালী একজন ওঝার সঙ্গে লাগতে আসার পরিণাম ভালো হয় না।

রাগে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরছে সে, তা নয়। জানে কোথায় যাবে। তার গাঁয়ে নয়। যাবে মাইল পাঁচেক দূরের একটা জায়গায়। এক টুকরো বনের ভেতরে ওখানে আলো জ্বলছে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে ওখানেই চলেছে ওঝা।

বনের কিনারে এসে থেমে গেল সে। অনেক লোকের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। আলোচনায় বসেছে ওরা।

লোকগুলো কারা, ওঝা জানে। সে-ও ওদেরই একজন। লেপার্ড সোসাইটির একজন নেতা সে। তবে সোসাইটির নেতাও জানান না দিয়ে মিটিঙে ঢুকতে পারে না। তা করতে গেলে বিষাক্ত তীরের ঘায়ে মরতে হবে। আগে তীর ছুঁড়বে সোসাইটির লোকেরা, তারপর জানতে আসবে কে।

চিতাবাঘের কণ্ঠ নকল করে ডাকলো ওঝা। অনেক রকম ডাক ডাকে চিতাবাঘ, একেক সময় একেক রকম। নিশ্চয় ওদের ভাষায় একেক ধরনের শব্দের একেক মানে হয়। কখনও গর্জন করে, কখনও গোঁ গোঁ করে, তীক্ষ্ণ চিৎকার ছাড়ে, আর কখনও বা করাত দিয়ে কাঠ চেরার মতো খরখর আওয়াজ করে। ওঝাও সেরকমই করলো।

সাথে সাথে কথা থেমে গেল। লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এলো একজন। ওঝার মুখটা ভালোমতো দেখে নিয়ে শ্রদ্ধাভরে বললো, 'ও, আপনি। আসুন আসুন।'

আগুনের কুণ্ড জ্বেলে চারপাশে গোল হয়ে বসেছে লোকেরা। তাদের মধ্যে নেতারা বসেছে সামান্য উঁচু একটা জায়গায়। ওদের পাশে গিয়ে বসলো ওঝা। চিতাবাঘের ছালের একটা পোশাক নিয়ে আসা হলো তার জন্যে। সেটা পরলো সে।

এক অদ্ভুত দৃশ্য এখানে। মোট বিশজন মানুষ। সবার গায়ে চিতাবাঘের ছাল, মুখে বিচিত্র রঙের আঁকিবুকি, হাতের আঙুলে লোহার বাঁকা নখ, পায়ে চিতাবাঘের পায়ের পাতা বাঁধা। কাজেই হাঁটার সময় মাটিতে চিতাবাঘের পায়ের ছাপ পড়ে, মানুষের নয়।

যারা এদেরকে দেখেনি, এদের মিটিঙের খোঁজ রাখে না, তাদের কেউ হঠাৎ এখানে এসে পড়লে মনে হবে দুঃস্বপ্ন দেখছে। আসলে মোটেই স্বপ্ন নয় এটা, বাস্তব। মধ্য আর পশ্চিম আফ্রিকায় দেখা মিলবে লেপার্ড সোসাইটির লোকদের। আগে আরও ছড়ানো ছিলো। এখন পুলিশ ওদের কোণঠাসা করে ফেলেছে, গভীর বনে অথবা পাহাড়ের গোপন গুহায়ই শুধু এদের দেখা মেলে। যতদূর সম্ভব লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করে ওরা। লেপার্ড সোসাইটির অনেক সদস্য দলছুট হয়ে গিয়ে নতুন নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করছে ইদানীং। এই যেমন, ইডিঅং সোসাইটি, এক্‌পি লেপার্ডস। বহু নিরপরাধ নারী, পুরুষ, বাচ্চাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে ওরা।

কেন? এর নানান জবাব আছে। তবে সবই ওদের মনগড়া। কোনো গ্রাম বেশি ধনী আর শক্তিশালী হয়ে উঠছে হয়তো, তাদেরকে খুন করে দমিয়ে দেয়া হলো। কখনও শ্বেতাঙ্গদেরকে সাহায্য করার অপরাধে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়া হলো কোনো গ্রাম। এমনি সব কারণ। আরও আছে। সোসাইটির লোকদের অনেক সময় সাধনা করার জন্যে মানুষের হৃৎপিণ্ড, চোখ, জিভ, কান কিংবা মগজের দরকার হলো, ব্যস, রাতের অন্ধকারে শিকার করে নিয়ে এলো মানুষ। এসব শুনে মনে হবে হয়তো আফ্রিকা একটা ভয়ংকর জায়গা, এখানকার মানুষেরা সব নরপিশাচ, জংলী, অসভ্য। আসলে তা নয়। এখানকার বেশির ভাগ মানুষই খুব ভালো, ঠাণ্ডা স্বভাবের। প্রতি বছরই স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। প্রতি বছর কিছু কিছু করে নির্মূল হচ্ছে পুরনো কুসংস্কার। তবে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে পুরোপুরি সভ্য হতে আরও বহু বছর লেগে যাবে ওদের।

যারা স্কুলে যায়, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু এখনও দুর্গম অঞ্চলগুলোতে রয়ে গেছে যারা, তাদের নানা রকম অন্ধবিশ্বাস। অনেকেই বিশ্বাস করে চিতামানব নামে এক ধরনের প্রেতাত্মা আছে, যারা ইচ্ছে করলে মানুষের রূপ নিতে পারে, আবার ইচ্ছে করলেই চিতাবাঘ। একজন শক্তিশালী লোকের হৃৎপিণ্ড যে খাবে, সে-ও তার মতো শক্তিশালী হয়ে যেতে পারবে। কোনো বিদেশীকে, বিশেষ করে

শ্বেতাঙ্গকে বিশ্বাস করা যাবে না।

একজন নেতা বললো, 'আমাদের আরেকজন নেতা এসেছে দূর গাঁ থেকে। তার ইচ্ছের কথা শোনা যাক।'

উঠে দাঁড়ালো ওঝা। ও এমন একজন মানুষ, যাকে চিতামানবেরা পর্যন্ত ভয় পায়। কারণ তাদের বিশ্বাস অন্ধকার জগতের সঙ্গে যোগাযোগ আছে ওঝার, অনেক যাদু জানে, মারাত্মক বিপদে ফেলে দিতে পারে যখন তখন। কাজেই নীরবে তার কথা শোনার জন্যে তৈরি হলো সবাই।

'তোমাদের মধ্যে একজন রয়েছো,' শুরু করলো ওঝা, 'যে কথা দিয়েও কথা রাখোনি। খুন করবে কথা দিয়েছিলে, কিন্তু করোনি। তার নাম খামবু। তাকে উঠে দাঁড়াতে বলছি।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো খামবু। অন্য রকম লাগছে এখন তাকে দেখতে। বুকে মুখে রঙের বিচিত্র আঁকিবুকি, চিতাবাঘের ছালের পোশাকে এই আগুনের আলোয় ভয়ংকর লাগছে তাকে। কিন্তু ওঝার সামনে যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেল সে।

'এক হপ্তা আগে,' ওঝা বললো, 'তোমাকে চিতাদেবতার নামে হলফ করানো হয়েছিলো। একটা কাজ করার কথা দিয়েছিলে। বলো তো সেটা কি?'

অসহায় ভঙ্গিতে সঙ্গীদের দিকে তাকালো খামবু। ভয়ে তাকাতে পারছে না ওঝার চোখের দিকে। কাঁপা গলায় বললো, 'আমাকে বলা হয়েছিলো, সাফারির চারজন মানুষকে খুন করতে।'

'ওরা কারা?'

'একজনের নাম আমান। তার ছেলে মুসা। আর দু'জন সাদা আর বাদামি, রবিন আর কিশোর।'

'তোমার কথা রেখেছো?'

'চেষ্টা করেছি, জনাব। আমার সঙ্গেই নৌকায় উঠেছিলো ওরা। পানিতে জলহস্তী আর অনেক কুমির ছিলো। নৌকা উল্টে দিয়ে ওদেরকে পানিতে ফেলে জলহস্তী আর কুমিরের শিকার বানাতে চেয়েছি। বাপটা প্রায় মরে গিয়েছিলো, কিন্তু ছেলেগুলো খুব চালাক। বাঁচিয়ে ফেললো। এখনও ওদের বাপ অসহায় হয়ে পড়ে আছে বিছানায়।'

'ব্যস, এইই করেছো?'

'না, আরও চেষ্টা করেছি। মোষ ধরতে গিয়েছিলো ছেলেগুলো। একটা মদ্দা মোষ তাড়া করে বসলো। ওদের গাড়িটাকে এমন ভাবে রেখে দিলাম, যাতে মোষটা এসে গুঁতো মেরে গাড়ি উল্টে দিয়ে ওদেরকে মেরে ফেলে। মোষটা গাড়ি উল্টে দিলো ঠিকই, কিন্তু তার আগেই ছেলেগুলো নেমে সরে গেল নিরাপদ জায়গায়। বললাম না, ওরা বেশি চালাক।'

'দুই বার ব্যর্থতা,' গম্ভীর হয়ে বললো ওঝা। 'আর কিছু করেছো?'

'নিগ্রো ছেলেটাকে মোষের সামনে ফেলে পালিয়েছিলাম। যাতে মোষটা তাকে মেরে ফেলে।' দ্বিধা করলো খামবু।

'কাজ হয়েছে?'

'না, বরং আমিই মরতে বসেছিলাম। ওই ছেলেটাই আমার প্রাণ বাঁচালো। ও এগিয়ে না এলে এখন এখানে থাকতাম না আমি। দুর্দান্ত সাহসী ছেলে। সবাই ওরা ভালো। ওদেরকে খুন করতে পারবো না আমি। দোহাই আপনাদের, আমাকে রেহাই দিন।'

'না, তা হবে না,' ভীষণ হয়ে উঠলো ওঝার কণ্ঠস্বর। 'হয় তোমার কথা রাখবে, নয়তো মরবে।'

এই হুমকিতে বিশেষ কাজ হলো বলে মনে হলো না। ভয় যা পাওয়ার পেয়েছে খামবু, এর চেয়ে বেশি আর পাবে না। মরিয়া হয়ে চোখ তুললো সে, ওঝার চোখে চোখে তাকালো।

'আপনার যা ইচ্ছে করুন আমাকে। চারজনকে বাঁচাতে গিয়ে যদি আমার একটা প্রাণ যায়, যাক।'

'একটা নয়। তোমার বউ আছে। চারটে ছেলেমেয়ে আছে। কথা যা দিয়েছো, তা না রাখলে ছয়টা প্রাণ যাবে। তোমারটা সহ।'

আবার বুকের ওপর ঝুলে পড়লো খামবুর মাথা। পরাজয় মেনে না নিয়ে উপায় নেই, বুঝতে পারছে। ওর কথা শোনার অপেক্ষায় রয়েছে ওর সঙ্গীরা। নিঃশ্বাস ফেলতে যেন ভুলে গেছে সবাই। ওঝাও অপেক্ষা করছে। চকচক করছে চোখ। মুখে শয়তানী হাসি। বুঝে গেছে, সে জিততে চলেছে।

অবশেষে কথা বললো খামবু, মাথা তুললো না, 'বেশ, আরেকবার চেষ্টা করে দেখবো আমি।'

তের

'জিরাফ! জিরাফ!'

তাঁবুতে ঢুকে উত্তেজিত কণ্ঠে ঘোষণা করলো ডিগা।

সবে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। আরও কিছুক্ষণ ঘুমানোর ইচ্ছে ছিলো তিন গোয়েন্দার। সামনে একটা কঠিন দিন। বিশ্রামটা দরকার ছিলো। কিন্তু এই ঘোষণা শোনার পর ঘুম আর এলো না।

'কোথায়?' ঘুমজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ক্যাম্পের কাছেই। পাঁচটা।'

আমান আফসোস করে বললেন, 'আমি আসতে পারলে ভালো হতো। জিরাফ ধরা খুব কঠিন। দুটো ধরার চেষ্টা করবে, একটা মাদী, একটা মদ্দা। লস

অ্যাঞ্জেলেস চিড়িয়াখানা চেয়েছে।'

'চাক গিয়ে।' বালিশটা বুকের কাছে আঁকড়ে ধরলো মুসা। 'আমার ঘুমের চেয়ে বেশি দাম দেবে না নিশ্চয়।'

'পঁয়তিরিশ হাজার ডলার পেলে উঠবে?'

'খাইছে!' লাফ দিয়ে উঠে বসলো মুসা। বড় বড় হয়ে গেছে চোখ। এতো টাকা! কিশোর আর রবিন বিছানা থেকে নেমে গেছে আগেই। সে-ও নেমে কাপড় পরতে আরম্ভ করলো।

দুই মিনিটের মধ্যেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো ওরা।

ওই তো, ক্যাম্প থেকে বড়জোর পাঁচশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচটা চমৎকার জিরাফ। চারটে পূর্ণ বয়স্ক, আর একটা বাচ্চা। আর বাচ্চাটাই হবে সাত ফুট উঁচু। জন্মানোর সময়ই জিরাফের বাচ্চার উচ্চতা হয় ছয় ফুট।

গভীর আগ্রহে ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে রয়েছে জীবগুলো। কথায় বলে, বেড়াল মরে কৌতূহলে। এই কথাটা জিরাফের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বরং এরা বিড়ালের চেয়েও এক কাঠি বাড়া। কোনো কিছু সম্পর্কে এতো কৌতূহলী প্রাণী বোধহয় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

জিরাফের কৌতূহল নিয়ে একটা পুরনো উপকথা প্রচলিত আছে আফ্রিকায়। শুরুতে নাকি ঈশ্বর জিরাফকে লম্বা পা আর স্বাভাবিক ঘাড় দিয়েছিলেন। ওদের লম্বা পায়ের কারণে ঘাড় নামিয়ে ওরা মাটিতে কি ঘটছে দেখতে পেতো না। তাই ওরা গাছের ওপর দিয়েই উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো কি ঘটছে। টানতে টানতে, টানতে টানতে, অনেক লম্বা হয়ে গেল ঘাড়। আর যতোই টেনে উঁচুতে তোলে, ততোই স্পষ্ট হয় আশপাশের জগৎ। ফলে আরও টানতে লাগলো। শেষমেষ মাটি থেকে বিশ ফুট উঁচুতে উঠে গেল মাথা। অ্যাকাশে গাছের চ্যাপ্টা মাথার ওপর দিয়েই তখন মাটিতে কি ঘটছে দেখতে পেলো জিরাফ। ওরা নাকি এখনও গলা আরও লম্বা করার চেষ্টা করছে। আর তা যদি সফল হয়, একদিন ওরা স্বর্গই দেখতে পাবে মাটিতে দাঁড়িয়ে। এই গল্প কিশোরেরও জানা আছে, রবিনেরও।

সকালের সোনালি রোদে জিরাফগুলোর হলদে চামড়া অনেকটা সোনার মতোই চিকচিক করছে। তার ওপর অলংকরণ করেছে কালচে-বাদামী বড় বড় ফোঁটা।

'আশ্চর্য!' মুসা বললো। 'এতো লম্বা ঘাড়! এতো উঁচুতে মাথায় রক্ত পাঠায় কি করে হৃৎপিণ্ড।'

'সে-জন্যেই অনেক বড়, সাঙ্ঘাতিক শক্তিশালী এক পাম্প মেশিন রয়েছে জিরাফের বুকে। মানুষের হৃৎপিণ্ডের চেয়ে চল্লিশগুণ বড়। পঁচিশ পাউণ্ড ওজন। সমস্ত জানোয়ারের চেয়ে জিরাফের রক্তচাপ বেশি।' ঘাড়ের প্রধান রক্তবাহী শিরার

মাঝের ফাঁকটা দুই ইঞ্চি। দমকলের পাইপ যেভাবে পানি ছোঁড়ে, ওই শিরা দিয়ে ঠিক তেমনিভাবে রক্ত ছুঁড়ে দেয় জিরাফের হৃৎপিণ্ড।'

'আরিব্বাপরে! কিন্তু যখন মাথা নিচু করে জিরাফ, তখন? এতো চাপে তো মাথার সমস্ত শিরা ছিঁড়ে যাওয়ার কথা।'

'না, তা ছেঁড়ে না। বিশেষ ধরনের ভালভ রয়েছে জিরাফের হৃৎপিণ্ডে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে ওগুলো। বাড়ানোর দরকার হলে বাড়ায়, কমানোর দরকার হলে কমায়। ওসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। প্রকৃতি বেশ সুন্দরভাবেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।'

নাক টানার শব্দ হলো। পেছনে ফিরে তাকালো তিন গোয়েন্দা। রাইফেল হাতে এসে দাঁড়িয়েছে জেনারেল হুডিনি।

'জিরাফের ব্যাপারে কটুক আর জানো তোমরা,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললো সে। 'আমার কাছে শোনো। দুনিয়ার সবচেয়ে নড়বড়ে জীব হলো ওই জিরাফ। লম্বা সরু সরু পাগুলো দেখছো? ওগুলো দিয়ে কি কাজ হবে বলো? ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে এক বাড়ি মারলেই পচা বাঁশের মতো মট করে ভেঙে যাবে। আর গলাটাও পলকা। মাথার কাছে একটা ফাঁস লাগিয়ে জোরে টান মারলেই যাবে ভেঙে। পাতা ছাড়া কিছু খায় না। কোনো শব্দ করতে পারে না। একটুও বিপজ্জনক নয়। শোনো,' হুডিনি শুনেছে, জিরাফ খুবই শান্ত আর নীরিহ প্রকৃতির জীব। কাজেই ওগুলোর ওপর খানিকটা বীরত্ব জাহির করতে পারলে মন্দ হয় না, ভেবে, বললো, 'তোমরা জিরাফ শিকারে গেলে আমাকে নিয়ে যাও। কি করে জিরাফ মারতে হয় দেখিয়ে দেবো। এক্কেবারে সহজ।'

'মারতে যাচ্ছি না আমরা, ধরতে যাচ্ছি,' রবিন বললো।

'ও।' কিছুটা নিরাশই মনে হলো যেন হুডিনিকে। 'সেটা আরও সহজ।'

'তাহলে আর বন্দুক দিয়ে কি করবেন?' রাইফেলটার জন্যে হাত বাড়ালো কিশোর। 'দিন, আমার হাতে দিয়ে আপনি ধরার বন্দোবস্ত করুন।'

গাল চুলকালো হুডিনি। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাইফেলটা তুলে দিলো কিশোরের হাতে। বড় বড় কথা বলে ফেলেছে। এখন আর না দিয়ে উপায় নেই। হ্যাট নিয়ে খুব গর্ব তার। সেটাকে ঠেলে মাথার একপাশে কাত করে দিলো। অনেক শ্বেতাঙ্গ শিকারীকে ওরকম করতে দেখেছে সে, সেটাই নকল করে নিজেকে কেউকেটা গোছের একজন করে তোলার চেষ্টা করলো।

'বন্দুক কে চায়?' মাথা উঁচু করে বললো জেনারেল। 'আমার খালি হাতই যথেষ্ট। আর একটা দড়ি। এসো, জিরাফ ধরা কাকে বলে দেখিয়ে দিই তোমাদেরকে।'

একটা ল্যাণ্ড রোভার জীপ আর একটা বেডফোর্ড লরি বের করা হলো। বেশ কিছু নিগ্রো সহকারী আর জেনারেল হুডিনিকে নিয়ে জিরাফ ধরতে চললো তিন

গোয়েন্দা।

চার টন ওজনের বিশাল লরি। তাতে জিরাফ রাখার উপযুক্ত খাঁচা বসানো হয়েছে। খাঁচার দেয়ালগুলো পনেরো ফুট উঁচু, ছাত নেই, বিশ ফুট উঁচু জিরাফের নিচের পনেরো ফুট থাকবে খাঁচার মধ্যে, বাকি পাঁচ ফুট গলাসহ মাথাটা বেরিয়ে থাকবে বাইরে। তাতে কোনো অসুবিধে নেই। বাঘ-সিংহের মতো লাফিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে না জিরাফ।

'জোরে চালাও,' ড্রাইভার ডিগাকে আদেশ দিলো হুডিনি।

'না,' মুসা বললো, 'আস্তে। ভয় পেয়ে পালাবে নইলে।'

দুটো আদেশের কোনোটাই মানলো না ডিগা, মধ্যপন্থা অবলম্বর করলো। জোরেও না আস্তেও না। জিরাফগুলোকে ঘাবড়ে না দিয়ে এগিয়ে গেল ওগুলোর যতো কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব। পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে চলে আসার পর অস্বস্তি প্রকাশ করতে লাগলো জিরাফগুলো। গাড়ি থামালো সে।

কাছে থেকে দেখে জেনারেলের কথাই ঠিক বলে মনে হলো মুসার। খুবই শান্ত আর নিরীহ জীব মনে হচ্ছে জিরাফগুলোকে। সুন্দরী মেয়েদের চোখের মতো সুন্দর ওগুলোর বাদামী মস্ত চোখ। কুচকুচে কালো লম্বা লম্বা পাপড়ি চোখের পাতায়।

'মাসকারা ব্যবহার করে নাকি!' অবাক হয়ে বললো সে।

ব্যারিংগো প্রজাতির জিরাফ ওগুলো, বিখ্যাত পাঁচ শিংওয়ালা। মাথায় পাঁচটা শিং সত্যিই আছে, তবে মোটেও বিপজ্জনক বলে মনে হচ্ছে না। মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা, চুলে ঢাকা। কি কাজ হয় ওগুলো দিয়ে, জানতে চাইলো মুসা।

'কিছুই হয় না,' জবাব দিলো ডিগা। 'খামোকাই আছে। লড়াইয়ের সময় কাজে লাগে না।'

'মারামারি করার জীবই নয় জিরাফেরা,' প্রতিবাদ করলো হুডিনি।

হাসলো ডিগা। 'করে না মানে? দেখলে বুঝতেন। মাথার পাশ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে শত্রুকে বাড়ি মারে জিরাফ। তখনও শিংগুলো কাজে লাগে না। ঘাড় লম্বা বলে বাড়ি মারতে সুবিধে হয়। এক বাড়িতে একবার একটা চিতাবাঘকে মেরে ফেলতে দেখেছিলাম।'

'বাজে কথা,' বিশ্বাস করলো না জেনারেল। 'একটা মাছি মারারও ক্ষমতা নেই ওদের। মুখ যে খুলছে দেখ। দাঁত পর্যন্ত নেই ওপরের পাটির।'

'তা নেই। তবে খাবার গুঁড়িয়ে দেয়ার মতো বড় বড় দাঁত আছে ওগুলোর চোয়ালে। কিভাবে কাঁটাডাল ভেঙে খাচ্ছে দেখছেন? একাজের জন্যে প্রচণ্ড শক্তিশালী দাঁত দরকার।'

'এবং নিশ্চয় শক্ত জিভ,' যোগ করলো মুসা। প্রায় ফুটখানেক লম্বা জিভগুলো সাপের জিভের মতো চকিতে বেরোতে আর ঢুকতে দেখে অবাক লাগছে তার। ওই জিভ দিয়ে কাঁটাডাল পেঁচিয়ে টেনে নিচ্ছে মুখের ভেতরে, যেখানে চোয়ালের কাছে

রয়েছে শক্ত শক্ত দাঁত, যেগুলো দিয়ে পিষে ফেলতে পারে ওই ডাল। তিমির জিভ এর চেয়ে বড়। তবে স্থলচর জীবদের মাঝে একমাত্র পিঁপড়েভূক ছাড়া এতো বড় জিভ আর কারও নেই।

'বেচারা জীবগুলোর আরেকটা বড় দুঃখ,' এমন ভঙ্গিতে বললো হুডিনি, যেন জিরাফ সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান, 'শব্দ করতে পারে না ওরা।'

'কে বললো? অনেকেই সেকথা ভাবে বটে। তবে জিরাফ গরুর ডাকের মতো কিছু কিছু শব্দ করতে পারে।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে উঠলো হুডিনি। 'তাতে আর লাভটা কি হলো? একে কি শব্দ করা বলে? এতোবড় একটা দানব শুধু গরুর মতো হাম্বাআআ করতে পারে। আরে বাবা শেয়ালও তো এরচে ভালো, অনেক ডাকাডাকি করতে পারে।'

মুখ ঘুরিয়ে হুডিনির দিকে তাকালো ডিগা। 'বেশি কথা বলার দরকারই পড়ে না হয়তো। জানোয়ার আর মানুষে অনেক মিল আছে। অনেক সময় অনেক বড় বড় কথা বলে কিছু লোক, অথচ বলছে যে বুঝতেই পারে না।'

জ্বলে উঠলো হুডিনির চোখ। 'দেখ, ভদ্রভাবে কথা বলো! ভুলে যেও না তুমি কালো চামড়া। শাদাদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় জানা উচিত। আমি বড় বড় কথা বলি, না? বেশ দেখিয়ে দিচ্ছি, কি করতে পারি। প্রমাণটা দিয়ে তারপর কান মোচড়াবো তোমার।'

দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ক্যাচারস সীটে উঠে বসলো জেনারেল। এই সীটটা থাকে গাড়ির নাকের ওপর। ওখানে বসে ফাঁস ছোঁড়ার অনেক সুবিধে।

'এই, গাড়ি ছাড়ো,' চেঁচিয়ে আদেশ দিলো জেনারেল।

'সীট বেল্ট লাগিয়ে নিন,' ডিগা বললো।

'না, লাগবে না। এতো জোরে চালানোরই দরকার হবে না গাড়ি, যে ঝাঁকি লেগে পড়ে যাবো। দৌড়াতে পারে না জিরাফ, আস্তে আস্তে যায়। হয়েছে, এতো কথা বলার দরকার নেই। চালাও, ওই ওটার দিকে।'

গাড়ি ছাড়লো ডিগা। মোরগের মতো ঘাড় ঘুরিয়ে জীপটার দিকে তাকালো বড় মদ্দা জিরাফটা। বড় বড় বাদামী চোখে কৌতূহল ছাড়া আর কিছুই নেই। একবার দেখেই বড় বড় লাফ দিয়ে সরে গেল।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফ দেয় জিরাফ। সামনের পা দুটো একসঙ্গে সামনে বাড়িয়ে লাফ দেয়। তারপর পেছনের পা দুটো একসঙ্গে এগিয়ে চলে আসে সামনের পায়ের ফাঁকে। আবার সামনের পা, আবার পেছনের···এভাবেই চলতে থাকে। মনে হয় ঘুমের ঘোরে পা ফেলা হচ্ছে। ভারি শরীরকে চালাতে যেন ভীষণ অসুবিধে জিরাফের। রকিং চেয়ারের মতো দুলে দুলে দৌড়ায়।

হেসে উঠলো জেনারেল। 'একেবারেই গাধা ব্যাটারা! এখুনি ধরে ফেলছি।'

স্পীডোমিটারের কাঁটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। দশ থেকে দেখতে

দেখতে বিশে উঠে গেল···তিরিশ···এখনও রকিং চেয়ারই দোলাচ্ছে জিরাফটা, সাধারণ ভাবে দেখে মনে হয় গতি একটুও বাড়েনি।

গাড়ির প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে সীটে বসে থাকাই দায় হয়ে উঠেছে হুডিনির। সীট বেল্ট বাঁধার চেষ্টা করছে এতোক্ষণে। কিন্তু সহজ হয়ে বসতেই পারছে না, বাঁধবে কি।

'এই, থামো, থামো!' চিৎকার করে বললো জেনারেল।

কনুই দিয়ে ডিগাকে গুঁতো মারলো মুসা, না থামানোর জন্যে। হাসিতে বেরিয়ে পড়েছে ঝকঝকে দাঁত। ডিগার দাঁতও একই রকম শাদা, সে-ও হাসছে। জেনারেলকে আরেকটু জব্দ করা দরকার মনে করলো সে। আগে আগে ছুটছে জিরাফ। মাঝখানে দূরত্ব বাড়ছে। অ্যাক্সিলারেটরে চাপ বাড়ালো ডিগা। চল্লিশে উঠে গেল গাড়ির গতি।

জিরাফের পাশে চলে এলো জীপ। কিন্তু থামার কিংবা ক্লান্তির সামান্যতম ছাপ নেই প্রাণীটার মাঝে। প্রতিটি লাফে পেরিয়ে যাচ্ছে বিশ ফুট করে। এইই সুযোগ। ফাঁস খোলার চেষ্টা করলো জেনারেল। কিন্তু বসতেই পারছে না স্থির হয়ে, খোলা তো পরের কথা। দুই হাতে সীট ধরে না রাখলে পড়েই যাবে ঝাঁকুনিতে।

হঠাৎ ঘন একটা ঝোপ পড়লো জিরাফের সামনে। কোণঠাসা হয়ে পড়লো ওটা। গাড়ির সামনে দিয়ে পাশ কাটিয়ে খোলা জায়গার দিকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। আর কোনো উপায় না দেখে গাড়ির ওপর দিয়েই লাফিয়ে সরার সিদ্ধান্ত নিলো।

বিশাল শরীরটাকে তার দিকে উড়ে আসতে দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো হুডিনি। শূন্যে উঠে গেলে জিরাফকে এতোবড় লাগবে দেখতে, কল্পনাও করেনি কোনোদিন। ভারি শরীরের চাপে ভর্তা হয়ে যাওয়ার ভয়ে সীটের মধ্যে কুঁকড়ে গেল সে।

উড়ন্ত জিরাফটা, জীপের চেয়ে অনেক উঁচু শরীর নিয়ে সহজেই ওটার ওপরে উঠে গেল। তবে পেরিয়ে যেতে পারলো না নিরাপদে। পেছনের একটা পা নেমে এলো গাড়ির ছাতে।

শক্ত ইস্পাতের ছাত ল্যাণ্ড রোভারের। হাড্ডিসর্বস্ব দুর্বল দেখতে ওরকম একটা পায়ের আঘাত যে এতোটা ভয়াবহ হবে কল্পনাও করতে পারেনি জেনারেল। একবারের জন্যেও ভাবেনি এতো বড় একটা জীবের ওজন নিয়ে। দুই টনী একটা শরীরকে বহন করার ক্ষমতা রাখে যে পা, দেখতে যেমনই হোক প্রচণ্ড তার ক্ষমতা। গাড়ির ছাত ফুঁড়ে এতো সহজে ঢুকে গেল পা-টা, যেন মাখনের মধ্যে ছুরি ঢুকলো।

মুসার পাশের সীটে তার বিখ্যাত হ্যাটটা ফেলে রেখে গেছে জেনারেল। আর পড়বি তো পড়, একেবারে ওটার ওপরই। চওড়া মস্ত খুরটাও যেন একেবারে

ওটার মাপমতোই হয়ে গেল। চাপ দিয়ে চ্যাপ্টা করে একটা গোল রুটির মতো বানিয়ে দিলো হ্যাটটাকে।

চকিতে যেমন নেমে এসেছিলো, তেমনি চকিতেই আবার বেরিয়ে গেল পা-টা, ছোবল দিয়ে যেন ফণা তুলে নিলো সাপ। বিশেষ ক্ষতি হলো না পায়ের, শুধু গভীর কয়েকটা আঁচড় লাগা ছাড়া। গাড়ির পেছন দিয়ে মাটিতে নেমে বেরিয়ে গেল জিরাফটা।

আবার ওটার পিছু নেয়ার জন্যে গাড়ি ঘোরালো ডিগা। গতি এখনও চল্লিশেই রয়েছে। মাটি এখানে অনেক বেশি এবড়োখেবড়ো। সীটে আর নেই এখন জেনারেল। ডিগবাজি খেয়ে উল্টে গিয়ে পড়েছে মাটিতে।

গাড়ি থামিয়ে পিছিয়ে আনলো ডিগা। কোনোমতে উঠে দাঁড়ালো জেনারেল, পা কাঁপছে। টলতে টলতে এগিয়ে এলো গাড়ির দিকে। ক্যাচারস সীটের দিকে তাকালোও না আর, সোজা এসে ঢুকলো ভেতরে। বললো, 'বসে আছো কেন?' কোলা ব্যাঙের স্বর বেরোলো তার গলা দিয়ে। 'সব কাজ আমাকেই করতে হবে নাকি? তুমিও কিছু করো।'

হাসতে হাসতে গিয়ে ক্যাচারস সীটে উঠলো মুসা। সীট বেল্ট বাঁধলো।

ইতিমধ্যে গর্বের হ্যাটের অবস্থা দেখে চোখ কপালে উঠেছে জেনারেলের। গোল রুটিটা হাতে নিয়ে জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

আবার জিরাফের পিছু নিলো ল্যাণ্ড রোভার।

ছুটে চলেছে জিরাফটা। হঠাৎ সামনে ঘাসের মধ্যে লুকানো কিছু রয়েছে আঁচ করেই যেন ঘুরে গেল ডান দিকে। ঠিকই আন্দাজ করেছে ওটা। লম্বা ঘাসবন থেকে বেরিয়ে এলো পাঁচটা সিংহের একটা পরিবার। জিরাফের পিছু নিলো ওগুলো।

জিরাফের মাংস সিংহের খুব প্রিয়। সে-জন্যেই জিরাফের সব চেয়ে বড় শত্রুর একটা হলো সিংহ। একটা সিংহ আলাদা ভাবে কখনও জিরাফকে আক্রমণের সাহস করে না। তবে দল বেঁধে আক্রমণ চালালে কাবু করে ফেলতে পারে, তা-ও সব সময় নয়।

এতোক্ষণ একনাগাড়ে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত হয়ে এসেছে জিরাফটা। দৌড়ে এসে তাকে ঘিরে ফেললো সিংহগুলো।

'এবার দেখবে খেলা,' জিরাফটার ওপর প্রচণ্ড রাগ জমেছে জেনারেলের, ওটাকে বিপদে পড়তে দেখে খুশি হলো। 'দশ সেকেণ্ডে কিমা বানিয়ে ফেলবে।' গোল রুটি দিয়ে মুখে বাতাস দিলো সে।

লাফিয়ে একটা সিংহ জিরাফের পিঠে চড়তে চাইলো। কিন্তু অনেক বেশি উঁচু। নাগাল পেলো না। চিত হয়ে চার পা ছড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আরেকটা লাফ দিয়ে গলা ধরতে চেষ্টা করলো। ওটা শূন্যে থাকতেই মাথা দিয়ে বাড়ি মারলো জিরাফ। ভয়ংকর আঘাতে উড়ে গিয়ে পড়লো সিংহটা। শ্বাস নিতে পারছে

না।

জিরাফের সামনের দু'পায়ে আঘাত হানতে এলো দুটো সিংহ। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে প্রায় খাড়া হয়ে গেল জিরাফ, ভীমগতিতে সামনের পা দুটো নামিয়ে আনলো সিংহের ওপর। ইস্পাত ছিদ্র করে দিতে পারে যে খুর, সেই খুরের আঘাতে সিংহের মতো জীবেরও মারাত্মক ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক। মার খাওয়া কুকুরের মতোই অনেকটা কুঁই কুঁই করে দুর্বল ভঙ্গিতে সরে গেল সিংহ দুটো। ভালো রকম জখম হয়েছে, ভঙ্গি দেখেই অনুমান করা যায়।

বাকি থাকলো আর একটা সিংহ। পেছন থেকে আক্রমণ চালাতে এলো ওটা। ঝেড়ে লাথি মারলো জিরাফ। ঘাড় ভেঙে মারা পড়লো পশুরাজ। চার পা শূন্যে তুলে চিত হয়ে পড়ে রইলো মাটিতে। নিথর হয়ে।

থ হয়ে গেল জেনারেল। একটা কথাও বললো না আর।

রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো বাকি সিংহগুলো। সতর্ক চোখে ওগুলোর চলে যাওয়া দেখছে জিরাফটা। সুযোগ পেয়ে গেল মুসা। গাড়ির দিকে আর তেমন নজর নেই এখন ওটার। ফাঁস ছুঁড়লো সে। জিরাফের মাথা গলে গলায় পড়লো ফাঁস।

ঘাবড়ে গেল জিরাফটা। দড়ি ছাড়ানোর জন্যে টানাটানি শুরু করলো। দড়ির একমাথা বাঁধা রয়েছে গাড়ির সঙ্গে। ছুটাতে পারলো না সে।

ঝাঁকুনি আর দোল খেতে খেতে পেছনে এসে থামলো লরিটা। লাফ দিয়ে নেমে এলো কিশোর আর রবিন। দু'জনের হাতেই কিউরেয়ারগান। জিরাফের উরু সই করে ডার্ট ছুঁড়লো। ওষুধ শরীরে ঢুকলেই অবশ হয়ে আসবে জানোয়ারটার শরীর, বাধা দেয়ার ক্ষমতা হারাবে।

সময় দেয়া হলো, ওষুধের ক্রিয়া শুরু হওয়ার জন্যে। তারপর সহজেই খাঁচার কাছে টেনে নেয়া হলো জিরাফটাকে। খাঁচায় ঢুকিয়ে দরজা লাগিয়ে দেয়া হলো। গাড়িটা নিয়ে আসা হলো ক্যাম্পে। ধীরে ধীরে চালানো হয়েছে, যাতে বেশি ঝাঁকুনি না লাগে, ঘষা লেগে নষ্ট হতে না পারে জিরাফের চমৎকার মখমলের মতো চামড়া।

মদ্দাটাকে নামিয়ে রেখে আবার বেরোলো দলটা। আরও একটা জিরাফ লাগবে, মাদী। ওটাকে ধরা প্রথমটার মতো কঠিন হলো না। এর কারণ সঙ্গের বাচ্চাটা। বাচ্চা ফেলে জোরে দৌড়ালো না জিরাফ-মাতা। ওটাকে ধরার পর আপনাআপনি ধরা দিলো বাচ্চাটা। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়লো খাঁচায়।

চোদ্দ

জুলজুল করে তাকিয়ে রয়েছে টামি আর কোরিন। কাছেই খেলা করছে টরি আর নরি, চিতাবাঘের বাচ্চাদুটো। ওদের সঙ্গে খেলায় মেতেছে সিমবা। মাঝে মাঝে

গিয়ে দুষ্টুমি করে লেজ টানছে টামি। একটান দিয়েই লাফ দিয়ে এসে ঢুকে পড়ছে আবার মায়ের কোলের মধ্যে।

বসে বসে দেখছে তিন গোয়েন্দা। ভালোই লাগছে ওদের।

কিশোরের ধরে আনা বেবুন দুটো আর একবারের জন্যেও বনে যায়নি, ক্যাম্পেই রয়ে গেছে। প্রতিদিনই ক্যাম্পের কিনারে এসে হাজির হয় তার দলের তিনশো বেবুন। ফিরে যাওয়ার আবেদন জানায়। ওদের ভাষায় যেন বলে, 'এই, আর কদ্দিন থাকবে? চলো, বনে চলো।'

কিন্তু রাজি হয় না কোরিন। ফিরে যেতে বলে বন্ধুদের। নতুন মানুষ বন্ধুদের সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিয়েছে। এখানেই ভালো লাগে তার। কারণটা অন্য বেবুনেরাও বুঝতে পারছে না তা নয়। এখানে নানারকমের মজাদার খাবার আছে অঢেল। চাইলেই পাওয়া যায়। বনেবাদাড়ে থাকলে পরিশ্রম করে জোগাড় করতে হয়, এখানে সেসব বালাই নেই।

ডিনারের সময় হলো। খেতে বসে কিশোর লক্ষ্য করলো একটা তাঁবুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে অচেনা একজন নিগ্রোর সঙ্গে কথা বলছে খামবু। কিছু নিয়ে ভীষণ তর্ক করছে মনে হচ্ছে। এক পর্যায়ে ছুরি বের করে শাসাতে লাগলো লোকটা। আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলো কিশোর।

রবিন আর মুসা সেদিকে পেছন করে বসেছে, কাজেই দেখতে পাচ্ছে না। মিস্টার আমান মশগুল, তিনিও তাকাচ্ছেন না।

অবশেষে তর্কে যেন অচেনা লোকটারই জিত হলো। এমন ভঙ্গিতে হাত তুললো খামবু, যেন বললো, 'ঠিক আছে। যা বলছো করবো।'

সাপ্লাই ওয়াগনের দিকে চলে গেল সে। ভেতরে ঢুকলো। বেরিয়ে এলো একটু পরে। সোজা চললো আগুনের দিকে, যেখানে হরিণের মাংসের স্যুপ রান্না করা হচ্ছে। বাবুর্চি চুলায় স্যুপ বসিয়ে দিয়ে অন্য কাজে ব্যস্ত। ওখানে গিয়ে বসলো খামবু। স্যুপের মধ্যে ফেললো কিছু, বাবুর্চির অগোচরে, কিন্তু কিশোর ঠিকই দেখতে পেলো।

তারপর উঠে চলে গেল। ভঙ্গি দেখে মনে হলো একেবারে যেন বিধ্বস্ত হয়ে গেছে সে। কাঁধ ঝুলে গেছে বুড়ো মানুষের মতো, বুকের ওপর ঝুলে পড়েছে মাথা। যা-ই করেছে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে করেছে, অনুশোচনা হচ্ছে এখন।

টেবিলে ফল এনে রাখলো বাবুর্চি। কলা আর আম গপগপ করে গিলতে লাগলো মুসা। রবিন আর আমানও মোটামুটি ভালোই খাচ্ছেন। কিশোর চিন্তিত। খাওয়ায় মন নেই তার।

'কি ব্যাপার?' কিশোরের বিমনা ভাবটা নজর এড়ালো না রবিনের। 'খিদে নেই?'

'একটা বিশেষ ব্যাপার ঘটছে। পেছনে তাকিও না। যেমন খাচ্ছো, খাও।'

হরিণের স্যুপ নিয়ে এলো বাবুর্চি। বাটিতে বাটিতে ঢেলে দিতে লাগলো। চামচে করে তুলে মুখে দিতে যাবে মুসা, তার হাত ধরে ফেললো কিশোর। 'দাঁড়াও। ওতে কিছু চোখে পড়ছে?'

চামচটা চোখের সামনে এনে দেখলো মুসা। 'কই, না তো! কেন?'

'খামবু স্যুপের মধ্যে কিছু ফেললো, দেখলাম।'

'গন্ধটন্ধ তো ভালোই,' আমান বললেন। নিজের বাটির স্যুপটা চামচ দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলেন। 'নাহ্, বিষটিষ আছে বলে তো মনে হয় না।'

'ঠিক দেখেছো তো?' মুসা জিজ্ঞেস করলো। 'খেয়ে ফেলি।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' আচমকা বাধা দিলেন আমান। 'এই যে, চুলের কুচির মতো কিছু।' চামচে করে তুলে দেখলেন ভালোমতো। 'খামবু এই কাজ করবে ভাবতেই পারিনি!'

'কি করেছে?' অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'পরে বলবো। মুখে তোলার ভান করো, কিন্তু ভেতরে দেবে না।'

চামচে করে স্যুপ তুললেন আমান। ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেলেন মুখে তোলার ভঙ্গিতে।

'বাওয়ানা!' তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল। টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালো খামবু।

'কী?'

'দুটো জলহস্তী দেখে এলাম। পাড়ে উঠেছে। খুব সুন্দর। চেষ্টা করলে ধরা যায়।'

'খাওয়া হোক আগে,' নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন আমান। 'পরে দেখা যাবে।'

'নদীতে নেমে যেতে পারে। তখন ধরা কঠিন।'

'জানি। খালি পেটে যাওয়ার চেয়ে খেয়ে যাওয়াই ভালো। কঠিন কাজগুলো সহজ হয়ে যাবে। উহ্, গন্ধটা দারুণ!' আবার স্যুপ মুখে দেয়ার ভান করলেন তিনি।

তাঁকে থামালো খামবু। 'না না, ভালো না। বাবুর্চি পচা মাংস দিয়েছে, আমি দেখেছি। খেলে পেটে অসুখ করবে।'

'কে বললো পচা? আজ সকালে মারা হয়েছে হরিণটা। এতো তাড়াতাড়ি পচতে পারে না।'

অনুনয় শুরু করলো খামবু, 'বাওয়ানা, খাবেন না! এই, তোমরাও কেউ খেও না!'

'কিছুই হবে না খেলে,' মুসা বললো। 'আমার পেট অনেক শক্ত।' বলে স্যুপ মুখে দিতে গেল। তার হাত থেকে চামচটা কেড়ে নিলো খামবু। একটানে বাটিটা সরিয়ে নিয়ে স্যুপ ঢেলে ফেলে দিলো মাটিতে। এক এক করে অন্যদের

বাটিগুলোও ঢেলে দিলো। এমনকি যে পাত্রে করে স্যুপ এনেছে বাবুর্চি, সেটাও খালি করে ফেললো।

হাঁ হাঁ করে ছুটে এলো বাবুর্চি।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাতে শুরু করলো খামবু। 'আমি···আমি বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম!' ম্যালেরিয়া রোগীর মতো কাঁপছে সে।

তার কাঁধে হাত রাখলেন আমান। 'শান্ত হও, খামবু। আমরা জানি সব। তুমি যে চিতামানব আমরা আগেই বুঝেছি। লেপার্ড সোসাইটি কিভাবে কাজ করে, তা-ও জানি। ওরা তোমাকে খুন করতে বাধ্য করেছে। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর গোঁফগুলো যখন খাইনি আমরা, কিছু হবে না।'

'গোঁফ?' মুসা অবাক।

'হ্যাঁ, গোঁফ,' জবাবটা দিলো কিশোর। 'খামবু, চিতাবাঘের ছালটা নিয়ে এসো তো। সেদিন যেটা মারা হয়েছে।'

একবার দ্বিধা করলো খামবু। তারপর গিয়ে সাপ্লাই ওয়াগন থেকে ছালটা নিয়ে এলো।

ওটাকে টেবিলে রেখে মুখটা উঁচু করে ধরতে বললো কিশোর। তা-ই করলো খামবু। মুসাকে জিজ্ঞেস করলো, 'দেখ তো, কোনো গড়বড় চোখে পড়ছে কি না?'

'গড়বড়?' মাথা চুলকালো মুসা। 'কই···মুখটা যেন কেমন লাগছে। নাকের নিচে, ঠোঁটের কাছটা।

'গোঁফ নেই,' রবিন বললো। 'শাদা শক্ত শক্ত চুলগুলো।'

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকালো কিশোর। 'কেটে নেয়া হয়নি, বোঝাই যায়, তাই না? টেনে তুলে নেয়া হয়েছে। তারপর কুচিকুচি করে কেটে ফেলে দেয়া হয়েছে স্যুপে।'

'কেন? কয়েকটা চুলের কুচি আর এমন কি বিষাক্ত?' মুসার প্রশ্ন।

'রবিন, জানো?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'জানি। পড়েছি। এসব দিয়ে ওঝারা শয়তানী করে। সাংঘাতিক শক্ত চিতাবাঘের গোঁফ। পাকস্থলীর দেয়াল ফুটো করে দেয়। পুঁজ হয়। বিষাক্ত হয়ে যায় ক্ষতগুলো। ভয়ানক যন্ত্রণা পেয়ে মরে রোগী।'

কিশোর দেখলো, ঝোপের দিকে তাকিয়ে রয়েছে খামবু। সেই অচেনা লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার মুখের রাগ আর চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি এখান থেকেও বোঝা যাচ্ছে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপচাপ খামবুর দিকে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর ঝটকা দিয়ে ঢুকে পড়লো ঝোপের ভেতর।

কি দেখলো, সঙ্গীদেরকে বললো কিশোর।

'হুঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন আমান। 'গিয়ে এখন কর্তাদেরকে বলবে লোকটা। খামবুর কপালে দুঃখ আছে। যাই হোক, চোখ রাখো। গণ্ডগোল দেখলেই

খবর দেবে আমাকে। ওর জন্যে কিছু করতে হবে আমাদের।'

পনেরো

উত্তেজনায় ভরা একটা বিকেল।

যে জানোয়ারগুলোকে ধরেছে সেগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত তিন গোয়েন্দা। ওগুলোকে খাওয়ানো, এক খাঁচা থেকে আরেক খাঁচায় সরিয়ে নেয়া, এসব খুব ঝামেলার কাজ। কিন্তু তার মধ্যেই একটানা অস্বস্তিবোধ রয়েই যাচ্ছে ওদের মনে। কেন যেন মনে হচ্ছে, শুধু খামবুই নয়, ওরাও রয়েছে মারাত্মক বিপদের মধ্যে। ক্যাম্পের চারপাশে ঝোপের দিকে নজর রাখছে, অচেনা কোনো নিগ্রোকে দেখা যায় কিনা।

কাঁধ ঝাঁকালো মুসা। 'এই টেনশন আর ভাল্লাগে না। কখন এসে পিঠে বিষমাখা তীর বিঁধবে কে জানে!'

ঘন্টার পর ঘন্টা একনাগাড়ে কাজ করলো ওরা। সেই সাথে কিছু ঘটার অপেক্ষা। অবশেষে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত গেল সূর্য। বিচিত্র সোনালি রঙ মাখিয়ে দিয়ে গেছে যেন দিগন্তজোড়া তেপান্তরের ঘাসের ডগায় ডগায়। শান্ত নীরবতা নেমে এলো মাঠ, বনভূমি আর নদীর ওপর। তারপর, ঘুমজড়িত গলায় ডেকে উঠলো কয়েকটা পাখি, নদীর ধারে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো একটা বুনোশুয়োর। লম্বা ঘাসের বনে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে বয়ে গেল যেন একঝলক জোড়ালো বাতাস।

'নাহ্, আজ আর কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না,' আর ধৈর্য রাখতে পারছে না মুসা।

'না ঘটলেও,' কিশোরের আশঙ্কা যাচ্ছে না, 'আজ রাতে হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের। পাহারা দেবো। রবিন, তুমি ওই ঝোপটায় থাকবে। মুসা থাকবে ওদিকটায়। আর আমি এই পাশটায় বসবো।'

তর্ক করলো না কেউ। উঠে ঝোপের কাছে চলে গেল মুসা। লম্বা ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে বসলো। রবিন গিয়ে বসলো তার উল্টো দিকে। কিশোর আরেক দিকে। তিনজনকে তিনটে বিন্দু ধরে নিয়ে তিনটে বাহু কল্পনা করলে একটা সমবাহু ত্রিভূজ তৈরি হয়ে যাবে, পরস্পরের কাছ থেকে এমন ভাবে বসেছে ওরা। কান খাড়া করে রেখেছে। সামান্যতম শব্দও যাতে না এড়ায়।

এক ঘন্টা গেল··দুই ঘন্টা··ঘুমে জড়িয়ে এলো মুসার চোখ। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো, বলতে পারবে না। স্বপ্ন দেখতে লাগলো।

এক প্রাচীন দুর্গে চলে গেছে যেন সে। শত্রুরা এসে দুর্গ আক্রমণ করেছে। প্রচণ্ড লড়াই বেধেছে। ওর আশপাশ দিয়ে হুস হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে বিষাক্ত তীর। শব্দটা বিচিত্র কটকটানিতে রূপ নিলো, আগুনে কাঠ পোড়ার সময় যে রকম

শব্দ হয়। হঠাৎ আগুন ধরে গেল সারা দুর্গে।

জেগে গেল মুসা। কটকট শব্দটা কানে আসছে এখনও। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। বনের ভেতর আগুন দেখা যাচ্ছে, আগুনের অনেক বড় কুণ্ড। নাকি দাবানল লাগলো! যা-ই হোক, সেই শব্দ ক্যাম্পের দিকে বয়ে নিয়ে আসছে বাতাস।

কটকট ছাপিয়ে আরেকটা শব্দ শোনা গেল। চিতাবাঘের কাঠ চেরার মতো আওয়াজ। আরেকটা চিতাবাঘ যোগ হলো। তারপর আরেকটা। চারপাশ থেকেই শোনা যেতে লাগলো ডাক, যেন ক্যাম্প ঘিরে ফেলেছে অসংখ্য চিতাবাঘ।

কিশোরকে ডাকলো মুসা। সাড়া না পেয়ে ছুটলো তার বাবার তাঁবুর দিকে। তাঁবুতে ঢুকে দেখলো রবিন আর কিশোর ওখানে রয়েছে।

'চিতাবাঘ নয়,' আমান বললেন, 'চিতামানব। দল বেঁধে এসেছে আমাদের ওপর চড়াও হতে। আগুন ধরিয়ে দেবে ক্যাম্পের চারপাশে। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে আমাদের। জলদি গিয়ে সবাইকে ডেকে তোল।'

'চিতামানবের বিরুদ্ধে লড়াই করবে ওরা?' সন্দেহ আছে রবিনের।

'কি জানি! চিতামানবকে যমের মতো ভয় পায় ওরা। খামবুকে এখানে আসতে বলো।'

ছেলেরা বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই তাঁবুতে এসে ঢুকলো খামবু।

'খামবু,' আমান বললেন, 'সময় এসে গেছে। ভাবো। ভেবে ঠিক করো, আমাদের দলে থাকবে, নাকি ওদের দলে। ওদের দলে চলে গেলে তোমার বউ ছেলেমেয়েদেরকে বাঁচাতে পারবে। ভালোমতো ভেবে দেখো। জলদি।'

জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল খামবু।

দাবানলের মতোই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে আগুন। একদিকের বনভূমি জ্বলছে, ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসছে আগুন।

চিতামানবদের কণ্ঠ অনেক কাছে চলে এসেছে। বেরিয়ে এসেছে ঝোপের ভেতর থেকে। আগুনের আলোয় ওদের রঙ করা চিত্রবিচিত্র মুখ, চিতাবাঘের ছাল জড়ানো শরীর দেখে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ওরা মানুষ, এই পৃথিবীরই অধিবাসী। ওদের হাতে তীর-ধনুক নেই দেখে প্রথমে খুশি হলেও মুহূর্ত পরেই দমে গেল মুসা, আঙুলে লাগানো ইস্পাতের বাঁকা চকচকে নখে আগুনের আলোর ঝিলিক দেখে।

তীর ব্যবহার করবে না বটে ওরা, তবে পুরোদস্তুর চিতাবাঘ হয়ে যাবে। কাউকে খুন করার সময় মারাত্মক নখ ব্যবহার করে চিতাবাঘেরা। চিরে ফালাফালা করে দেয়।

ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে ওরা। বাতাসে ভেসে আসছে ওদের গায়ের বোঁটকা গন্ধ। চিতাবাঘের চর্বি মেখেছে শরীরে।

নখ বাগিয়ে সোজা মুসার দিকে ছুটে এলো একজন চিতামানব। ফুট পাঁচেক দূরে থাকতেই ঝাঁপ দিলো, শিকারের ওপর চিতাবাঘ যেভাবে ঝাঁপ দেয়।

কিন্তু মুসাকে খুব সহজ শিকার ভেবে ফেলেছে লোকটা। চোখের পলকে জুডোর কায়দায় ডিগবাজি খেয়ে সরে গেল মুসা। কিছুই করতে পারলো না চিতামানব। ঝাঁপ দিয়ে ফেলেছে, নিজেকে রুখতেও পারলো না । উড়ে এসে দড়াম করে আছড়ে পড়লো শক্ত মাটিতে। পড়েই থাকলো। প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে বুকে-পেটে। বেশ কিছুক্ষণ আর জ্বালাতে পারবে না ও।

রবিন আর কিশোরকে দেখতে পেলো মুসা। দু'জন চিতামানবের সঙ্গে প্রাণপণ লড়াই করছে। নখের আঁচড়ে মুখ আর গলা থেকে রক্ত পড়ছে ওদের। সাহায্য করার জন্যে ছুটে গেল সে। পেছন থেকে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দিলো একজনকে। জুতো দিয়ে মাথার একপাশে লাথি মেরে তাকে বেহুঁশ করে ফেললো। তিনজনে মিলে আরেকজনকে কাবু করতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হলো না।

আচমকা এভাবে আক্রান্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে কুলিরা। কেউ কেউ লড়াই করছে। লড়াই মানে আত্মরক্ষাই করছে শুধু, পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ পাচ্ছে না। কেউ কেউ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ভয়ে কাঁপছে। ওদের কাছে এই মানুষগুলো মানুষ নয়, ভয়ানক ক্ষমতাশালী প্রেত। ওদের মধ্যে একমাত্র খামবুই ঠিকমতো লড়াই করছে। সে নিজে একজন চিতামানব, অর্থাৎ মানুষ, যাদের সঙ্গে লড়াই করছে তারাও যে মানুষ, জানে। মিস্টার আমানের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে লড়ছে সে, কাউকে ঢুকতে দিচ্ছে না তাঁবুতে। চিৎকার করে কুলিদেরকে সাহস জোগাচ্ছে লড়ার জন্যে, অনুরোধ করছে। বোঝানোর চেষ্টা করছে, চিতামানবেরা ভূতপ্রেত কিংবা চিতাবাঘ নয়, ওদেরই মতো মানুষ।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন আমান। এখনও অনেক দুর্বল। লড়াই করার মতো অবস্থা নেই। তবু সাহায্য করার চেষ্টা করলেন। জোর করে তাঁকে তাঁবুতে ফেরত পাঠিয়ে দিলো খামবু।

বন্দুক হাতে বেরিয়ে এলো আরেকজন লড়াকু। জেনারেল হুডিনি। বন্দুক তুলে গুলি করলো দুই রাউণ্ড। কিন্তু নিশানা এতোই খারাপ, কারো গায়ে লাগাতে পারলো না। বরং আরেকটু হলে একজন কুলিকেই জখম করে ফেলেছিলো। ইস্পাতের নখের পয়লা আঁচড়টা গায়ে লাগতেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো, যেন এখুনি মারা যাবে। চোখের পলকে আবার তাঁবুর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

লড়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা, খামবু, ডিগা, কাকামি। আর অবশ্যই সিমবা। কিন্তু বিশজন চিতামানবের বিরুদ্ধে এভাবে খালি হাতে লড়াই করে জেতার আশা করাও বোকামি।

পরাজিত প্রায় হয়ে এসেছে, এই সময় অযাচিত ভাবে আরেক দিক থেকে

সাহায্য এসে হাজির হলো। সেই তিনশো বেবুন। ওদের বন পুড়ছে। আগুনের ভয়ে নিরাপদ জায়গা খুঁজতে গিয়ে ধেয়ে চলে এসেছে ক্যাম্পের দিকে। তাছাড়া বোধহয় এ-মুহূর্তে মানুষের সাহায্য আশা করছে ওরা।

ক্যাম্পে ঢুকতেই চোখ পড়লো চিতাবাঘের ছাল পরা মানুষগুলোর ওপর। বোঁটকা গন্ধ এসে লাগলো নাকে। ওই ঘৃণিত গন্ধ ওদের পরিচিত, জন্ম-জন্মান্তর থেকে যেন নাকে লেগে রয়েছে। বেবুনের মহাশত্রু চিতাবাঘ। শত্রুকে পেয়ে গেছে নাগালের মধ্যে। আর যায় কোথায়। চিতামানবদের চিতাবাঘ ভেবে ওদের ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বেবুনের দল।

বেবুনের দলের সামনে পড়লে চিতাবাঘ পর্যন্ত লেজ গুটিয়ে পালায়, আর চিতামানব তো কোন ছার। দাঁতের কামড়ে, নখের কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো ওরা। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ছোটাছুটি শুরু করলো। কিন্তু যেদিকেই যায়, সেদিকেই বেবুন। গায়ে এসে পড়ে।

আতঙ্কিত এক চিতামানবের চোখে পড়লো হাতি রাখার শূন্য খাঁচাটা। একটা দানবীয় বেডফোর্ড ট্রাকের ওপর। লাফিয়ে ট্রাকের প্ল্যাটফর্মে উঠে খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

লোকটাকে ওখানে নিরাপদ দেখে বাকি চিতামানবেরাও গায়ের ওপর থেকে বেবুনদের কোনোমতে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গিয়ে একে একে ঢুকতে লাগলো খাঁচায়। একজনও থাকলো না আর বাইরে। বিশজনই ঢুকে পড়লো।

এইই সুযোগ। সেদিকে দৌড় দিলো কিশোর। কিন্তু একই বুদ্ধি এসেছে আরেকজনের মাথায়ও। থামবু। কিশোরের আগেই দৌড়ে গিয়ে খাঁচার দরজাটা চেপে লাগিয়ে দিলো সে। কিট করে লেগে গেল দরজার স্বয়ংক্রিয় তালা। আটকা পড়লো বিশজন চিতামানব। কিন্তু সেটা নিয়ে এখন ভাবনা নেই যেন ওদের। বেবুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, আপাতত তাতেই খুশি ওরা।

বেবুনের ভয়ে চিতামানবদের পালাতে দেখেই অবাক হয়েছিলো কুলিরা। এখন খাঁচা থেকে বেরোতে পারছে না দেখে ওদের ভয় একেবারে চলে গেল। এতোক্ষণে বুঝলো, চিতামানবেরাও অতি সাধারণ মানুষ। ভূত-ফূত কিছু না, কোনো অলৌকিক ক্ষমতাও নেই ওদের। খাঁচার কাছে দাঁড়িয়ে টিটকারি দিতে লাগলো। ঢিল ছুঁড়ে মারলো কেউ কেউ।

ক্যাম্প করা হয়েছে যে জায়গাটায় সেখানে গাছপালা, ঘাস কিচ্ছু নেই। শুকনো মাটি তো নয়, যেন পাথর। আগুন ধরার মতো কিছুই নেই, তাঁবুগুলো ছাড়া। তবে ওখানে পৌঁছতে পারলো না আগুন। ক্যাম্পের কিনারে এসে থেমে গেল।

চারপাশে দাউ দাউ করে আগুনের মাঝে ক্যাম্পটাকে মনে হলো আগুনের সাগরে একটা ছোট দ্বীপ। আগুনের হলকা ছুটছে। ভয়ংকর গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবে

যেন সবাই। আতঙ্কিত চিৎকার জুড়ে দিয়েছে জন্তুজানোয়ারগুলো। খাঁচার বাইরে আছে যারা, তারাও, ভেতরে রয়েছে যারা, তারাও।

ধীরে ধীরে কমে এলো আগুন। বনের দিক থেকে এসেছে ঘাস পুড়তে পুড়তে, ওই ঘাস নির্ভর করেই বাতাসের তাড়নায় দূরে সরে যেতে লাগলো। নদীর তীর আর পাথুরে পাহাড়ের কিনারায় বাধা পেয়ে তারপর শেষ হবে। মাঝের জায়গাটা ছাই হয়ে যাবে পুড়ে।

মিস্টার আমানের তাঁবুতে ঢুকলো খামবু। ছেঁড়া কাপড়-চোপড়। শরীরের চামড়ায় অসংখ্য আঁচড় থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মুখে খুশির হাসি। মাথার ওপর থেকে যেন পাহাড় নেমে গেছে তার, পালকের মতো হালকা লাগছে শরীরটা।

এগিয়ে গিয়ে আমানের সামনে দাঁড়ালো সে।

হেসে হাত বাড়িয়ে দিলেন আমান।

দু'হাতে তাঁর হাতটা চেপে ধরলো খামবু। চোখে টলমল করে উঠলো পানি। তবে মুখের হাসিটা মোছেনি, আরও বেড়েছে।

ভোর হতেই ক্যাম্প ভেঙে দিয়ে রওনা হয়ে পড়লো দলটা। উপকূলের দিকে চলে যাবে। পথে জায়গায় জায়গায় থেমে জন্তু ধরবে, রাতে আর ক্যাম্প করবে না, চলবে। এভাবেই চলে যাবে কামপালায়। ওখানকার পুলিশের হাতে বিশজন বন্দিকে তুলে দিয়ে চলে যাবে মোমবাসা বন্দরে। যে সমস্ত জন্তুজানোয়ার ধরেছে, সেগুলো নিয়ে দেশের জাহাজে চাপবেন মিস্টার আমান। তিন গোয়েন্দা রয়ে যাবে। তালিকা অনুযায়ী সমস্ত জন্তু এখনও ধরা হয়নি। ধরতে সময় লাগবে। ততোদিনে মিস্টার আমানের শরীর ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই, বরং আরও খারাপ হতে পারে। তিন গোয়েন্দাকে কোনো সাহায্যও করতে পারবেন না। অযথা থেকে লাভ কি? সে-জন্যেই ফিরে যাচ্ছেন তিনি, ওদের বোঝা বরং কিছুটা কমিয়ে দিয়ে।

চলার পথে জিজ্ঞেস করলেন আমান, 'মাউনটেইন অভ দা মুন-এর নাম শুনেছো?'

মাথা কাত করলো রবিন। 'হ্যাঁ।'

বিড়বিড় করলো কিশোর, 'চন্দ্র পাহাড়!'

মুসা বললো, 'কে না শুনেছে? দৈত্যের দেশ বলে অনেকে ওটাকে, শুনেছি। ওখানকার ফুল নাকি হয় গাছের সমান, কেঁচোগুলো তিন ফুট লম্বা।'

'আর হাতিগুলো হয় একেকটা প্রাগৈতিহাসিক ম্যাস্টোডনের সমান,' যোগ করলেন আমান। 'যেতে চাও ওখানে? ওখানকার হাতির তুলনা হয় না। অনেক দামে বিকোবে।'

চকচক করে উঠলো কিশোরের চোখ। বললো, 'চাই। শুনেছি, ওখানে নাকি কিংবদন্তীর শাদা হাতিও আছে। সত্যি নাকি?'

'জানি না। আমিও শুনেছি। ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে গিয়েওছিলাম একবার ওখানে। কতো খোঁজ করেছে বাবা, ওই হাতির, পায়নি। তবে জায়গাটা খুব সুন্দর।'

'আমরাও খুঁজবো,' তুড়ি বাজালো মুসা। 'যদি পেয়ে যাই···,' বাকি কথাটা শেষ করলো না সে, মাথা নেড়ে হাতের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলো কি করবে।

'শ্বেত হস্তীকে খাঁচায় পোরা অতো সহজ হবে না।'

'আছে কি না সত্যিই, সেটাই হলো কথা। ধরার কথা তো পরে,' কিশোর বললো।

'দেখ গিয়ে খোঁজ করে। থাকলে তো ধরার চেষ্টা করবেই। না থাকলে কালো হাতিই ধরবে, ভালো দেখে। অর্ডার আছে। অসুবিধে হবে না। খামবু এখন আমাদের বন্ধু। তোমাদের জন্যে দরকার হলে এখন প্রাণ দিয়ে দেবে ও।'

লরির জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো কিশোর। পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঁকি দিচ্ছে। সোনালি রঙ লাগতে আরম্ভ করেছে তেপান্তরের ঘাসের ডগায়। আফ্রিকার ভোরের এই অপরূপ সৌন্দর্য বহুবার দেখেছে সে। তবু প্রতিদিনই নতুন মনে হয়।

কয়েকটা জেব্রা চরছে একজায়গায়। সেদিকে তাকিয়ে থেকে ভাবতে লাগলো সে, চন্দ্রপাহাড় আর শাদা হাতির কথা। ধরতে পারলে ভালোই হতো, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যেতো ওরা।

কল্পনাও করতে পারলো না ওই মুহূর্তে, চন্দ্রপাহাড়ে যাওয়ার আগে আরেক জায়গায় যেতে হবে। ওদের জন্যেই যেন ওত পেতে আছে ভয়ংকর মানুষখেকো সিংহ, আর অপেক্ষা করছে এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেনচার।

-ঃ শেষ ঃ-

সিংহের গর্জন

প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারি, ১৯৯২

'পাগলামি! সেরেফ পাগলামি,' মুসা বললো। 'সিংহের বাড়িতে এসে এভাবে ঘাপটি মেরে থাকা। তা-ও আবার মানুষখেকো সিংহ।'

কিছু বললো না কিশোর। কারণ তার কাছে এটা পাগলামি মনে হচ্ছে না। সে বিশ্বাস করে, শক্তির চেয়ে বুদ্ধি বড়। সিংহের গায়ে জোর যতোই থাক, মানুষের বুদ্ধির কাছে সে অসহায়—যদি মানুষ ঠিকমতো বুদ্ধি খাটিয়ে তার বিরুদ্ধে লাগতে আসে। নিজের বুদ্ধির ওপর উঁচু ধারণা কিশোরের। মানুষখেকো সিংহকে ছোট করে দেখছে না সে, তবে তাকে হারাতে পারবে না একথাও ভাবছে না। সাবধান থাকতে হবে, ভাবলো সে, আর মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

তার একপাশে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মুসা। আরেক পাশে রবিন। চারপাশে শুকনো কাঁটাঝোপের বেড়া। আফ্রিকানরা একে বলে বোমা। বুনো প্রাণীর কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নিজের চারপাশে এই বেড়ার ঘের দিয়ে নেয় ওরা।

কিন্তু এই বেড়ার ভেতরে নিজেদেরকে একটুও নিরাপদ ভাবতে পারছে না মুসা। 'মোটে তো পাঁচ ফুট। মরা সিংহও লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারবে।'

'কিন্তু লাফই দেবে না,' কিশোর বললো। 'বেশির ভাগ সিংহই এড়িয়ে যাবে তোমাকে। মানুষখেকো হলে অবশ্য আলাদা কথা। ওদের মতিগতি বোঝার উপায় নেই।'

'মানুষখেকো মারতেই তো এসেছি আমরা। তাহলে আর বোমার দরকার কি? খোলা জায়গায় বসলেই পারতাম।'

'তাহলে বিপদ অনেকটা বাড়তো,' জবাবটা দিলো এবার রবিন। 'এখানে শুধু সিংহ ঘোরাফেরা করে না, আরও হাজারটা জানোয়ার আছে। অন্ধকারে চিতাবাঘ, হাতি, গণ্ডার এসে গায়ের ওপর পড়তে পারে। চমকে গিয়ে হামলা চালিয়ে বসতে পারে। চিতাবাঘের এক থাবায়, কিংবা হাতির এক আছাড়ে মুসা আমানের লাশ হয়ে যাবে তুমি। যাতে সেটা না হও, সে-জন্যেই এই বোমা। জন্তুজানোয়ারেরা কাঁটার খোঁচা একদম পছন্দ করে না, তোমার মতোই। বোমার ছোঁয়া পেলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে সরে চলে যাবে। অন্তত সেই আশাই করছি।'

'শুধু মানুষখেকো বাদে।'

'হ্যাঁ, মানুষখেকো বাদে,' কিশোর বললো। 'তবে সে এলেও আর চুপি চুপি ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়তে পারবে না। বোমা পেরোতে হলে শব্দ করতেই হবে তাকে।'

'আর সেই সুযোগটাই তুমি নিতে চাইছো,' কেঁপে উঠলো মুসার গলা।

'হ্যাঁ, চাইছি। ভয় লাগছে নাকি তোমার?'

'না না। শীত।'

শ্বেতহস্তীর খোঁজে চন্দ্রপাহাড়ের দিকে চলেছিলো তিন গোয়েন্দা। পথে থামতে হয়েছে। দিন একটা গেছে বটে আজ! একদিনেই পাঁচ পাঁচটা খুন! সাভো গাঁয়ের কাছে নাইরোবি-মোমবাসা রেলপথ মেরামত করছিলো পাঁচজন লোক। তাদেরকে মেরে ফেলেছে সিংহ।

সাভোর সিংহের বদনাম সব সময়েই। অনেক বছর আগে যখন এই রেললাইন প্রথম বসানো হয়, তখন সারা পৃথিবীর মানুষ চমকে উঠেছিলো এক ভয়ংকর খবর শুনে। রেলশ্রমিকদের পাইকারী হারে খুন করছে সাভোর সিংহেরা। মেরে খেয়ে ফেলছে। তারপর মাঝে মাঝেই এখানে সিংহের ব্যাপক উৎপাতের খবর শোনা গেছে। সেই একই কাণ্ড ঘটেছে এখানে আবারও।

জন্তুজানোয়ার ধরতে ধরতে নিজেদের ওপর আস্থা অনেক বেড়ে গেছে তিন গোয়েন্দার। কোনো জানোয়ারকে আর এখন ভয় পায় না। ওরা জানে, বুদ্ধি দিয়ে যে কোনো ভয়াবহ জানোয়ারের মোকাবেলা করা সম্ভব। আশপাশের এলাকায় অনেক দূর পর্যন্ত ওদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে চিতামানবদের বন্দি করার পর। অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা এখন ওদেরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ভাবতে আরম্ভ করেছে। সেই জন্যেই যখন শুনলো, ওরা এপথে যাচ্ছে, এসে ধরেছে মানুষখেকোটাকে মেরে দেয়ার জন্যে। অনেক বলেও বোঝাতে পারেনি কিশোর, জানোয়ার ধরা আর শিকার এক কথা নয়। বাধ্য হয়ে হাল ছেড়ে দিতে হয়েছে তাকে, অর্থাৎ রাজি হতে হয়েছে।

প্রথম সমস্যাটা দেখা দিলো—কি করে বুঝবে কোনটা সাধারণ আর কোনটা মানুষখেকো? শত শত সিংহ রয়েছে এই এলাকায়। অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায়ই দেখতে পেলো কিশোর, টোপ দিয়ে ফাঁদ পাতা। আর টোপ হতে হবে মানুষকে, যাতে লোভে লোভে মানুষখেকোটা এসে হাজির হয়। অন্য কেউ সিংহের খাবার হতে রাজি হবে না। তাই ওদেরকেই খাবার সেজে বন্দুক নিয়ে বসে থাকতে হবে।

'আরও একটা কাজ করবো,' দুই সহকারীকে নিয়ে আলোচনায় বসে বলেছে

কিশোর। 'বোমার দশ গজ দূরে একটা মরা ছাগল বেঁধে রাখবো। কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় যে কোনো সিংহ ছাগলের গন্ধ পাবে, আমাদেরও। যদি ছাগলটাকে খেতে আসে, ভাববো সাধারণ সিংহ। আর যদি আমাদেরকে খেতে আসে, তাহলে তো বোঝাই যাবে মানুষখেকো। দেবো গুলি চালিয়ে। অতো কাছে থেকে মিস করবো না।'

কিন্তু সিংহের খাবার হওয়ার কথাটা ভাবতেই ভালো লাগলো না মুসার। 'ছাগলটাকে খেলেই বা কি? তাতেই সাধারণ সিংহ হয়ে যাবে না। শুধু মানুষই খায় না মানুষখেকো সিংহ, সব কিছুই খায়।'

'তা খায়। তবে কাছাকাছি মানুষ থাকলে অন্য জানোয়ারের দিকে ফিরেও তাকায় না।'

'কেন? মানুষের মাংস কি এতোই মজা নাকি?'

'সিংহের কাছে নিশ্চয়। একবার মানুষের মাংসের স্বাদ পেয়ে গেলে আর কিছু তার ভালো লাগে না। বিজ্ঞানীরা বলেন, মানুষের মাংসে লবণ বেশি, গোশতও নরম, সে-জন্যেই ভালো লাগে সিংহের। হরিণের কথাই ধরো। সারাদিন লাফালাফি করতে হয় বাঁচার তাগিদে, ফলে মানুষের পেশির চেয়ে শক্ত হয়ে যায় ওদের পেশি। মানুষের চামড়াও অনেক নরম। তাছাড়া লোম নেই। ধরাও সহজ। এতো সব সুযোগ সুবিধা থাকতে কেন মানুষ ছেড়ে হরিণ ধরতে যাবে পশুরাজ? যা-ই হোক, অতো ভয়ের কিছু নেই। তিরিশজন লোক আছে আমাদের। সবাই মিলে সিংহটাকে কাবু করার চেষ্টা করবো।'

কিন্তু তার পরিকল্পনা মতো ঘটলো না সব কিছু। বাদ সাধলো সাভোর ডিস্ট্রিক্ট অফিসার। স্টেশন মাস্টার কিমবা তিন গোয়েন্দাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে যখন তাকে পাঁচটা লোকের মৃত্যুর খবর দিয়ে বললো, কিশোররা সিংহটাকে মারতে চায়, তিক্ত কণ্ঠে কালো বিশালদেহী দৈত্যটা বললো, 'না, তিরিশ জন নয়, তিনজন।'

'কিন্তু আমরা একা কি করে করবো?' প্রতিবাদ করেছে কিশোর।

'সেটা তোমাদের সমস্যা, আমার নয়।'

'দেখুন, বোঝার চেষ্টা করুন...,' বোঝাতে চেয়েছে কিশোর।

'কিছুই বুঝতে চাই না আমি,' হাত নেড়ে বলেছে ডিস্ট্রিক্ট অফিসার। 'পারলে করো। না পারলে নেই। আর লোকজন পাবে না।'

'কি কারণে জানতে পারি?' রেগে গেছে মুসা। কিশোর কিংবা রবিন হলে হয়তো বলতে পারতো, 'তোমার দেশের লোক, মরুক-বাঁচুক, আমাদের কি?' কিন্তু মুসা সেকথা বলতে পারেনি। কারণ আফ্রিকানরা তারই জাতভাই। মানবিকতার খাতিরে তো বটেই, ভাই হিসেবেও ওদের সাহায্য করা তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য মনে করেছে।

চোখ গরম করে তার দিকে তাকিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট অফিসার। 'সে কৈফিয়ত

তোমাকে দিতে হবে নাকি? আমি একজন রাজা। আমার বাপ ছিলো রাজা, দাদা ছিলো রাজা। আমার এলাকার লোকের কাছে আমি এখনও রাজা মাকুমা। রাজারা কখনও কারো কাছে কৈফিয়ত দেয় না।'

'কিন্তু এখন তো আর রাজা নন,' মনে করিয়ে দিতে চেয়েছে রবিন। 'আপনি ডিস্ট্রিক্ট অফিসার। কেনিয়ার লোকের ভালো-মন্দের দায়িত্ব আপনার ওপর।'

ভীষণ রাগে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে রাজা মাকুমা। 'মুখ সামলে কথা বলবি! জানিস, ধরে এখন চাবকে তোর ছাল তুলে দিতে পারি! তোদের মতো শাদা চামড়ার কুত্তাদের মনে রাখা উচিত, কেনিয়া এখন কালো মানুষদের জায়গা। এখানে শাদা চামড়ার ঠাঁই হবে না আর কোনোদিন। শাদাদের কাছে কৈফিয়তও দিতে হবে না আর কারও।'

হাতের ছোট লাঠিটা দিয়ে বাতাসে বাড়ি মারলো সে, কর্তৃত্ব জাহির করার জন্যে। মুসা আর কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে যেন নরম হলো কিছুটা। 'বেশ, কেন বেশি লোক নিতে মানা করছি, বলছি। কুলিগুলো সব গাধা। বুঝতে পারবে না কোনটা খারাপ সিংহ, আর কোনটা ভালো। যেটা দেখবে সেটাই মারবে। এভাবে সিংহ মারতে দিতে পারি না আমি, আইন বলে একটা কথা আছে। যা করার একা তোমাদেরকেই করতে হবে।'

ঠেকাটা যেন কিশোরদেরই। 'পারবো না, যাও!' বলে সহজেই চলে আসতে পারতো। কিন্তু লোকটার রহস্যজনক আচরণই সিংহ শিকারের প্রতি আগ্রহ অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে কিশোরের। মানুষ মেরে সাফ করছে সিংহ। ওটাকে মারার একটা মানবিক দায়িত্ববোধ তো আছেই, মাকুমার দুর্ব্যবহারকেও একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে সে। প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে, যে করেই হোক সিংহটাকে মারবেই। তাহলেই লোকটার দুর্ব্যবহারের জবাব হয়ে যাবে।

লোকটার সঙ্গে কথা বলার পর অনেক ভেবেছে কিশোর, এরকম অদ্ভুত আচরণ কেন করলো মাকুমা? ওরা তো খারাপ কিছু করতে যাচ্ছে না, তার দেশের মানুষকেই সাহায্য করতে চাইছে। বিদেশীদের ওপর রাগ আছে অনেক আফ্রিকানের, তবে মাকুমারটা যেন বাড়াবাড়ি রকমের। ইচ্ছে করেই মানুষখেকো সিংহের মুখে ওদেরকে ঠেলে দিতে চেয়েছে, মেরে ফেলার জন্যে। ওরা মরলে যেন খুব খুশি হবে সে।

সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করে একটা প্রশ্নই শেকড় গেড়েছে তার মনে, চিতামানবদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তো লোকটার? দলের বিশজন মানুষকে ধরিয়ে দিয়েছে বলে ওদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে না তো?

দেখা যাবে। আগে মানুষখেকোটার ব্যবস্থা হোক, তারপর রহস্যটা সমাধান করেই ছাড়বে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর।

দুই

ঝোপের ভেতরে খসখস শব্দ হলো।

'শোনো,' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'বোধহয় এসে গেছে!'

.৩০৩ লী এনফিল্ড রাইফেলটা তুলে নিলো কিশোর। সিংহ মারার জন্যে চমৎকার একটা অস্ত্র। দশ কার্ট্রিজের ম্যাগাজিন। বাড়তি আরেকটা বুলেট ভরা রয়েছে চেম্বারে। মোট এগারোটা গুলি। একটা সিংহের জন্যে যথেষ্টরও বেশি।

মুসা আর রবিনকে রাইফেল আনতে দেয়নি কিশোর। বসার জায়গা খুব কম। এতো অল্প জায়গায় তিন তিনটে রাইফেল নাড়াচাড়া করতে অসুবিধে। গুলি করার সময় একটার সঙ্গে আরেকটা ঠোকাঠুকি লেগে গোলমাল হয়ে যেতে পারে। আসল কাজেই বিঘ্ন ঘটবে তাহলে। তাছাড়া সিংহকে গুলি করার সময়ে তার চোখের ওপর টর্চ ধরতে হবে কাউকে। সেকাজটা করবে রবিন, সে-জন্যেই সাথে করে এনেছে বড় একটা হান্টিং টর্চ। নাকের নিচে ছুঁড়ে ফেলে সিংহকে চমকে দেয়ার জন্যে থাণ্ডার ফ্ল্যাশও এনেছে।

একেবারে নিরস্ত্র হয়ে আসেনি মুসা। কোমরে ঝোলানো রয়েছে বিশাল হান্টিং নাইফ। একজন কুলি জোর করে তার হাতে একটা বর্শা ধরিয়ে দিয়েছে। মাসাইদের জিনিস। এই অস্ত্র দিয়ে সিংহ শিকার করে ওরা। আর সিংহ মারায় নাম আছে মাসাইদের। শুধু একটা বর্শা সম্বল করে সিংহের মুখোমুখি হয় ওরা। কাজেই জিনিসটাও সেরকম। মাসাই কুলিটা শিখিয়ে দিয়েছে মুসাকে কিভাবে বর্শাটা ব্যবহার করতে হয়।

সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর মনে হয়েছে মুসার কাছে। রাইফেল দিয়ে মারতে যেখানে কষ্ট হয়, সেখানে সামান্য একটা বর্শা দিয়ে? ফুহ্! তবে কুলিটাকে সামনাসামনি কিছু বলেনি সে, লোকটা মনে কষ্ট পাবে ভেবে নিয়ে চলে এসেছে। আর কিছু না হোক, অন্তত হায়েনা তাড়াতে পারবে এটা দিয়ে।

'টর্চ জ্বালো,' নির্দেশ দিলো কিশোর।

জ্বাললো রবিন।

ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্তত এককুড়ি হায়েনা। মরা ছাগলটাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে। দূর, নিরাশ হলো শিকারীরা। আশা করেছিলো সিংহ আসবে। কিন্তু এ-কি জ্বালাতন!

আলোর পরোয়াই করলো না হায়েনাগুলো। ছাগলটাকে ঝোপের ভেতরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

'আরে গুলি করো না,' মুসা বললো। 'দেখছো কি? নিয়ে গেল তো। ভয় দেখিয়ে খেদাও।'

'হ্যাঁ, সিংহটাকেও তাড়াই আরকি। থাকুক। যা করার করুক।'

'কিন্তু আমাদের প্ল্যান নষ্ট করে দেবে। পাথর ছুঁড়ি?'

'এটা মন্দ বলোনি,' হাতড়াতে শুরু করলো কিশোর। 'এই যে, পেয়েছি।'

উঠে দাঁড়িয়ে জোরে পাথরটা ছুঁড়ে মারলো সে। একটা হায়েনার চোয়ালে গিয়ে লাগলো। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো ওটা। কোনো জানোয়ার ওরকম প্রাণ কাঁপানো চিৎকার করতে পারে, না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন। গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যায়।

ওই চিৎকারই সার। ভয়ও পেলো না হায়েনারা, চলেও গেল না। বরং মাথা উঁচু করে দেখতে লাগলো শত্রুদের। দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে এলো কয়েকটা। হুমকি দিলো।

হয়েনাকে ভীতু জীব বলা হয়। যারা বলে, তারা আসলে চেনে না জানোয়ারটাকে। একটা হায়েনা একা কোনো মানুষকে আক্রমণ করে না, এটা ঠিক, অবশ্যই যদি মানুষটা ঘুমন্ত না হয়। ঘুমিয়ে থাকলে দ্বিধা করে না। তাঁবুর কানার নিচ দিয়ে ভেতরে ঢুকে কামড়ে পা কিংবা মুখের মাংস কেটে নিয়ে দৌড় দেবে। তাতে অনেক শিকারী সারা জীবনের জন্য পঙ্গু কিংবা বিকৃত চেহারার হয়ে যায়। তবে জেগে থাকলে কিছুতেই মানুষকে একা আক্রমণ করতে সাহস করে না হায়েনা।

পুরো দলটা কাছাকাছি থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। অন্যেরা সাহায্য করবে এই আশা থাকলে তখন বেপরোয়া হয়ে যায় হায়েনা। একাই এসে আক্রমণ করে বসে। আর যদি দল বেঁধে থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। বোমার আড়ালে ছিলো বলেই হয়তো এতোক্ষণ ওদেরকে দেখতে পায়নি হায়েনারা। বাতাসও হয়তো ভাটি ছিলো। এখন পেয়েছে। চোখের পলকে ওদেরকে ঘিরে ফেললো জানোয়ার-গুলো। কাঁটাঝোপের বেড়ায় ফাঁক খুঁজছে ভেতরে ঢোকার জন্যে।

বেড়ার গায়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলছে রবিন। দেখছে, কোনো হায়েনার মাথা ঢুকে পড়লো কিনা। ঢুকলো একটা। রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মারলো কিশোর। বিকট একটা চিৎকার শোনা গেল। পলকে সরে গেল মুখটা। আরেকটা দেখা দিলো আরেক দিক দিয়ে। সেটাকে বর্শার ডাণ্ডা দিয়ে গুঁতো মারলো মুসা। অদৃশ্য হয়ে গেল ওটাও।

আরেক ফোকর দিয়ে দেখা দিলো আরেকটা। তারপর আরেকটা। পিটিয়ে চলেছে কিশোর আর মুসা। কিন্তু মুখ ঢোকানোর বিরাম নেই। বাড়ি মারার জন্যে রবিনও একটা লাঠিটাঠি খুঁজছে। চারপাশ দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দিচ্ছে হায়েনার দল। একই সঙ্গে এতো জায়গায় আলো ফেলা সম্ভব হচ্ছে না রবিনের পক্ষে। মুসা আর

কিশোরও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এভাবে চলতে থাকলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বোমার নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে হায়েনাদের কাছে।

এইবার ভয় পেলো তিন গোয়েন্দা। হায়েনার চোয়ালের জোরের কথা জানা আছে ওদের। এক কামড়ে মানুষের একটা পা বিচ্ছিন্ন করে ফেলাটা কিছুই না ওদের জন্যে। কোনোভাবেই দাঁত বসানোর সুযোগ দেয়া যাবে না ওগুলোকে। কিন্তু ঠেকাবেই বা কিভাবে? কোনো উপায় তো দেখা যাচ্ছে না।

যাদের মারতে এসেছে, অযাচিত ভাবে তাদেরই একজন এসে বাঁচিয়ে দিলো ওদেরকে। ভারি গর্জন শুনে চমকে গিয়ে বোমার বাইরে টর্চের আলো ফেললো রবিন। মস্ত এক সিংহ। হায়েনার হুটোপুটি শুনেই হয়তো ব্যাপার কি দেখতে এসেছে। বোমার কাছ থেকে সরে গেল হায়েনার দল, তবে একেবারে চলে গেল না। ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকে লম্বা লম্বা হাঁক ছাড়তে লাগলো।

বোমার কাছে এগিয়ে এলো সিংহটা। রাইফেল তাক করলো কিশোর। 'টর্চ ধরে রাখো,' রবিনকে নির্দেশ দিলো সে। হায়েনাগুলো গেছে, তাতে লাভ কিছুই হয়নি। এসে হাজির হয়েছে তার চেয়েও বড় বিপদ। তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে পড়েছে আরকি।

সিংহের মুখে টর্চের আলো কাঁপছে, তারমানে হাত কাঁপছে রবিনের।

'সোজা করে রাখো না,' কিশোর বললো।

'তুমি চুপ করে আছো কেন?' মুসা বললো। 'গুলি করলেই হয়।'

কিন্তু করলো না কিশোর।

দাঁড়িয়ে গেছে সিংহটা। তাকিয়ে রয়েছে আলোর দিকে। একটু ভয় পায়নি, বোধহয় অবাক হয়েছে। সিংহের স্বভাব বড় বিচিত্র। কোনোটা আলোকে ভয় পায়, কোনোটা পায় না। ক্যাম্পের আগুন দেখলে কাছে ঘেঁষে না, আবার ওদিকে গরম ছাইয়ের ওপর শুয়ে থাকতে বেশ পছন্দ করে। আরামে চোখ মোদে।

মানুষের চোখের দ্বিগুণ বড় এই সিংহটার চোখ। ধকধক করে জ্বলছে। একেবারে বেড়ালের চোখের মতো। অন্ধকারে বেড়ালের চোখে আলো পড়লে ঠিক এরকম করেই জ্বলে। আয়নার ওপর আলো পড়লে যেমন হয়, অনেকটা সেরকম।

জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিউরে উঠলো মুসা। 'কি হলো? দেরি করছো কেন? গুলি করো!'

তবু চুপ করে রয়েছে কিশোর। ট্রিগারে আঙুল, কিন্তু চাপ বাড়াচ্ছে না।

হিঁচিক হিঁচিক করে হাঁচি দিলো সিংহটা। নাকের ফুটো ছড়িয়ে গেছে। ছেলেদের গায়ের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে গেল তার কাছে একঝলক বাতাস। দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা। মাত্র পাঁচ ফুট দূরে। এতো কাছে থেকে গুলি করলে মিস করার প্রশ্নই ওঠে না।

ট্রিগার টানতে দ্বিধা করছে কিশোর। এটাই যে মানুষ-খেকোটা, তার কি

প্রমাণ আছে? নির্দোষ একটা জানোয়ারকে গুলি করা উচিত হবে না। অপেক্ষা করে দেখতে চাইছে সে, বুঝতে চাইছে এটাই আসল সিংহটা কিনা।

আলো নাচছে সিংহের মুখে। এমন ভাবে নাক কুঁচকালো, যেন গন্ধটা পছন্দ হয়নি তার। আস্তে ঘুরে তাকালো মরা ছাগলটার দিকে। তারপর ধীরেসুস্থে রাজকীয় চালে হেঁটে গিয়ে খেতে শুরু করলো ওটাকে।

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে রাইফেল নামিয়ে নিলো কিশোর। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছে। যেন তার হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে, রক্ত চলাচল করতে পারছে না ঠিকমতো। মুসার কাঁধে হাত রাখলো সে। কাঁপছে মুসাও। তবে ভয় যে পেয়েছে একথা স্বীকার করতে চাইলো না।

'খুব শীত, না?' মুসা বললো।

'হ্যাঁ। বেশি।'

রবিনও বললো, তার শীত লাগছে। আসলেই শীত। মধ্য আফ্রিকার আবহাওয়ার এই একটা ব্যাপার। দিনের বেলা যতো গরমই থাকুক, রাতে কনকনে ঠাণ্ডা পড়বে।

কেশর নাচিয়ে বিশাল মাথাটা ঘুরিয়ে ঝোপের দিকে তাকালো সিংহটা। অদ্ভুত একটা শব্দ করতে লাগলো। গর্জন নয়, ঘড়ঘড় নয়, মোলায়েম উম-উম-উম শব্দ।

'সঙ্গিনীকে ডাকছে,' ফিসফিস করে বললো কিশোর।

সে শুনেছে, সিংহেরা নাকি কথা বলতে পারে, অবশ্যই সিংহের ভাষায়। ভারি আঘ-আঘ-আঘের মানে খাবার খুঁজছে সিংহ। তেড়ে আসা সিংহ ভারি কাশি আর ঘোঁৎ-ঘোঁতের মিশ্র শব্দ করে। তার গর্জন শুনলে তল্লাট ছেড়ে পালায় বেশির ভাগ জন্তুজানোয়ার, তাই খাবার শেষ করার আগে গর্জন করে না সে। খাওয়ার পর করে। আর সে-কি হাঁক! কয়েক মাইল দূর থেকে শোনা যায়। হাতির ডাকের চেয়েও জোরালো সেই শব্দ, বেশি দূর থেকে শোনা যায়। চিৎকার করে যেন ঘোষণা করতে চায় পশুরাজ, 'আমি এসেছি, মেরেছি, এবং খেয়েছি। আমি মহাবীর,মহাক্ষমতাধর, পশুরাজ সিংহ।'

সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার সময় একধরনের শব্দ করে সিংহ,আবার বাচ্চার সঙ্গে বলার সময় আরেক রকম।

এই সিংহটা সেরকম কোনো শব্দ করলো না। তারমানে সঙ্গিনীর সঙ্গে আলোচনা কিংবা খোশগল্প করছে না এখন সে। জরুরী কিছু বলেছে। জবাবে মৃদু শিস শোনা গেল, যেন ডেকে উঠলো ঘুমন্ত একটা পাখি। না শুনলে কে ভাবতে পারবে এরকম করে শিস দিতে পারে সিংহ? এই শিস শুনে মানুষ ধোঁকা খাবে, আর জন্তুজানোয়ারেরা চমকে যাবে না, সতর্ক হবে না।

বিরাট একটা তামাটে রঙের সিংহী ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো

রবিনের টর্চের আলোয়। সরে গিয়ে সঙ্গিনীকে খাওয়ার জায়গা করে দিলো সিংহটা। খাবার নিয়ে বাঘ, চিতাবাঘ কিংবা হায়েনার মতো হিংসে করে না সিংহেরা। ভাগাভাগি করে খেতে আপত্তি করে না। তবে অবশ্যই দলের গোদা পুরুষ সিংহটা আগে তার ভাগ খাবে, তারপর জায়গা করে দেবে সিংহী আর বাচ্চাদের।

মরা ছাগলের দিকে এগোতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সিংহীটা। মাথা ঘুরিয়ে তাকালো বোমার দিকে। গলা লম্বা করে বাতাস শুঁকলো। ওই মুহূর্তে ছেলেদের মনে হলো, ইস্, মানুষের শরীরে যদি কোনো গন্ধ না থাকতো!

শরীরটা নিচু করে ফেললো সিংহী। সাপের মতো বুকে হেঁটে এগোতে শুরু করলো বোমার দিকে। এতোক্ষণ স্থির ছিলো রবিনের টর্চের আলো, আবার কাঁপতে শুরু করলো। মুসার ঘাড়ের রোম খাড়া হয়ে গেছে জানোয়ারটার চাউনি দেখে। শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল কিশোরের। রাইফেল তুলে কাঁধে ঠেকালো সে।

তিন

সোজা বোমার দিকে এগিয়ে আসছে সিংহী। বড় বড় হয়ে গেছে নাকের ফুটো। যেন গন্ধ শুঁকেই আন্দাজ করতে চাইছে বোমার ভেতরে কি আছে।

কাছে এসে থাবা দিয়ে আলতো করে একটা নাড়া দিলো বেড়ায়। থরথর করে কেঁপে উঠলো পুরো বোমা। আরেকটু জোরে নাড়া দিলেই ধসে পড়তো বেড়া। কিন্তু তা করলো না। কাঁটার খোঁচা পছন্দ হয়নি তার। উঠে দাঁড়িয়ে চক্কর দিতে শুরু করলো বোমাটাকে। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে রবিনের টর্চের আলো।

'গুলি করছো না কেন?' মুসার প্রশ্ন।

'বুঝতে চাইছি, মানুষখেকো, নাকি শুধুই কৌতূহল,' কিশোরের জানা আছে মানুষ মহিলাদের মতোই সিংহীরাও কৌতূহলী হয়।

চক্কর শেষ করে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বেড়ার ওপরে দু'পা তুলে দিলো সিংহী। উঁকি মেরে ভেতরে দেখতে লাগলো।

বর্শায় হাত রাখলো মুসা।

'চুপ!' সিংহীর ওপর থেকে চোখ না সরিয়ে হুঁশিয়ার করলো কিশোর। 'একদম নড়বে না!'

পরের দশটা সেকেণ্ডকে লাগলো দশটা ঘণ্টার মতো। অবশেষে একটা হাঁচি দিয়ে মানুষের বদ গন্ধটা যেন নাক থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে থাবা মাটিতে নামিয়ে নিলো সিংহী। ধীরে ধীরে হেঁটে গেল তার স্বামীর কাছে ডিনারে অংশ নেয়ার জন্যে।

আরেকবার বন্দুক নামালো কিশোর। পরীক্ষায় পাস করেছে সিংহী। প্রমাণ করে দিয়ে গেছে যে সে মানুষখেকো নয়।

এতোবড় দুটো জানোয়ারের জন্যে একটা ছাগল কিছুই নয়। একটারও পেট ভরলো না। ভরপেট না হোক, নাস্তা তো সারা হলো, এমনি একটা ভঙ্গি করেই যেন আকাশের দিকে মুখ তুলে আহার-সমাপ্তির ঘোষণা দিলো পশুরাজ, অর্থাৎ গর্জন করে উঠলো।

খাওয়ার ব্যাপারে যে মোটেই হিংসুক নয় সিংহেরা, তার একটা বড় প্রমাণ দিলো এই সিংহদুটো। ছোট একটা ছাগলে একজনেরই ঠিকমতো হয় না, অথচ দু'জনে খেলো ভাগাভাগি করে, তার পরেও রেখে দিলো অনেকখানি।

পশুরাজের গর্জন শুনে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো আটটা সিংহ। এগিয়ে গেল ছাগলের দেহাবশেষের দিকে। আরেকটা সিংহ বেরোলো ওগুলোর পর পরই। তবে ছাগলের দিকে গেল না এই নয় নম্বর সিংহটা। দলের কেউ নয়, বোঝা গেল তার হাবভাবেই। বয়েসে অনেক বড়, এমনকি প্রথম সিংহটার চেয়েও। আকারেও বিশাল। কালো কুচকুচে ঘন কেশর, অথচ সিংহদের কেশরের রঙ সাধারণত হালকা বাদামী হয়। সরে এসে বসে পড়লো বোমার কাছাকাছি। তাকিয়ে রয়েছে টর্চের আলোর দিকে।

পেটে খিদে, ঠোঁটের কোণের লালা গড়ানো দেখেই বোঝা যায়। তবু ছাগলটার দিকে গেল না সে। কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে এগিয়ে আসতে লাগলো বোমার দিকে।

'এই যে, আসছে আরেকটা,' কিশোর বললো। সতর্ক হলো আবার।

সিংহের এই আসা যাওয়ার ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে ওরা। প্রথমবারের মতো ভড়কালো না। বারবার এসে নাক সিঁটকাবে সিংহ, হাঁচি দেবে, ঘুরবেঘারবে, তারপর চলে যাবে, এই তো দাঁড়িয়েছে। এটাও হয়তো একই কাণ্ড করবে। মানুষের গন্ধে বিরক্ত হয়ে মুখ বাঁকিয়ে চলে যাবে ছাগল খাওয়ার জন্যে।

ঠিক এই সময় চুলকাতে শুরু করলো মুসা। 'কিসে কামড়াচ্ছে।'

'নার্ভাসনেস,' নিচু গলায় বললো কিশোর। 'ভয় পেলে অনেক সময় হয় ওরকম।'

তারপর সে নিজেও অনুভব করলো ব্যাপারটা। কি যেন উঠে এলো পা বেয়ে। কুট করে কামড়ে দিলো। 'পিঁপড়ে!' প্রায় চিৎকার করে উঠলো সে।

ইস্, আর সময় পেলো না হতচ্ছাড়ারা! সিংহের ঝামেলাটা মিটে যাওয়াতক অপেক্ষা করলে এমন কি ক্ষতি হতো?

বোমা তৈরির আগে জায়গাটা ভালোমতো দেখে নেয়া হয়েছে পিঁপড়ে আছে কিনা। তখন কিচ্ছু চোখে পড়েনি। না পিঁপড়ের বাসা, না কোনো পিঁপড়ে। কামড়েই বোঝা যাচ্ছে সৈনিক পিঁপড়ে। আল্লাহই জানে কোত্থেকে আসছে!

সামরিক বাহিনীর মতোই মার্চ করে এসেছে হয়তো বহুদূরের কোনো এলাকা থেকে। আর পড়বি তো পড় বোমাটা পড়েছে একেবারে ওদের চলার পথে।

রবিনও কামড় খেয়েছে। উফ করে উঠে বললো, 'জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে নাকিরে বাবা!' হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেললো কয়েকটা পিঁপড়েকে।

'খাইছে! উফ!' ঝাড়তে শুরু করলো মুসাও।

রবিনের হাতে টর্চ, এই অবস্থায় অস্থির হলে মহাবিপদ। তাড়াতাড়ি বললো কিশোর, 'আস্তে, রবিন, অতো নড়ো না। মুসা, চুপ করো।'

'বলে কি! চুপ করবো কিভাবে? খেয়ে ফেললো তো!'

'পিঁপড়েরা খেতে এখনও দেরি আছে। সিংহের দেরি হবে না।'

'ওটা আর কি করবে? ওরকম কয়টাই তো এলো আর গেল। কিছুক্ষণ দেখুক। আপনিই চলে যাবে।'

'এটার ভাবভঙ্গি কিন্তু সুবিধের লাগছে না আমার কাছে। মনে হচ্ছে আগের দুটোর মতো নয় এটা।'

বার কয়েক এপাশ ওপাশ ঝাঁকি খেলো সিংহের লেজটা। তারপর সোজা হয়ে গেল বন্দুকের নলের মতো। মাথার সাথে লেপটে গেছে কান। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। গর্জন করছে না, শুধু মোলায়েম একধরনের আঘ আঘ শব্দ।

যে অ্যাঙ্গেলে রয়েছে তাতে সিংহের হৃদপিণ্ডে গুলি লাগাতে পারবে না কিশোর। মারতে হলে এখন মগজে গুলি করতে হবে। মাথার ওপরের অংশে যেখানে মগজ আছে বলে মনে হয়, সিংহের মগজ আসলে ওখানে থাকে না। ওখানটায় শুধুই চুল, আর কিচ্ছু নেই। মগজের নাগাল পেতে হলে দুই চোখের ঠিক মাঝখানে নিশানা করতে হবে। রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করলো সে।

শরীরটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছে সিংহ। এই অবস্থাকে বলা হয় 'স্প্রেড', অর্থাৎ ছড়িয়ে থাকা। তারপর দেবে লাফ।

কামড়ে চলেছে পিঁপড়েগুলো। উপেক্ষা করার চেষ্টা করলো কিশোর। সিংহের নখগুলো মাটিতে আঁচড় বসানোর সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলো সে। ঠিক এই সময়ে থাণ্ডারফ্ল্যাশ ছুঁড়লো রবিন। সিংহের নাকের নিচে ফাটলো ওটা। বেয়াড়া জিনিসটাকে এক চড় মেরে বোমার ভেতরে লাফিয়ে পড়লো সে।

দ্রুত ঘটতে লাগলো ঘটনা। ধাক্কা লেগে রবিনের হাত থেকে টর্চ পড়ে গেল। নিভলো না, জ্বলতে থাকলো ঘাসের ওপর শুয়ে। বর্শাটা তোলার চেষ্টা করছে মুসা। সিংহের পাঁচশো পাউণ্ড ওজনের শরীরের তলায় চাপা পড়েছে ওটা।

সিংহের থাবার কাছ থেকে লাফিয়ে সরে গেছে কিশোর। আরেকবার গুলি করার ভরসা পাচ্ছে না, যদি ফসকে গিয়ে রবিন কিংবা মুসার গায়ে লাগে? অনেক চেষ্টা করে শেষে রাইফেলের নলটা রাখলো সিংহের মাথায়। কিন্তু গুলি করার আগেই এলো আঘাত। প্রচণ্ড থাবা লাগলো নলের গায়ে। ওরকম একটা আঘাতেই

মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়ে মরে যায় জেব্রার মতো জানোয়ার। ঘোড়ার চেয়ে কম শক্তিশালী নয় ওগুলো। বাঁকা হয়ে গেল বন্দুকের নল।

শেষ মুহূর্তে সামলে নিয়েছে কিশোর। ওই সময় ট্রিগারে চাপ লাগলে ফেটে যেতো নল, ওখানেই মারা পড়তো তিন গোয়েন্দা আর সিংহটা।

ট্রিগার থেকে আঙুল সরিয়ে আনলো সে। হাঁ করে তাকে কামড়াতে এলো সিংহ। খোলা হাঁয়ের ভেতর বাঁকা নলটাই ঢুকিয়ে দিয়ে গলায় খোঁচা মারলো কিশোর। আরো জোরে ঠেলে নলটা একেবারে গলার ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো।

পড়ে গেল সিংহটা। আঁচড়ে খামচে রাইফেলটাকে মুখ থেকে বের করার চেষ্টা করছে। গড়াগড়ি খেতে শুরু করলো মাটিতে। মুখের ভেতর রাইফেল তো আছেই, আরও একটা ব্যাপার বিরক্ত করছে এখন তাকে।

কামড়! পিঁপড়ের কামড়!

উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিলো। মুখ থেকে ফেলে দিয়েছে রাইফেলটা। কামড়ে, চড় মেরে শরীর থেকে পিঁপড়ে খসানোর চেষ্টা করছে। গলার মধ্যে ঢুকে পড়েছে পিঁপড়ে, কানে ঢুকছে, চোখে ঢুকছে। কামড়ে কামড়ে পাগল করে দেবে যেন তাকে। বোমার মধ্যে নাচানাচি আরম্ভ করেছে সে। ভুলেই গেছে যেন ছেলেদের অস্তিত্ব।

পিঁপড়েরাও নতুন শিকার পেয়ে পুরনো শিকারদের ছেড়ে দিয়েছে আপাতত। সিংহটাকে কাবু করায় মন দিয়েছে ওগুলো। বড় বড় পিঁপড়ে, এক ইঞ্চি লম্বা, আর সাংঘাতিক ধারালো চিমটার মতো চোয়াল।

হাজারে হাজারে এসে আক্রমণ করে সিংহকে মেরে ফেলে সৈনিক পিঁপড়ে। যাওয়ার সময় ঝকঝকে কঙ্কালটা শুধু রেখে যায়। ছোট্ট এই জীবটিকে আসতে দেখলেই তাই হাতি-গণ্ডারের মতো পশুরাও প্রাণভয়ে পালায়।

আর কোনো উপায় না দেখে লাফ দিয়ে বোমা থেকে বেরিয়ে এলো সিংহটা। অন্ধকারের দিকে দৌড় দিলো। ঝোপঝাড় ভেঙে ওটার ছুটে যাওয়া থেকেই আন্দাজ করা গেল ডোবার দিকে চলেছে।

টর্চটা তুলে কিশোর আর মুসার মুখ দেখলো রবিন। ওদের মুখ, হাত, কাপড় রক্তাক্ত হয়ে আছে। কোথা থেকে যে রক্তটা বেরোলো দেখা গেল না। আঁচড়-টাচড় অনেকই আছে, কিন্তু কোনোটাই এতো গভীর নয় যে রক্ত বেরোতে পারে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'রক্তটা সিংহের, আমাদের নয়। জায়গামতো গুলি লাগাতে পারিনি। মাথার চামড়া কেটেছে বড়জোর।'

'চলো,' কনুইয়ের কাছে হাত বোলাতে বোলাতে বললো মুসা, 'ভাগি এখান থেকে। যথেষ্ট হয়েছে।'

'না, হয়নি। এখনও বাকি আছে।'

বাকিটা কি আছে বুঝতে পারলো না মুসা। রবিন বুঝিয়ে দিলো। হিংস্র

জানোয়ারকে জখম করলে তার পিছু নিয়ে গিয়ে খুঁজে বের করে শেষ করে দিতে হয় ওটাকে। নইলে ব্যথায় কষ্ট পায়। তাছাড়া ভয়ানক বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে বসে তখন। সাধারণ জানোয়ারই ভয়ংকর হয়ে যায়, মানুষখেকো হলে তো কথাই নেই।

'সকালেও তো যাওয়া যায়,' মুসা বললো।

'এখুনি যেতে হবে,' দৃঢ়কণ্ঠে বললো কিশোর। 'সকাল হতে হতে বহুদূর চলে যাবে।'

'কিন্তু যাবে কি নিয়ে? রাইফেলটা তো বাদ।'

'বর্শাটা তো আছে। এসো। দাঁড়াও, আগে আঁচড়গুলোর ব্যবস্থা করি।' বুশ জ্যাকেটের পকেট থেকে পেনিসিলিন মলমের একটা টিউব বের করলো কিশোর।

'এখনি লাগানোর কি দরকার? এমন তো কিছু কাটেনি।'

'সিংহের নখের একটা আঁচড়ই মরণ ডেকে আনতে পারে তোমার। ব্লাড পয়জনিং। নখ পরিষ্কার রাখে না সিংহ। নখের নিচে মাংস আর রক্ত লেগে থাকে, পচে বিষাক্ত হয়ে যায়। ওই বিষ রক্তে ঢুকলে মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। একজনের কথা জানি, মাত্র একটা আঁচড় ওকে হাসপাতালের বিছানায় ছয় মাস শুইয়ে রেখেছিলো।'

মুসা আর রবিনের আঁচড়গুলোতে পেনিসিলিন মলম ডলে লাগিয়ে দিলো কিশোর। তারপর লাগালো নিজের গুলোতে। 'হয়েছে। চলো এবার।'

'সিংহ এ-এলাকায় একটা নয়, আরও আছে।' মরা ছাগলটা যেখানে বেঁধেছিলো সেখানে টর্চের আলো ফেললো রবিন। ছাগলটাও নেই, সিংহগুলোও চলে গেছ।

'গুড,' কিশোর বললো। 'ওদের নিয়ে ভাবতে হলো না আর।'

'অতো শিওর হয়ো না। কাছাকাছিই থাকতে পারে। ঝোপের মধ্যে শুয়ে নাস্তা হজম করছে হয়তো। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে থাকলেও অবাক হবো না। মানুষখেকো না হতে পারে, কিন্তু আমরা গায়ের ওপর গিয়ে পড়লে ছেড়ে কথা কইবে না।'

বোমার বেড়া ফাঁক করে বেরিয়ে গেছে সিংহ। বর্শার মাথা দিয়ে চাড় মেরে ফাঁকটা আরও বড় করলো মুসা। বেরোলো ওখান দিয়ে। তার পেছনে টর্চ ধরে বেরোলো রবিন। সবশেষে কিশোর।

যেখানে লাফিয়ে পড়েছে সিংহটা সেখানে গভীর হয়ে মাটিতে বসে গেছে নখ। তারপর সোজা এগিয়েছে ডোবার দিকে, সারা পথে রক্তের দাগ রেখে গেছে। সেই চিহ্ন ধরে সাবধানে এগিয়ে চললো গোয়েন্দারা। তীক্ষ্ণ চোখ রেখেছে প্রতিটি ঝোপ, প্রতিটি পাথরের ওপর। যে কোনোটার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে সিংহ, কিংবা যে কোনো পাথর আচমকা সিংহের রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে

ওদের ঘাড়ে। ঝোপের ভেতর থেকে শোনা গেল ঘুমজড়ানো গোঙানি আর ঘড়ঘড়। অন্য কোনো সিংহ হবে। ডোবার পাড়ে এসে দেখা গেল তিনটে সিংহ পানি খাচ্ছে। একেবারে ওগুলোর মুখোমুখি পড়ে গেল ওরা।

'একদম চুপ,' হুঁশিয়ার করলো কিশোর। 'নড়বে না।'

টর্চের দিকে মুখ তুলে তাকালো সিংহগুলো। ভয় পেয়েছে ছেলেরা এটা প্রকাশ করা চলবে না। সব চেয়ে শান্ত সিংহটাও অনেক সময় পলায়মান মানুষকে তাড়া করার লোভ সামলাতে পারে না।

'পিছে হটো,' ফিসফিসিয়ে বললো কিশোর। 'খুব আস্তে আস্তে।'

জানোয়ারগুলোর ওপর চোখ স্থির রেখে ধীরে ধীরে পিছে হটতে লাগলো তিনজনে। তাড়াহুড়ো করলো না। পিছু হটতে গিয়ে কোনো শিকড়ে বা পাথরে পা বেঁধে পড়ে যাওয়াটাও এখন বিপজ্জনক। উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ আর না-ও পেতে পারে।

দুরুদুরু করছে কিশোরের বুক। বিপদের পরিমাণ আঁচ করতে পারছে। পেছন থেকে এসে এখন আহত সিংহটা হামলা চালালে কিছুই করতে পারবে না ওরা। কাজেই একটা চোখ রেখেছে সামনের সিংহগুলোর ওপর, আরেক চোখ দিয়ে রক্তের চিহ্ন দেখার চেষ্টা করছে। পানি খেয়ে কোনখান দিয়ে উঠেছে সিংহটা? পায়ের ছাপ খুঁজে লাভ নেই। আশেপাশে অসংখ্য সিংহের পায়ের ছাপ। কোনটা যে আহতটার, বোঝার উপায় নেই।

ডোবার ধার ঘুরে অর্ধেকটা আসার পর যা খুঁজছিলো পেয়ে গেল। একটা পাথরে রক্ত লেগে রয়েছে। রক্তের চিহ্ন চলে গেছে বনের ভেতর।

যতোটা আশা করেছিলো, তার চেয়ে জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। খোলা জায়গায় থাকেনি সিংহটা, ঝোপঝাড়ে গিয়ে ঢুকেছে। ওদের আশেপাশে যে কোনো একটা ঝোপে লুকিয়ে থাকতে পারে। মাথায় জখমের যন্ত্রণা, আর বুক ভর্তি ঘৃণা। যদি টের পায় শিকারীরা ওর পিছু নিয়েছে, ভয়ংকর হয়ে উঠবে। লাফিয়ে পড়তে তৈরি হচ্ছে কিনা এতোক্ষণে কে জানে! এক লাফে বারো ফুট ওপর দিয়ে চল্লিশ ফুট দূরে এসে পড়তে পারে সিংহ। কেউ কেউ নাকি পঁয়তাল্লিশ ফুট পেরোতেও দেখেছে। এতোটা দূরে আসার দরকার পড়বে না এই জানোয়ারটার। কাছাকাছি অনেক ঝোপ রয়েছে। লাফ দেয়ার ইচ্ছে হলে দশ ফুট দূর থেকেও দিতে পারে, ওদের অলক্ষ্যে।

এতো সতর্ক থাকা সত্ত্বেও গাছের গুঁড়িতে পা লেগে পড়ে গেল মুসা।

'দেখে চলতে পারো না!' রেগে গেল কিশোর। ওঠার চেষ্টা করছে মুসা। 'কপাল ভালো তোমার, সিংহটা ধারেকাছে নেই।'

'কি করে বুঝলে?' রবিনের প্রশ্ন।

'থাকলে এতোক্ষণ বসে থাকতো না। এসে পড়তো গায়ের ওপর। রক্তের

চিহ্নও বলে দিচ্ছে এখানে থামেনি সে।'

রক্তের দাগ ধরে আরও কিছুদূর এগোলো ওরা। হঠাৎ থেমে গেল কিশোর। বললো, 'রবিন, টর্চটা ঘোরাও তো। আরও কাছে। এখানে।'

প্রতিটি পাতা, প্রতিটি ডাল পরখ করে দেখলো সে। রক্ত আর চোখে পড়ছে না। রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল নাকি? নাহ্, সেটা বোধহয় সম্ভব না। আর তা যদি না হয়, সিংহটা তাহলে খুব কাছেই কোথাও রয়েছে। কোনো ঝোপের ভেতর।

পা টিপে টিপে একটা ঝোপের দিকে এগোলো সে। উঁকি দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করলো। পাশ ঘুরে এগোবে কিনা ভাবছে এই সময় চিৎকার করে উঠলো রবিন, 'খবরদার! পেছনে!'

পাঁই করে ঘুরলো কিশোর। সিংহের ঝাঁপটা রোখার জন্যেই যেন নিজের অজান্তে বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা। কিন্তু মানুষ যা আশা করে, সিংহ প্রায়ই সেটা করে না। লাফিয়ে এসে পড়লো না গায়ের ওপর।

একজোড়া জ্বলন্ত কয়লা দেখা যাচ্ছে ঝোপের ভেতর। তার ওপরে নোংরা একটা মাথা, রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে চামড়ায়।

মাটিতে শরীর মিশিয়ে উপুড় হয়ে আছে জানোয়ারটা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে আসছে বুকে হেঁটে। গর্জন করলো না, কাশলো না, বেড়ালের মতো গরগর করছে। তবে বেড়ালের মতো আন্তরিক নয়, ভালোবাসা নেই সেই শব্দে, রয়েছে তীব্র ঘৃণা। শুনলে গায়ের রোম খাড়া হয়ে যায়। শুধু গলার ভেতর থেকে নয় যেন, শব্দটা আসছে পুরো শরীরটার ভেতর থেকেই। এর ভয়াবহতা না শুনে বলে বোঝানো যাবে না। মেঘের চাপা গুরুগুরুর সঙ্গে এর কিছুটা মিল রয়েছে।

'দেখি, বর্শাটা,' হাত বাড়ালো কিশোর।

'না, আমিই পারবো!' মাসাই শিকারীর শিকারের নেশা জেগে উঠেছে যেন নিগ্রো রক্তে। ভয়ডর এ-মুহূর্তে একেবারে চলে গেছে মুসার। বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। ভূত ছাড়া দুনিয়ার কোনো কিছুকেই ভয় করবে না এখন ও। 'তোমরা সরে যাও।'

'দাও!'

'না। তোমার চেয়ে আমার গায়ে জোর বেশি। তাছাড়া আমাকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে কি করে বর্শা চালাতে হয়।'

'খুব সাবধান। গুড লাক। রবিন, টর্চটা আরও সোজা করে ধরো তো।'

আর কথা বলার সময় নেই। আগামী দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই মুসার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। হয় মরবে, নয়তো বাঁচবে। বাঁচলে আর কিশোর বলা যাবে না মুসাকে, পুরুদস্তুর পুরুষ মানুষ হয়ে যাবে, মাসাই সমাজের নিয়ম অনুসারে। যতোই বয়েস হোক, একা একটা সিংহ মারতে না পারলে তাকে পুরুষ বলা যাবে

না কিছুতেই। মুসা মাসাই নয়, কিন্তু সিংহ মেরে পুরুষ হতে দোষ কি?

অনুশোচনা হচ্ছে কিশোরের। মস্ত বোকামি করে ফেলেছে। এভাবে চলে আসাটা একদম ঠিক হয়নি। তাঁবুতে ফিরে গিয়ে আরেকটা রাইফেল অন্তত আনা উচিত ছিলো। মুসা যদি এখন মারা যায়, তাহলে তার দোষেই মরবে, সারা জীবন নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না সে।

হলদে চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে এই ঠাণ্ডার মধ্যেও দরদর করে ঘামছে রবিন। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে। বুকের খাঁচা থেকে যেন বেরিয়ে পড়ার ষড়যন্ত্র করছে হৃৎপিণ্ডটা। টর্চটা ভিজে চুপচুপে হাত থেকে পিছলে না গেলেই হয় এখন।

লেজটা বন্দুকের নলের মতো সোজা করে ফেলেছে সিংহ। একটানা গরগর করে চলেছে।

বর্শা ছুঁড়ে মেরে ওটাকে ঠেকানো যাবে না, বুঝতে পারছে মুসা। আরেকটা কাজ করলো সে। ডাণ্ডার নিচটা মাটিতে রেখে ফলাটা কোণাকুণি করে ধরলো সিংহের দিকে। লাফিয়ে এসে পড়লে যেন বর্শার ওপরে পড়ে। মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলো, 'খোদা, লাফ যেন দেয়! খোদা…'

বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গকেও যেন হার মানালো সিংহটা, এতো দ্রুত লাফিয়ে এসে পড়লো। সাপের ছোবলের চেয়ে ক্ষিপ্র তার গতি।

এক মুহূর্তে মুসা তাকিয়ে ছিলো মাটিতে বুক ঠেকিয়ে রাখা একটা সিংহের দিকে, দশ ফুট দূরে, পর মুহূর্তেই একেবারে তার গায়ের কাছে এসে পড়লো ওটা। যেন পাঁচশো পাউণ্ড ওজনের একটা বুলেট।

মুসার ডাক শুনলেন আল্লাহ। বর্শার ওপরেই এসে পড়লো সিংহ। বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলো ধারালো ফলা। প্রচণ্ড ধাক্কায় কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লো মুসা। মাটিতে পড়ে গেছে সিংহটা। বিশাল হাঁ করে বর্শার ডাণ্ডাটা কামড়ানোর চেষ্টা করছে। ভীষণ রাগে বিকট গর্জন করে উঠলো। উঠে দাঁড়িয়েই পড়ে গেল আবার। আবার উঠলো, আবার পড়লো। এতো লম্বা একটা অস্ত্র শরীরে গাঁথা, স্থির হতে দিচ্ছে না তাকে।

আরও বার দুই উঠলো আর পড়লো সিংহটা। তারপর আর পারলো না। কয়েকবার খিঁচুনি দিয়ে নিথর হয়ে গেল শরীরটা।

দুর্বল ভঙ্গিতে কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসলো মুসা। একটু আগের শক্তি সাহস কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই আর। তার দু'পাশে ধপ করে বসে পড়লো রবিন আর কিশোর। দু'দিক থেকে কাঁধে হাত রাখলো। কথা বলার চেষ্টা করলো সে। একটা আওয়াজ বেরোলো না গলা দিয়ে।

চার

এতো সুন্দর রাজকীয় একটা জানোয়ারকে মেরে খুশি হতে পারলো না মুসা। কিশোর আর রবিনও খুশি নয়। ওরা জানোয়ার ধরতেই আগ্রহী, মারতে নয়। মেরে ফেলার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই! নেহায়েত মানুষখেকো বলেই…

আরও একজন খুশি হতে পারেনি সিংহটা মারা যাওয়ায়। রাজা মাকুমা।

'আমার বিশ্বাস হয় না,' স্টেশন মাস্টার কিমবার কাছে খবরটা শুনে বললো সে। ঘোঁৎঘোঁৎ করলো। 'তিনটে ছেলে একাজ করেছে? নিশ্চয় কুলিরা ওদের সাহায্য করেছে। আমি অর্ডার দিয়েছিলাম…'

'আপনার অর্ডার পালন করা হয়েছে। ছেলেগুলো একাই মেরেছে।'

'জখম হয়েছে?'

'সিংহটা আঁচড়ে দিয়েছে ওদেরকে।'

উজ্জ্বল হলো মাকুমার চোখ। 'খুব খারাপ কথা। হাসপাতালে গেছে তো? বাঁচবে?'

'বাঁচবে। হাসপাতালে যাওয়ার দরকার হয়নি।'

'বললে না আঁচড়ে দিয়েছে? শীঘ্রি বিযাক্ত হয়ে যাবে রক্ত। মরবে তখন। খুব খারাপ কথা।'

'শাদা মানুষের কড়া ওষুধ লাগিয়েছে ক্ষতগুলোতে। কিছুই হবে না ওদের। মরবে না।'

রাজা মাকুমার কালো মুখটা আরও কালো হয়ে গেল যেন। 'নিশ্চয়ই মরবে!' তারপর হঠাৎই যেন লক্ষ্য করলো, তার কথায় অবাক হয়েছে কিমবা। তাড়াতাড়ি যোগ করলো, 'মানে, আমি বলছি ওদের একটু দেখাশোনা করা দরকার, নইলে সত্যিই মরবে। আমাদের ওঝাকে অর্ডার দিয়ে দেবো, যাতে ওদের জন্যে কিছু মন্ত্রটন্ত্র পড়ে। বলবে, কোনো ভয় নেই। আমার কানে যখন খবরটা পৌঁছেছে, আর ভাবনা নেই ওদের। বলবে ওদেরকে, বুঝেছো?'

'বলবো।'

সত্যিই বললো কিমবা। নোংরা, ছোট্ট স্টেশনের অফিস রুমে বসে স্টেশন মাস্টারের মুখে ওদের নিরাপত্তার খবর শুনলো তিন গোয়েন্দা। রাজা মাকুমা নাকি ওদেরকে ভালো রাখার জন্যে সব ব্যবস্থাই করছে।

অফিস থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। প্ল্যাটফর্ম ধরে হেঁটে চললো। অবাকই হয়েছে খবরটা শুনে।

'কেন চাইছে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলো কিশোর। চিমটি কাটলো নিচের ঠোঁটে। 'মানে, মাকুমা কেন আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইছে যে সে আমাদের নিরাপদে রাখতে চায়? আমরা সতর্ক না থাকলে বিপদে পড়বো, জানে। আর সে-

জন্যেই হয়তো কায়দা করে বিপদে ফেলতে চাইছে। ব্যাটা আমাদের পেছনে লেগেছে কেন?'

'চেহারা দেখে কিন্তু খুনীই মনে হয়,' রবিন মন্তব্য করলো। 'আচ্ছা, কিমবাও এসবে নেই তো? সিংহ মারার জন্যে সে-ও আমাদের চাপাচাপি করেছে। দু'জনে মিলে কোনো ষড়যন্ত্র করেনি তো?'

'আমার কিন্তু ভালোই মনে হয় লোকটাকে,' মুসা বললো। 'সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে মুখে।'

'শুধু হাসলেই মানুষ ভালো হয়ে যায় না,' বললো কিশোর। 'হ্যামলেটে পড়োনি—স্মাইল, অ্যাণ্ড স্মাইল, অ্যাণ্ড বি আ ভিলেন।'

'নাহ্, পড়িনি। শেক্সপিয়ার পড়ার সময় কোথায় আমার। সাহিত্য আলোচনা রেখে এখন চলো গিয়ে একটু ঘুমাই-টুমাই।'

রেললাইনের ধার ঘেঁষে তাঁবু ফেলা হয়েছে। রেলশ্রমিকদের ক্যাম্প এটা।

বিছানায় শুয়ে মুসা বললো, 'কাল দুপুরের আগে আর ঘুম ভাঙবে না।' বড় করে হাই তুললো সে।

কিন্তু দুপুর তো অনেক দূর, সকালের আগেই ঘুম ভেঙে গেল। অদ্ভুত নাক ডাকানোর শব্দে। কিশোর কিংবা রবিন কখনও নাক ডাকায় না। পাশের তাঁবুতে কেউ? না, আরও অনেক কাছে নাক ডাকছে। কিশোরই হবে হয়তো। ডাকাক গিয়ে। অযথা ঘুম ভাঙিয়ে লাভ নেই। শব্দটা উপেক্ষা করার চেষ্টা করলো সে। একটা বালিশে এক কান চেপে ধরে আরেক কানের ওপর আরেকটা বালিশ চাপা দিলো।

হলো না। এরকম শব্দ হতে থাকলে ঘুমোতে পারবে না। কিশোরকে ডাকতে যাবে, এই সময় কিশোরই তাকে ডাকলো, 'মুসা, এই মুসা, ওঠো। এতো জোরে নাক ডাকাচ্ছো কেন? ঘুমোতে পারছি না!'

'আমি তো ভাবলাম তুমি।'

'তাই? তাহলে রবিন।'

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো রবিন, 'না, আমি না। হায়েনা-টায়েনা হবে। তাঁবুর ভেতরেই মনে হচ্ছে?'

'দাঁড়াও, দেখি।' বালিশের পাশে রাখা টর্চটা তুলে নিয়ে জ্বাললো কিশোর।

কিশোর আর রবিনের চারপায়ার মাঝখানের মাটিতে দেখা গেল ওটাকে, হায়েনার চেয়ে অনেক বড়। বিশাল এক সিংহ। কালো কেশর। যে সিংহটাকে মেরেছে, ওটারই মতো দেখতে।

'খাইছে!' আঁতকে উঠলো মুসা। কথা বলতে ভয় পাচ্ছে। ফিসফিসিয়ে বললো, 'ভূ-ভূত নাতো! সিংহের ভূত...'

জবাব দিলো না কিশোর। তাঁবুর একদিকের কানা ঢিলে হয়ে ঝুলছে দেখে বুঝে নিলো কোন পথে ঢুকেছে সিংহটা। বিচিত্র নাক ডাকানোর শব্দ করে

তিনজনের ওপরই চোখ বোলাতে লাগলো সে। যেন মুরগী বাছাই করছে জবাইয়ের জন্যে। কোনটা হলে ভালো হয় বুঝতে চাইছে।

বিছানার মাথার কাছে চেয়ারে ল্যাম্প রাখা, নিভানো। ওটার পাশেই রাখা আছে একটা '৪৫ ক্যালিবারের রিভলভার। প্রয়োজনের সময় হাত বাড়ালেই যাতে পাওয়া যায়। তুলে নিতে গেল কিশোর। কিন্তু সিংহটা তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষিপ্র। আচমকা একটা থাবা বাড়িয়ে দিলো সে। ঠেলা লেগে উল্টে পড়লো চেয়ার। মাটিতে পড়ে ঝনঝন করে ল্যাম্পের কাঁচ ভাঙলো। রিভলভারটা চলে গেল তাঁবুর কানার কাছে।

চেঁচিয়ে উঠলো মুসা।

চিৎকার শুনে তার দিকেই নজর ফেরালো সিংহটা। হয়তো স্বাস্থ্য-টাস্থ্য দেখে তাকেই বেশি রসালো ভেবেছে পশুরাজ। পরের কয়েকটা সেকেণ্ড বেশ হুটোপুটি চললো। মুসার মাথায় কামড় বসাতে গিয়েই হয়তো ভুল করে বালিশ কামড়ে ছিঁড়লো সিংহটা। মুখের কয়েক ইঞ্চি দূরে বিশাল মুখটাকে ফাঁক হতে দেখলো মুসা। কালো নাকটা প্রায় তার নাকের সঙ্গে ঠেকে গিয়েছিলো আরেকটু হলে।

মরিয়া হয়ে উঠলো মুসা। সিংহ যদি কামড়াতে পারে, সে পারবে না কেন? আর কোনো উপায় না দেখে নাক কামড়ে ধরলো সিংহটার। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এসে লেজ চেপে ধরলো কিশোর। সিংহকে ঠেকানোর এটা একটা মাসাই কায়দা। জানোয়ারগুলোর সব চেয়ে দুর্বল জায়গা হলো নাক আর লেজের গোড়া।

বালিশের পাশে রবিনও টর্চ রাখে। জ্বাললো।

একটা অস্ত্রের জন্যে হাতড়াতে শুরু করেছে মুসা। বিছানার মাথার কাছের তাকে খাবারের কিছু টিন আর বাক্স রয়েছে। অন্য কিছু না পেয়ে ময়দার একটা আধখালি বাক্স টেনে নিয়ে ময়দা ঢেলে দিলো সিংহের চোখে।

প্রথমে নাকে কামড়, তারপর লেজ ধরে টানাটানিতে মহা বিরক্ত হলো সিংহটা। ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করে গোটা দুই ধমকও দিলো। চোখে ময়দা পড়ায় এখন গেল ঘাবড়ে।

জীবনে অনেক লড়াই করেছে পশুরাজ, অনেক বেয়াড়া জিনিসের মুখোমুখি হয়েছে। কিন্তু এভাবে ময়দার মুখোমুখি হতে হয়নি কখনও তাকে। নখ, দাঁত সব অচল, কোনোভাবেই ময়দাকে পরাস্ত করতে না পেরে বিকট এক হাঁক ছাড়লো সে। ঝাড়া দিয়ে লেজটা ছাড়িয়ে নিয়েই দৌড় দিলো। দাঁতে কামড়ে নিয়ে যাচ্ছে একটা বালিশ। ও হয়তো মনে করেছে, মুসাকেই নিচ্ছে। মানুষের গন্ধ লেগে রয়েছে ওটাতে। বালিশটাকে কামড়ে ছিঁড়ে যখন রক্ত মাংস কিছুই পেলো না, আবার গর্জে উঠলো।

রিভলভারটা খুঁজতে শুরু করলো কিশোর। চোখ থেকে ময়দা সরাতে পারলেই আবার এসে আক্রমণ করবে ব্যাটা, ভাবছে সে।

পেয়ে গেল অস্ত্রটা। ওরকম রিভলভার আরও আছে তাঁবুতে। তাকের ওপর। নামিয়ে আনলো মুসা। ক্লোজ রেঞ্জে রাইফেলের চেয়ে অনেক বেশি কাজের জিনিস রিভলভার।

ছেঁড়া বালিশটাকে মুখে নিয়ে বাইরে চলে গেল সিংহটা। খাওয়া যায় কিনা বোঝার চেষ্টা করছে হয়তো। রবিনকে আলো ধরতে বলে কিশোর আর মুসাও বেরোলো রিভলভার হাতে। কিন্তু কোথায় সিংহ? পড়ে রয়েছে শুধু বালিশের ছেঁড়া কাপড় আর কিছু তুলো।

পাশের তাঁবু থেকে চিৎকার শোনা গেল। ঝট করে সেদিকে টর্চ ঘোরালো রবিন। তিনজনেই দেখলো, ছুটে বেরোলো সিংহটা। একটা মানুষকে নিয়ে যাচ্ছে। হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে লোকটা। পুরো মাথাটাই ঢুকে গেছে সিংহের মুখের ভেতর।

শিকার নিয়েই ব্যস্ত সিংহটা। ছেলেদের দিকে নজর দিলো না। গুলি করলো কিশোর আর মুসা। আলোটা নড়ে গিয়েছিলো রবিনের হাতে, সিংহের মুখে মানুষ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ও। গুলি কোথায় লাগলো দেখা গেল না। তবে পড়ে গেল সিংহটা।

হৈ-হট্টগোল আর গুলির আওয়াজে সমস্ত তাঁবুর লোকজন জেগে গেছে। ছোটাছুটি করে বেরিয়ে এলো ওরা। কারো হাতে টর্চ, কারো হাতে ঝোপ কাটার ভারি লম্বা ছুরি পাংগা। ওরা দেখলো মাটিতে পড়ে আছে লোকটা। তার বুকে কান ঠেকিয়ে রেখেছে কিশোর। প্রাণ আছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

আস্তে মাথা তুলে শুধু বললো, 'মারা গেছে।' দীর্ঘ দিন কেনিয়া শাসন করে গেছে ইংরেজরা। কাজ চালানোর মতো ইংরেজি জানে এখানকার কুলিকামিনদের অনেকেই। পড়ে থাকা সিংহটার দিকে তাকালো ওরা। মুখ, মাথা ময়দায় শাদা হয়ে আছে।

'দেখ দেখ,' বললো একজন, 'ভূত···শয়তান···মরার ভান করছে··· আমাদেরকে মেরে শেষ করে দেবে। তোমরা কিছু করতে পারবে না।'

সিংহটার মুখ থেকে ময়দা মুছলো কিশোর। 'না, ভূত না। সিংহই। মরে গেছে।'

কাজ বেড়েছে একটা। মৃত লোকটাকে কবর দিতে হবে। লোকটা যেখানে ছিলো সেখানে টর্চের আলো ফেললো কিশোর। আরে গেল কোথায়? নেই তো! 'ও কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো সে।

জবাব দিলো একজন, 'আছে। ভেবো না।'

'তোমরা কবর দেবে?'

'সেটা আমাদের ব্যাপার। তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'আমার জানা দরকার। ওকে কি কবর দেবে?'

'কবর দেয়ার অনেক ঝামেলা। রেলের কাজ করি, এমনিতেই অনেক খাটুনি। কবর খুঁড়তে গিয়ে আর খাটতে পারবো না।'

'কি করবে তাহলে?'

'ওখানে,' হাত তুলে একটা ঝোপ দেখালো লোকটা।

'এটা একটা কাজ করলে?' রাগই হলো কিশোরের। এগিয়ে গেল ঝোপটার কাছে। ভেতর থেকে শোনা গেল চাপা গর্জন। উঁকি দিতেই চোখে পড়লো লাশটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে বিশাল এক সিংহী। ওটার পাশে একটা বাচ্চা। লাশের বুকে পা তুলে দিয়েছে বাচ্চাটা।

মানুষখেকো হওয়ার সেই পুরনো কাহিনী। মায়ের সঙ্গে থেকে থেকে বাচ্চারাও মানুষখেকো হয়ে যায়। পরে কোনোদিনই আর মানুষের মাংস খাওয়ার লোভ ছাড়তে পারে না।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে আরেকবার গর্জালো সিংহী। লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হলো। দুটো কারণে রেগেছে সে। এক, খাওয়ার সময় তাকে বিরক্ত করা হয়েছে। দুই, সাথে বাচ্চা আছে, ওটার নিরাপত্তার ভয়।

যে যেদিকে পারলো দৌড় দিলো শ্রমিকেরা। চোখের পলকে জনশূন্য হয়ে গেল জায়গাটা। দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধু তিন গোয়েন্দা! হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো ওরা। বাচ্চাওয়ালা সিংহী মারা অন্যায়। আবার এটাকে না মারলে ওদেরকে মরতে হবে। আর মানুষখেকোর কবল থেকেও রেহাই পাবে না শ্রমিকেরা।

সিদ্ধান্তটা কিশোরকে নিতে হলো না। সিংহীটাই ঠিক করে দিলো কি করতে হবে। লাফ দিয়ে এসে পড়লো তার ওপর। গুলি করার জন্যে রিভলভার তুলেছিলো সে, কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। গায়ের ওপর উঠে এলো সিংহী।

গলায় হাত নিয়ে গেছে কিশোর। টুঁটি কামড়ে ছিঁড়তে আসবে সিংহ। জানে কোনো লাভ হবে না, তবু জলে ডোবা মানুষের খড়কুটো আঁকড়ে ধরার মতো প্রচেষ্টা।

টর্চ ধরে চিৎকার করছে রবিন। ওদের চারপাশে পাগলের মতো ঘুরছে মুসা, নাচানাচি করছে। গুলি করতে পারছে না ভয়ে, যদি সিংহের গায়ে না লেগে কিশোরের গায়ে লেগে যায়? একটানে গায়ের সোয়েটারটা খুলে বাড়ি মারতে লাগলো সিংহীর চোখে। বিরক্ত হয়ে ক্ষণিকের জন্যে পিছু হটলো জানোয়ারটা, থাবা চালালো মুসাকে সই করে। লাফিয়ে সরতে গিয়েও পারলো না মুসা, তবে আঘাতটা পুরোপুরি লাগলো না শরীরে। সারা জীবনের জন্যে তাহলে পঙ্গু হয়ে যেতে হতো। ভারি হাতুড়ি দিয়ে তার নিতম্বে বাড়ি মারা হলো যেন। পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে সিংহীর দুই চোখের মাঝ বরাবর নিশানা করে ট্রিগার টিপলো।

গুলির শব্দ শুনে ফিরে এলো কুলিরা। এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলো। দুই

কিশোর শিকারী মাটিতে চিত হয়ে আছে। ওদের ওপর পড়ে আছে মরা সিংহী। এক হাতে-টর্চ ধরে আরেক হাতে সিংহের পা ধরে টানাটানি করছে আরেকজন, গায়ের ওপর থেকে সরানোর জন্যে।

হাত লাগালো কুলিরা। মুসা আর কিশোরের গায়ের ওপর থেকে টেনে সরালো সিংহীটাকে। উঠে দাঁড়ালো দু'জনে। গায়ে কাটাকুটি আর আঁচড় অনেক বেড়েছে এখন। টলতে টলতে তাঁবুর কাছে ফিরলো দু'জনে।

কালো কেশরওয়ালা সিংহটা যেখানে ছিলো সেখানে আলো ফেলে ওটাকে দেখতে পেলো না রবিন। মাটিতে খানিকটা রক্ত আর ঘাসে ময়দা লেগে থাকতে দেখা গেল শুধু।

থমকে দাঁড়ালো কিশোর। অনেক সিংহ শিকারী বলে, একটা বড় মদ্দা সিংহকে মারতে অনেক সময় একডজন গুলি খরচ হয়। বইয়ে পড়ে তখন বিশ্বাস করেনি সে, এখন করলো।

ধড়াস করে এসে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো কিশোর আর মুসা। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। তাক থেকে ফার্স্ট এইড কিটটা নামালো রবিন। ক্ষতগুলো ভালোমতো পরিষ্কার করে সালফোনামাইড পাউডার লাগিয়ে দিলো। লাগানো শেষ করে মুসার কাছ থেকে সরে আসতে যাবে এই সময় পা পড়লো কিসের গায়ে। অনেকটা বেড়ালের মতো মিয়াউ করে উঠলো জীবটা। সিংহের বাচ্চা।

মৃত মায়ের কাছে থাকেনি, মানুষের সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে। অনেক সময়ই এরকম করে সিংহের বাচ্চা। মিউ মিউ করতে লাগলো মুসার বিছানার পাশে বসে।

কোলে তুলে নিলো ওটাকে মুসা। 'আহ্হা, বেচারা! তোর মাকে মেরে ফেললাম! কি করবো বল, নইলে যে আমাদেরই মেরে ফেলতো।'

'ওকেও রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে,' কিশোর বললো। 'মানুষের মাংসের স্বাদ পেয়ে গেছে কিনা কে জানে। তাহলে একেও মেরে ফেলা ছাড়া উপায় নেই।'

'না না, কি বলো! অত্তোটুকুন একটা বাচ্চা!'

'হলে কি হবে? রক্তের স্বাদ বাচ্চাদের আরও বেশি মনে থাকে।'

'একটা কাজ তো করা যায়,' রবিন বললো। 'পরীক্ষাটা হয়ে যাক না এখুনি। তোমার হাত থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, ধরো না ওটার নাকের নিচে। দেখি, কি করে।'

'ভালো কথা বলেছো।' বাচ্চাটার নাকের নিচে জখমটা ধরলো কিশোর। কয়েকবার শুঁকলো বাচ্চাটা, আগ্রহ দেখালো। এমন ভাব করলো যেন চাটতে যাবে। শেষ পর্যন্ত চাটলো না। মুখ সরিয়ে নিয়ে মিউ মিউ করতে লাগলো আবার।

'দেখলে?' খুশি হয়ে বললো মুসা। 'ও মানুষখেকো হয়নি। দুধ লাগবে।'

'এখুনি লাগবে না। পেট দেখছো না, ফুলে আছে কেমন। মা নিশ্চয় পেট

ভরিয়ে রেখেই গেছে। আপাতত বেঁধে রেখে দাও।'

পাঁচ

কাকভোরেই উঠে পড়লো তিন গোয়েন্দা। তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখলো পুব আকাশে ধূসর আলোর আভাস। বেশির ভাগ শ্রমিকই তাঁবুতে ঘুমোচ্ছে। কয়েকজন পাংগা হাতে পাহারা দিচ্ছে বাইরে। মানুষখেকোর আশঙ্কায়।

'লোকটার বাড়ি কোথায় জানো?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো। 'যে লোকটা মারা গেছে কাল রাতে?'

'জানি। গুলা গ্রামে,' জবাব দিলো একজন।

'দূরে?'

'না। মিনিট দশেক লাগে।'

'পরিবার-টরিবার নেই? ওদেরকে খবর দাওনি কেন?'

এমন ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকালো লোকটা, যেন অদ্ভুত কথা শুনলো। হেসে উঠলো। বনের ভেতর থেকে শোনা গেল সিংহের ডাক। সেদিকে আঙুল নেড়ে বললো, 'ওই জন্যে।'

কারণটা জোরালো, মনে মনে স্বীকার না করে পারলো না কিশোর। মানুষখেকোর এলাকায় কে যাবে রাতবিরেতে একজন মরা মানুষের আত্মীয়দের খবর দিতে? প্রাণের মায়া কার না আছে?

লোকটাকে বললো কিশোর, 'আমাদের কাছে রাইফেল আছে। চলো, গাঁয়ে যাবো।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো লোকটা। গুলার দিকে রওনা হলো ওরা। বনের ভেতরে অন্ধকার এখনও যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। টর্চ জ্বালতে হলো পথ দেখার জন্যে।

মাঝে মাঝে ভেসে আসছে সিংহের ডাক। তবে সব কটাই খাবার-সমাপ্তির ঘোষণা।

'পেট ভরা ওদের,' কিশোর বললো। 'এখন আর ভয় নেই আমাদের।'

মুসা আর রবিনও তাই আশা করলো। ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগলো ঝোপঝাড়ের দিকে। বন থেকে বেরিয়ে আসার পর তবে স্বস্তি। পাহাড়ের ঢালে পৌঁছেছে ওরা। ঢাল বেয়ে উঠে গেছে আঁকাবাঁকা পায়েচলা পথ। ছোট পাহাড়টার ওপরে কয়েকটা কুঁড়ে। মাটির দেয়াল, পাতার ছাউনি ঘরগুলোর।

লাকড়ি কুড়াচ্ছে এক মহিলা। তাকে জিজ্ঞেস করলো কুলি লোকটা, 'ওংগার ঘর কোনটা?'

'ওই যে। কেন? খারাপ খবর?'

'ওকে সিংহে মেরে ফেলেছে।'

হাত থেকে লাকড়ির বোঝা ফেলে দিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটলো মহিলা। ওংগার দরজায় গিয়ে জোরে জোরে থাবা মারতে শুরু করলো।

দরজা খুলে বেরিয়ে এলো মুসার মতোই লম্বা, স্বাস্থ্যবান এক কিশোর। ঘরের কোণে আগুন জ্বালতে ব্যস্ত এক মহিলা। খেলা ফেলে কৌতূহলী হয়ে আগন্তুকদের দেখতে বেরোলো দুটো বাচ্চা।

স্কুলে যাওয়া আফ্রিকান ছেলের আচরণেই বোঝা যায়। ইংরেজিতে তাকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'তুমি ওংগার ছেলে?'

'হ্যাঁ।'

'খুব খারাপ খবর আছে তোমার জন্যে। তোমার বাবাকে সিংহে আক্রমণ করেছিলো।'

'মারা গেছে?'

'হ্যাঁ। এসো।'

আগুন ধরাচ্ছে যে মহিলা, সে ছেলেটার মা, বোঝা গেল। তার দিকে ফিরে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললো ছেলেটা। আস্তে উঠে দাঁড়ালো মহিলা। যেন পায়ের ওপর ভর রাখতে পারছে না, শক্তি পাচ্ছে না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটা কথা বললো না।

ওংগার ছেলেকে নিয়ে ফিরে চললো তিন গোয়েন্দা। ঢাল বেয়ে নামার সময় শুনতে পেলো মহিলা কণ্ঠের বিলাপ। এসব শুনতে ভালো লাগে না, তাড়াতাড়ি পা চালালো মুসা। অন্যেরাও চলার গতি বাড়িয়ে দিলো।

চলতে চলতে নিজেদের পরিচয় দিলো কিশোর। কিন্তু আন্তরিক সাড়া পেলো না ওংগার ছেলের কাছ থেকে। বললো, 'আমি জানি তোমরা কারা। মানুষ মারা বন্ধ করার জন্যে তোমাদের ডেকে আনা হয়েছে। পারলে কই? আমার বাবাকে মরতে হলো।'

বোঝানোর চেষ্টা করলো কিশোর, 'সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি আমরা। সিংহটা প্রথমে আমাদের তাঁবুতেই ঢুকেছিলো।'

'তারমানে গুলি করার সুযোগ পেয়েছো। করলে না কেন?'

'থাবা দিয়ে রিভলভার ফেলে দিয়েছিলো।'

নাক দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করলো ওংগার ছেলে। 'এসব খোঁড়া যুক্তি। ফেলে কি করে? তার আগেই গুলি করলে না কেন? কিসের শিকারী হলে?'

প্রতিবাদ করলো না কিশোর। বরং মনে হচ্ছে, ঠিকই বলেছে ছেলেটা। পুরো ব্যাপারটারই জন্যে নিজেকে দোষী মনে হতে লাগলো।

'তারপর কি হলো?' জানতে চাইলো ওংগার ছেলে।

'তোমার নামটা কিন্তু এখনও বললে না,' রবিন বললো।

কড়া চোখে তার দিকে তাকালো ছেলেটা। 'বংগা।' আবার ফিরলো কিশোরের দিকে। 'তারপর?'

'ওকে আক্রমণ করলো সিংহটা,' মুসাকে দেখালো কিশোর। 'আর কিছু না পেয়ে ওটার চোখে ময়দা ঢেলে দিলো মুসা।'

'আর ও কি করছিলো?' রবিনকে দেখালো বংগা।

'টর্চ ধরে রেখেছিলো।'

'সুযোগ তাহলে পেয়েছো। তখন রিভলভার তুলে নিলে না কেন?'

এইবার রেগে গেল কিশোর। এতো মেজাজ দেখাচ্ছে কেন? ওর মেজাজের পরোয়া করে কে? তবু ছেলেটার মনের অবস্থা বুঝে রাগ চেপে বললো, 'এতো তাড়াতাড়ি সব কিছু ঘটে গেল, করার কিছুই ছিলো না আমাদের। একটা বালিশ কামড়ে ধরে ছুটে বেরিয়ে গেল সিংহটা।'

'তার মানে রিভলভার তোলার ভালো সুযোগই পেয়েছো!'

'তুলেছি তো। আমারটা তুললাম। তাক থেকে আরেকটা পেড়ে নিলো মুসা। ছুটে বেরোলাম আমরা। ততোক্ষণে আরেক তাঁবুতে ঢুকে তোমার বাবাকে ধরে ফেলেছে সিংহটা। টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলো।'

'হুঁ, বুঝলাম,' কর্কশ হয়ে উঠলো বংগার কণ্ঠ। 'তোমাদের কারণেই মারা গেছে বাবা। তোমরা কিছু করতে পারোনি বলে। খুনী আসলে তোমরাই। তোমাদেরকেও খুন করবো আমি দাঁড়াও। বাবার কবর দেয়াটা হয়ে যাক আগে, তারপর।'

ছেলেটার ওপর থেকে রাগ চলে গেল কিশোরের। মাথা গরম হয়ে গেছে। আবল তাবল বকছে বাবার শোকে। কিন্তু আসলেই কি তাই? এটা আফ্রিকা। একসময় আইন কানুনের বালাই ছিলো না এখানে। সামান্য কারণেই যে যাকে খুশি খুন করে বসতো। প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এখনও ওরকম ঘটনা ঘটে। মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে বংগা, নাকি সত্যি সত্যি খুন করবে? এখানে অনেক জায়গায় কুসংস্কার রয়েছে, খুনীকে খুন না করা পর্যন্ত শান্তি পায় না মৃতের আত্মা। আত্মা তো আর কাজটা করতে পারে না, তার নিকট আত্মীয় কাউকেই করে দিতে হয়।

হুঁশিয়ার থাকতে হবে, ভাবলো কিশোর। কি কপাল! সাহায্য করতে এসে মানুষের বন্ধু না হয়ে শত্রু হচ্ছে ওরা। শত্রু বাড়াচ্ছে। চার জোড়া চোখ দরকার এখন তার। চারদিকে নজর রাখার জন্যে। এক জোড়া দরকার মানুষখেকোর জন্যে। আরেক জোড়া কিমবার ওপর, যে সম্ভবত মাকুমার আদেশে কাজ করছে। তৃতীয় জোড়া দরকার রাজা মাকুমার ওপর নজর রাখার জন্যে। আর চতুর্থ জোড়া বংগার জন্যে, প্রতিশোধের আগুনে যে এখন টগবগ করে ফুটছে।

না না, চারজোড়া নয়, পাঁচ জোড়া দরকার, মনে পড়লো কিশোরের। আরও একজন গোপন শত্রু রয়েছে, যাকে এখনও চেনা যায়নি। তাঁবুতে ঢুকলো কি করে সিংহটা? দড়ি ছেঁড়েনি, কানার কাপড়ও ছেঁড়েনি। তার মানে কেউ একজন খুলে রেখেছিলো, যাতে ওদের তাঁবুতে ঢুকে পড়তে পারে সিংহ। মেরে ফেলে। স্পষ্ট মনে আছে কিশোরের, সে নিজের হাতে কানার দড়ি শক্ত করে বেঁধেছিলো, ঘুমাতে যাওয়ার আগে।

পাশের তাঁবু, অর্থাৎ ওংগা যেটাতে ছিলো সেটারও কানার দড়ি খোলা ছিলো। তবে এটার ব্যাখ্যা আছে। সিংহের গর্জন শুনে কি হয়েছে দেখতে বেরিয়েছিলো একজন ওই তাঁবু থেকে, আর বেরোতে হলে কানা খুলেই বেরোতে হয়। খোলা পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো সিংহটা, ওংগাকে ধরে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো।

সিংহ দড়ির গিঁট খুলতে পারে না। কাপড় ছিঁড়ে যদি ঢুকতো, তাহলে এককথা ছিলো। কোনো সন্দেহ নেই, কোনো মানুষই কিশোরদের তাঁবুতে ঢোকার পথটা খুলে রেখেছিলো। কে সেই লোক? কিশোরদের সঙ্গে তার কিসের শত্রুতা?

ছয়

গটমট করে এসে ক্যাম্প এলাকায় ঢুকলো বংগা। আগের রাতে কিশোরের নির্দেশে তার বাবার লাশ ঝোপ থেকে এনে তাঁবুতে রাখা হয়েছিলো। সকালে বের করা হয়েছে। লাশের মুখের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইলো সে। রাগ আর দুঃখে কালো মুখটা যেন আরও কালো হয়ে গেল তার।

নিচু হয়ে তুলে নিলো লাশটা। একা। শক্তিশালী কাঁধে ফেলে, কারো দিকে না তাকিয়ে, একটা কথা না বলে রওনা হয়ে গেল আবার যে পথে এসেছিলো সে পথে। গাঁয়ে ফিরে চলেছে।

খোলা আকাশের নিচে নাস্তা করতে বসেছে শ্রমিকেরা। খেয়েদেয়ে এখুনি রেলের কাজ করতে চলে যাবে। ওদের কাছে বসে বসে ভাবছে কিশোর, আজ কার পালা? কাকে মারবে সিংহ?

অনেকখানি জায়গা জুড়ে রেলশ্রমিকদের ক্যাম্প। শেষ মাথায় অসংখ্য কালো মুখের মাঝে একটা শাদা মুখ চোখে পড়লো বলে মনে হলো কিশোরের। কে লোকটা? জানার জন্যে উঠলো সে। পরিচয় করা দরকার। এতোগুলো কালো মুখের মাঝে একটা শাদা মুখ দেখে কৌতূহল জাগাটা স্বাভাবিক।

আগেই নাস্তা করে ফেলেছে ওরা। মুসা গেছে সিংহের বাচ্চাটাকে খাওয়াতে। তাকে সাহায্য করতে গেছে রবিন।

আস্তে আস্তে এগোলো কিশোর। তাকে আসতে দেখেই লাইন ধরে দ্রুত হেঁটে

চলে গেল শ্বেতাঙ্গ লোকটা।

থেমে গেল কিশোর। লোকটার আচরণে অবাক হলো। স্পষ্টই বুঝিয়ে দিয়ে গেল, কথা বলতে চায় না তার সঙ্গে।

কৌতূহল আরও বাড়লো কিশোরের। হয়তো স্টেশন মাস্টার কিছু বলতে পারবে, ভেবে, সেদিকেই চললো সে।

ছোট্ট অফিসে ডেস্কের ওপাশেই বসে আছে কিমবা। টেবিলে রাখা এক কাপ চা।

ভূমিকা করলো না কিশোর। জিজ্ঞেস করলো, 'একজন শ্বেতাঙ্গকে দেখলাম, লোকটা কে জানেন?'

'জানি। কাল বিকেলের ট্রেনে এসেছে।'

'কে?'

'শ্বেতাঙ্গ শিকারী। নাম জন কক।'

'এখানে কি চায়?'

'সেটা তোমার জানার ব্যাপার নয়, তাই না?' চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো কিমবা।

'হতো না, যদি আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি না পালাতো। আমাদের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ আছে, বোঝা যায়। সেটা কি?'

'হতে পারে প্রফেশনাল জেলাসি...তোমরা তার কাজ নিয়ে নিয়েছো।'

'আমরা কি করে নিলাম? লোকটাকে চিনি না পর্যন্ত। আগে কখনও দেখিনি।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে ছাতের দিকে তাকালো কিমবা। 'তোমাকে বলতে অবশ্য আমার আপত্তি নেই। মানুষখেকোর অত্যাচার এই এলাকায় নতুন নয়। আগেও হয়েছে। তখন আমাদের সাহায্য করতে এসেছিলো কক। তাই মাসখানেক আগে যখন এবারকার অত্যাচারটা শুরু হলো তাকে খবর দিলাম আমরা। এসে বেশ কিছু সিংহ মারলোও। কিন্তু ঠিক জানোয়ারগুলোকে মারতে পারেনি, ফলে মানুষ মারা বন্ধ হলো না। শ্রমিক হারাতে লাগলাম আমরা। আর কোনো উপায় না দেখে তখন বাধ্য হয়ে গিয়ে ওয়ারডেন সাহেবকে ধরলাম। তিনিই তোমাদের কথা সুপারিশ করলেন। সিংহ মারার জন্যে অনেক টাকা নেয় কক। কাজের কাজ কিছুই করতে পারছে না, অযথা পয়সা দিতে কে যায়? তাকে মানা করে দিলাম। তাতেই বোধহয় রাগটা তোমাদের ওপর গিয়ে পড়েছে তার। কাল এসে আবার কাজটার জন্যে চাপাচাপি করছিলো। বার বার বলছিলো, এবার আসল সিংহগুলোকে মেরে দেবে।'

'তা মারুক না, ভালোই তো,' কিছুটা স্বস্তিই বোধ করছে কিশোর। 'আমরা পেশাদার শিকারী নই। সত্যি কথা বলতে কি, শিকার করতেও জানি না।

জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে কিছু বই পড়া জ্ঞান, আর কিছু জানোয়ার ধরার অভিজ্ঞতা আছে, ব্যস। কাল নিতান্ত কাকতালীয় ভাবেই মেরে ফেলেছি সিংহগুলোকে। এতে আমাদের কৃতিত্ব খুব একটা নেই।'

'যা-ই হোক, খুব সাহস দেখিয়েছো। এতোটাই বা কে দেখাতে পারে? মানুষখেকো সিংহের মুখোমুখি হওয়া কি সোজা কথা?'

প্রশংসাটা এড়িয়ে গিয়ে কিশোর বললো, 'কাল রাতে একজন মানুষকে মেরে ফেলেছে, জানেন হয়তো।'

'জানি। সেটা তোমাদের দোষ নয়।'

'তা জোর দিয়ে বলা যাবে না। যাকগে। জন ককে আবার কাজে বহাল করুন। ভালো হবে।'

'না, হবে না। ওরকম একটা বদরাগী মানুষকে আর কাজ দিতে রাজি নই আমি। কাল এসে বলার পরই সাফ বলে দিয়েছি, হবে না। ভেবেছি রাতের ট্রেনে ফিরে যাবে। গেল না। এখানেই ঘুরঘুর করতে থাকলো। কুমতলব আছে ওর। সাবধানে থাকবে। তোমাদের ভীষণ ক্ষতি করে দিতে পারে। ও এখন চাইবে তোমরা ব্যর্থ হও। কাজে বাধা দেয়ার চেষ্টা করবে। তোমরা কিছু একটা গোলমাল করে ফেললে এসে বাহাদুরি দেখিয়ে নানা কথা বলবে। কাজটা ফেরত চাইবে আবার।'

তাঁবুর কানার কথাটা ভাবলো কিশোর। এই জন কক লোকটাই খুলে দেয়নি তো?

তবে সেকথা কিমবাকে কিছুই বললো না। প্রমাণ ছাড়া বলা উচিত নয়। চুপচাপ থেকে নজর রাখার সিদ্ধান্ত নিলো সে। একবার যখন ওদেরকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছে, নিশ্চয় আবারও হবে। সেটাই দেখতে চায় কিশোর।

ক্যাম্পে ফিরে চললো সে।

সিংহের খোঁজে আবার বেরিয়ে পড়লো তিন গোয়েন্দা।

কিন্তু কোথায় খুঁজবে? জানে না। তিন মাইল লম্বা লাইনের দু'পাশে ছড়িয়ে পড়ে কাজ করছে রেলশ্রমিকরা। এতোটা জায়গায় চোখ রাখা সম্ভব নয়। এক মাইল, এমনকি আধ মাইল দূরে কি ঘটছে , তা-ও বোঝা মুশকিল।

লম্বা ঘাসের মধ্যে যেখানে-সেখানে শুয়ে থাকতে পারে সিংহ, লুকিয়ে থাকতে পারে। কয়েক শো গজ দূর থেকেও সেটা বোঝার উপায় নেই। মাটির সঙ্গে বুক মিশিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা একভাবে পড়ে থাকতে পারে ওরা, সমান্যতম নড়াচড়া না করে। ঘাসের রঙের সঙ্গে মিশে যায় চামড়ার রঙ। মাথায় কেশর আছে বটে, তবে

দূর থেকে দেখলে মনে হবে ঝোপেরই একটা অংশ ওটা।

স্টেশনের ছাতে চড়লো ছেলেরা। বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে দেখতে শুরু করলো।

'লাভ নেই,' হাত নেড়ে বললো কিশোর। 'আরও অনেক উঁচুতে উঠতে পারলে হয়তো হতো। আশেপাশে যেখানে খুশি লুকিয়ে থাকতে পারে সিংহ, আমরা দেখতে পাবো না। ওই কাঁটাঝোপগুলোর ভেতরে থাকতে পারে, ওখানে ঘাসের ভেতরে থাকতে পারে। ওই যে, অনেক পিঁপড়ের ঢিবিও আছে। ওগুলোর পেছনেও শুয়ে থাকতে পারে।'

ছাত থেকে আবার নেমে এলো ওরা। বিশেষ লাভ হবে বলে মনে হয় না, তবু করার একটাই কাজ আছে এখন। তিন মাইল লাইনের একমাথা থেকে আরেক মাথায় হেঁটে যাওয়া।

হাতে রাইফেল নিয়ে একমাথা থেকে হাঁটতে শুরু করলো তিনজনে। কিশোর চোখ রাখছে একপাশে, মুসা আরেক পাশে। আর রবিন তাকাচ্ছে দুই পাশেই। যদি মুসা কিংবা কিশোরের চোখ এড়িয়ে যায় কিছু, সেই জন্যে।

ক্যাম্প এলাকার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জন ককেকে দেখতে পেলো ওরা। তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছে, হাতে রাইফেল। ছেলেদের দেখে থমকে দাঁড়ালো। তারপর ঘুরে আরেক দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

খুব ধীরে এগোচ্ছে শিকারীরা। ইচ্ছে করলেও তাড়াতাড়ি করতে পারছে না। কারণ ঝোপ, ঘাসের ভেতর ভালোমতো দেখতে দেখতে যেতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে থেমে শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করছে তারা কিছু দেখেছে কিনা।

বড় জোর আধ ঘন্টা হয়েছে বেরিয়েছে ওরা, এই সময় 'সিমবা! সিমবা!' বলে চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো একটা লোক। তার কাছে দৌড়ে গেল তিন গোয়েন্দা। হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা। হাঁপাচ্ছে। হাত তুলে লাইনের দিকে দেখালো।

'কত দূরে?' জানতে চাইলো কিশোর।

'পাঁচ মিনিট লাগবে।'

দৌড় দিলো ছেলেরা। দূরত্ব আর সময় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না আফ্রিকানরা, আন্দাজেই একটা কিছু বলে দেয়। প্রায় মাইলখানেক পেরোনোর পর চোখে পড়লো ওদের, একজায়গায় জটলা করছে কয়েকজন লোক। মাটির দিকে তাকিয়ে কি বলাবলি করছে। কাছে এসে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে তিন গোয়েন্দাও দেখলো, মাটিতে পড়ে রয়েছে একজন মানুষ। মৃত।

'সিংহটা দেখেছেন?' শ্রমিকদের সর্দারকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'দেখেছি। বিরাট সিংহ। বাদামী চামড়া, কালো কেশর।'

নিশ্চয় সেই সিংহটা, যেটাকে আগের রাতে গুলি করেছিলো, ভাবলো

কিশোর।

'কোথায় ছিলে তোমরা?' তিক্ত কণ্ঠে বললো সর্দার, যেন দোষটা কিশোরদেরই। 'যখন দরকার তখন পাওয়া যায় না।'

'একই সময়ে তো আর সব জায়গায় থাকতে পারি না আমরা,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। লোকগুলোর ওপর রাগই হচ্ছে তার। এদের জন্যে এতো কষ্ট করছে, অথচ সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। উল্টে আরও অনুযোগ শুনতে হয়।

'তোমরা নাহয় ছিলে না, কিন্তু তোমাদের লোকটা তো ছিলো। সে গুলি করলো না কেন?'

অবাক হলো কিশোর। 'আমাদের লোক? কার কথা বলছেন?'

'জন কক। তোমাদের হয়েই তো কাজ করছে সে।'

'না, আমাদের হয়ে করছে না।'

একসাথে কথা বলে উঠলো অনেকগুলো কণ্ঠ, রেগে গেছে ওরা। কিশোরের কথা বিশ্বাস করছে না। 'তার লোকটা' কাজ করলো না বলে তাকেই দোষারোপ করতে লাগলো।

তাদের কথা, কেন কক গুলি করলো না সিংহটাকে? কেন লোকটাকে মারা পড়তে দিলো?

কেন দিলো বুঝতে পারছে কিশোর। সিংহ মারার জন্যে তাকে টাকা দেয়া হবে না। তাছাড়া না মারলে দোষটা চাপবে গিয়ে কিশোরদের ঘাড়ে, ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেছিলো লোকটা। এবং তা-ই হয়েছে। ওদেরকেই দোষ দিচ্ছে লোকেরা। বলতেও শুরু করেছে কেউ কেউ, স্টেশন মাস্টারটার যদি ঘটে সামান্যতম বুদ্ধি থাকতো, তাহলে এই পুঁচকে ছোঁড়াগুলোকে এখুনি বিদেয় করে বয়স্ক আর অভিজ্ঞ কাউকে রাখতো। অন্তত জন ককও এদের চেয়ে ভালো। এই ছেলেগুলোর ওপর দায়িত্ব না থাকলে কি আর চুপচাপ দেখতো কক? নিশ্চয় গুলি করতো।

ওদের কথাবার্তা শুনে ভীষণ রেগে গেল মুসা। 'দুত্তোর ছাই, ব্যাটাদের জন্যে কিচ্ছু করবো না!' বলতে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু হাবভাব বুঝে তাকে থামালো কিশোর। এখন এসব কথা বললে বিপদে পড়তে হবে।

কিমবাকে খবরটা দিতে চললো তিন গোয়েন্দা। সমস্ত কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেল স্টেশন মাস্টার। বিশেষ করে ককের কথা শুনে। লোকটা দেখেছে একজন মানুষকে মারছে সিংহ, অথচ কিছুই করলো না!

চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলো কিমবা। তারপর বললো, 'মনে হচ্ছে এখন, ককের কাজটা না দিয়ে ভুলই করেছি। নাহলে এতোক্ষণে মারা পড়তো সিংহটা।' অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসলো সে। 'রাজা মাকুমাকে একথা শোনানো যাবে না। আস্ত

রাখবে না আমাকে তাহলে।'

কি শোনাতে এলো, আর কি শুনলো। মন খারাপ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দার। বেরিয়ে এলো অফিস থেকে। প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করতে করতে ভাবছে এখন কি করবে।

'পুরো তিনটে মাইল একসাথে দেখতে পারলে হতো।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো কিশোর। 'পুরো এলাকাটায় একই সঙ্গে চোখ রাখতে পারতাম যদি···'

'আকাশে উড়াল দিলে পারবে,' নিমের তেতো ঝরলো যেন মুসার কণ্ঠে। 'পাখি তো আর নও, ডানা নেই, উড়বে কি করে? এমন ক্ষমতা যদি থাকতো, মেঘের ওপর চড়ে বসতে পারতাম···'

ঝট করে মুসার দিকে তাকালো কিশোর। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখ। তুড়ি বাজিয়ে বললো, 'পেয়েছি! ভালো একটা বুদ্ধি বের করেছো! মেঘের ওপরই চড়বো!'

'যাহ্, ঠাট্টা করছো!' বিশ্বাস করতে পারলো না রবিন। 'নাকি সিংহের ভাবনায় মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল?'

'না, ঠাট্টাও করছি না, মাথাও গরম হয়নি। চলো, স্টর্কটা চেয়ে নেবো। ডেভিড টমসন এখনও সাভো গেম রিজার্ভের ওয়ারডেন। ভাবনা কিসের?'

সাত

স্টর্ক হলো ছোট একটা বিমান। তিন গোয়েন্দার খুব পরিচিত জিনিস। আগের বার যখন আফ্রিকায় এসেছিলো (পোচার দ্রষ্টব্য), বহুবার উড়িয়েছে ওটা ওরা। মুসা তো রীতিমতো ওটার বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছে এখন।

এখানে এই বুনো অঞ্চলে গাড়ি চালাতে লাইসেন্স লাগে না। ল্যাণ্ড রোভারটা মুসাই চালালো। বিশ মাইল পথ পেরিয়ে এসে পৌঁছলো টমসন সাফারি ক্যাম্পে। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন ওদেরকে ওয়ারডেন।

'শুনেছি তোমরা এসেছো। জন্তুজানোয়ার ধরছো ক'দিন ধরেই। চিতামানব-দের পাকড়াও করেছো, সে-খবরও পেয়েছি। তা আছো কেমন? ক'টা মানুষ-খেকোকে খতম করলে?'

'দুটো,' জবাব দিলো কিশোর। 'তবে মনে হয় আসলটাই রয়ে গেছে। কালো কেশর। ওটা ছাড়াও আরও কটা আছে কে জানে! কুলিয়ে উঠতে পারছি না।'

'অসুবিধেটা কি?'

'বিরাট এলাকা, আপনি তো জানেন। আমরা একজায়গায় পাহারা দিতে গেলে আরেক জায়গায় মানুষ মারছে সিংহ।'

'তা তো মারবেই। তোমাদের কুলি আর বন্দুক বাহকরা কি করছে? ওরা কিছু

করতে পারছে না?'

'ওদেরকে স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে রেখে এসেছি। রাজা মাকুমার হুকুম। আমাদের কাছে থাকতে পারবে না। ওরা থাকলে নাকি ক্ষতি করবে। আমাদেরকে একা করতে বলেছে কাজটা।'

'আর তোমরাও অমনি রাজি হয়ে গেলে। এসব জেদের কোনো অর্থ নেই, বুঝলে।'

'জেদ নয়,' মাথা চুলকালো কিশোর। 'আসলে এতোগুলো মানুষকে মারছে সিংহ, ঠেকানোর কেউ নেই, তাই...'

'নিজেদের ঘাড় পেতে দিলে। আমার তো মনে হচ্ছে মাকুমা চায় তোমরা মারা পড়ো।'

'এ-ব্যাপারটাই মাথায় ঢুকছে না! আমরা তার কি ক্ষতি করলাম? এতো রাগ কেন আমাদের ওপর?'

'বুঝতে পারছো না? আমার ধারণা, বিদেশী বলেই। তুমি বিদেশী। মুসা নিগ্রো হয়েও আমেরিকানদের চামচা—অন্তত মাকুমার তাই বিশ্বাস, আর রবিন তো শ্বেতাঙ্গই। তার ওপর, কিছুতেই মারা পড়ছো না তোমরা, ফলে রাগ তার আরও বাড়ছে। ভারি আজব লোক মাকুমা, ভীষণ বদমেজাজী। অবশ্য তার কারণ আছে। মাউ মাউ বিদ্রোহের সময় তার স্ত্রী-পুত্রকে মেরে ফেলা হয়েছিলো। তার পর থেকেই নাকি তার আচরণ ওরকম খাপছাড়া হয়ে গেছে। নিগ্রোরা এমনিতেই বিদেশীদের দেখতে পারে না, সে আরও বেশি পারে না। এর পেছনে নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। আমি জানার অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি। দেখো তোমরা।'

'দেখবো,' কিশোর বললো। 'হ্যাঁ, যে জন্যে এসেছি। তিন মাইল লম্বা রেল পথে কাজ করছে শ্রমিকরা। একমাত্র আকাশ থেকেই সমস্ত জায়গাটার ওপর একবারে চোখ রাখতে পারবো। আপনার কাছে স্টর্কটা ধার চাইতে এসেছি।'

ডেস্কে পেন্সিল ঠুকতে ঠুকতে কথাটা ভেবে দেখলেন ওয়ারডেন। তারপর বললেন, 'দেবো। তবে আমার মনে হয় তাতে সুবিধে করতে পারবে না। সাংঘাতিক শব্দ করে এঞ্জিন। যে কোনো মানুষখেকোকে ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া একজায়গায় স্থির থাকে না। এরোপ্লেন থেকে ছুটন্ত সিংহের গায়ে পেশাদার স্নাইপারেরও গুলি লাগাতে কষ্ট হবে। তোমরা পারবেই না। হেলিকপ্টার হলে হয়তো হতো। তবে ওগুলোরও শব্দ আছে। বেলুন হলে কেমন হয়?'

হাসলো কিশোর। 'কোথায় পাবো?'

'সহজ। মিস্টার ডেভিডের বেলুন সাফারির কথা শুনেছো?'

আগ্রহী হয়ে উঠলো রবিন। কিশোরও। দু'জনই খবরের কাগজে পড়েছে।

নাইরোবি আর মোমবাসার পেপারে ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হয়েছে কিছুদিন। ডেভিড নামে একজন ইংরেজ বেলুনে চড়ে ভেসে বেড়িয়েছেন পূর্ব আফ্রিকার আকাশে, ওপর থেকে জন্তুজানোয়ারের ছবি তুলেছেন। বেলুনের এঞ্জিন নেই, নীরব থাকে, ফলে জন্তুজানোয়ারেরা সতর্ক হয় না কিংবা ভয় পেয়ে ছোটাছুটি করে না। তাতে অনেক ভালো ছবি তোলা সম্ভব হয়।

'বেলুন হলে তো খুবই ভালো হয়,' কিশোর বললো। রোমাঞ্চকর এক মজাদার অভিযানের আশায় বুক কাঁপতে শুরু করেছে তার।

'কিন্তু ডেভিড দেবেন কেন?' মুসার কণ্ঠেও উত্তেজনা। বেলুন থেকে আফ্রিকার বনভূমি, পাহাড়, প্রান্তর দেখার কল্পনা করেই রোমাঞ্চিত হচ্ছে সে।

'তিনি দেবেন না, তবে আমি দিতে পারি,' হেসে বললেন টমসন। 'ডেভিড ফিরে গেছেন ইংল্যাণ্ডে। বেলুনটা আমাদের দান করে গেছেন। তিনি বুঝেছেন, ওটা দিয়ে পার্কের কাজের সুবিধে হবে। মজিমা স্প্রিঙের কাছে নোঙর করা আছে এখন ওটা। গিয়ে দেখবে নাকি?'

এরকম একটা প্রস্তাব নাকচ করার প্রশ্নই ওঠে না। গাড়িতে কয়েক মিনিটের পথ দক্ষিণে, তারপরেই বেলুনটার দেখা মিললো। সাভো নদীর দুই তীরে ওখানে খোলা প্রান্তর, তার ওপরের আকাশে ভাসছে বেলুন। মজিমা স্প্রিঙ হলো এখানকার সব চেয়ে বড় ওয়াটার হোল, জানা আছে তিন গোয়েন্দার। আগের বার এসে দেখে গিয়েছিলো। মোটা একটা গাছের কাটা গুঁড়িতে বাঁধা রয়েছে বেলুনের দড়ি। বেলুনের ঝুড়িতে দাঁড়িয়ে বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে আশ পাশের অঞ্চলের ওপর নজর রাখছে একজন নিগ্রো রেঞ্জার। প্রায় দশতলা বাড়ির সমান উঁচুতে দাঁড়িয়ে চারপাশের দশ বর্গমাইল এলাকা সহজেই দেখতে পারছে সে।

ঝুড়ির নিচে ঝুলছে দড়ির মই। তার গোড়ায় সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছে আরেকজন রেঞ্জার। ওপরের লোকটা পোচার দেখলেই ইঙ্গিত দেবে, সাইকেল নিয়ে তখন ক্যাম্পে ছুটবে সে, খবর দেয়ার জন্যে। দলবল নিয়ে পোচার ধরতে বেরিয়ে পড়বেন ওয়ারডেন।

টমসন ইশারা করতেই ওপরের লোকটা দড়ির মই বেয়ে নেমে এলো।

'পাঁচজনের জায়গা হবে না,' ছেলেদেরকে বুঝিয়ে বললেন তিনি, 'বড় জোর চার। চলো , উঠি।'

ঝুলন্ত দড়ির মই বেয়ে দশতলায় ওঠা সহজ ব্যাপার নয়। মুসার জন্যে অবশ্য কঠিন না কাজটা, নিয়মিত ব্যায়াম করে সে। এসব প্র্যাকটিস আছে। বেশ কিছুদিন থেকেই তার সঙ্গে ব্যায়ামে সামিল হয়েছে কিশোর আর রবিন, তাদের জন্যেও কঠিন হলো না, তবে মুসার মতো সাহস করতে পারলো না দু'জনের একজনও। ওঠার সময় ভয়ে একবারও নিচে তাকালো না। আর টমসনের জন্যে

ব্যাপারটা কিছুই না। বোঝা গেল নিয়মিত ওঠানামা করেন তিনি।

দুলন্ত মই বেয়ে উঠে এসে ঝুলন্ত ঝুড়িতে চড়লো ওরা। আক্ষরিক অর্থেই একটা ঝুড়ি। বেত আর বাঁশের তৈরি বড় একটা দোলনার মতো। আসলে তিনজনের জায়গা হয়, চারজনের জন্যে ঠাসাঠাসি। ঝুড়ির কিনারে লোহার আটটা আঙটা লাগানো, সেগুলো থেকে মোট বারোটা দড়ি উঠে গেছে বেলুন পর্যন্ত। বেশ কায়দা করে ওই দড়ি দিয়ে বেলুনের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে ঝুড়িটা। টমসন জানালেন, বেলুনটার ব্যাস চল্লিশ ফুট।

'কিসে ভাসিয়ে রেখেছে?' মুসা জানতে চাইলো। 'গরম বাতাস?'

'না। গরম বাতাসের ক্ষমতা কম, চারজনকে ভাসিয়ে রাখতে এর তিনগুণ বড় বেলুনের দরকার হতো। কোল গ্যাস গরম বাতাসের চেয়ে ভালো, আরও ভালো হলো হিলিয়াম গ্যাস। তবে সব চেয়ে ক্ষমতাশালী হলো হাইড্রোজেন। এ-বেলুনটাতে তা-ই ভরা আছে। বিজ্ঞানীদের জানামতে এখন সব চেয়ে হালকা গ্যাস হলো হাইড্রোজেন, বাতাসের চেয়ে চোদ্দ গুণ হালকা।'

ওপরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুসা। বেলুনের নিচে গোল একটা মুখ, খোলা, দেখে অবাক লাগছে তার। ওই মুখ দিয়ে মানুষ ঢুকে যেতে পারবে। 'গ্যাস বেরিয়ে যায় না?'

'না। হালকা বলে সব সময় ওপরে ওঠারই চেষ্টা করে গ্যাস, কক্ষনো নিচে নামতে চায় না।'

'তার মানে গোড়া থেকে দড়ি খুলে দিলেই আরও ওপরে উঠে যাবো আমরা?'

'নিশ্চয়ই। বাচ্চাদের খেলনা বেলুন দেখনি, ছেড়ে দিলেই কেমন অনেক উঁচুতে উঠে যায়?'

ঘাড় নাড়লো মুসা। 'নামার দরকার হলে নামবো কিভাবে?'

'আছে, ব্যবস্থা আছে। এই যে, এটা হলোগে ভালভ লাইন। বেলুনের ভেতর দিয়ে ওপরে চলে গেছে এই দড়িটা, একটা ভালভের সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হয়েছে। এটা টানলেই ভালভ খুলে কিছুটা গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে ওপরে ওঠা বন্ধ করে দেবে বেলুনের। আরও গ্যাস বের করে দিলে ধীরে ধীরে নিচে নামতে আরম্ভ করবে। এভাবে যতোই ছাড়বে, ততোই নিচে নামতে থাকবে বেলুন।'

'কিন্তু তারপর আবার যখন ওঠার দরকার হবে?' প্রশ্ন করলো কিশোর।

'এই যে বস্তাগুলো আছে তোমার পায়ের নিচে, সব বালিতে ভরা। বোঝা কমানোর জন্যে ওগুলো ফেলে দিলেই আবার হালকা হয়ে ওপরে উঠতে শুরু করবে বেলুন। এরকম সত্তরটা বস্তা নেয়া সম্ভব একবারে। ভালব টেনে, বস্তা ফেলে, ইচ্ছেমতো যে কোনো উচ্চতায় ভেসে বেড়াতে পারবে তুমি।'

'দারুণ ব্যাপার মনে হচ্ছে!' বেলুন সম্পর্কে অনেক কথা জানে রবিন, বইয়ে

পড়েছে, তবু বাস্তবে এসব দেখে বিশ্বাস করতে পারছে না সে।

'সহজ কাজ,' মন্তব্য করলো মুসা। 'ওড়ানো খুব সহজ।'

'না, এই ভুলটা করো না,' সাবধান করলেন ওয়ারডেন। 'অতো সহজ না ব্যাপারটা। নানারকম স্রোত রয়েছে বাতাসের, কোনোটা ওপরে ওঠে, কোনোটা নিচে নামে, আড়াআড়ি বইতে থাকে কোনো কোনোটা। প্লেন জাস্ট ওগুলো ভেদ করে চলে যায়, নাচানাচি করে অল্পস্বল্প, ব্যস। কিন্তু বেলুনের এঞ্জিন নেই, বাতাস যেভাবে চালায় সেভাবেই চলে। ওপরে ওঠে, নিচে নামে, পাশে ছুটতে থাকে। নিম্নগতি প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে হঠাৎ পড়ে গেলে বস্তা ফেলেও কিছু করতে পারবে না, তার আগেই মাটিতে গিয়ে ধাক্কা খাবে। উর্ধ্বগতি স্রোতে পড়লে দ্রুত উঠতে থাকবে, উচ্চতা কমানোর জন্যে তখন হয়তো গ্যাস বের করে দেবে তুমি। কতোটা বের করলে তার হিসেব রাখতে পারবে না। স্রোত থেকে বেরিয়ে গেলেই পাথরের মতো নিচে পড়তে আরম্ভ করবে, কারণ স্বাভাবিক বাতাসে বেলুনটা ভেসে থাকার মতো গ্যাস আর তখন নেই ভেতরে। কাজেই খুব সাবধানে থেকেও সব সময় সুবিধে করা যায় না। সার্বক্ষণ এই অলটিমিটারের ওপর চোখ রাখতে হয়, কখন নামে, কখন ওঠে। তবে যতোক্ষণ নোঙর করা থাকে, কোনো ভয় নেই। কিন্তু দড়িটা কোনোভাবে ছিঁড়ে গেলে কিংবা ছুটে গেলেই মুশকিল। পাগলাটে এই আকাশযানকে সামলাতে তখন জান বেরিয়ে যাবে।'

চট করে কয়েকটা নাম মনে পড়ে গেল কিশোরের, ওরা বেলুনে চড়লে যারা দড়ি কেটে দিয়ে খুব খুশি হবে। মুসা আর রবিন সেসব কিছুই ভাবছে না, ওরা বেলুনে চড়ে ভেসে বেড়ানোর কল্পনায় রোমাঞ্চিত হচ্ছে।

এটা এক নতুন অভিজ্ঞতা ওদের জন্যে। প্লেনে অনেক চড়েছে। মুসা নিজে প্লেন চালিয়েছে কয়েকবার। কিশোর চালিয়েছে। নানা রকমের প্লেন চালানো শিখছে ইদানীং ওমর ভাইয়ের কাছে। ওমর ভাই, মানে সেই ওমর শরীফ, জলদস্যুর দ্বীপ অভিযানে ওদেরকে নিয়ে গিয়েছিলো যে দুঃসাহসী, দুর্ধর্ষ বেদুইন। তবে বেলুন আকাশে ওড়ার সব চেয়ে পুরনো মাধ্যম হলেও আজকের আগে কোনোদিন তাতে চড়ে দেখেনি তিন গোয়েন্দা। না না, চড়েনি বললে ভুল হবে, চালিয়ে দেখেনি, অন্তত এই সাইজের বেলুন। একটাতে চড়েছিলো বাধ্য হয়ে, জলকন্যার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে।

আকাশে উড়ছে, অথচ এঞ্জিনের গর্জন নেই। একেবারে শান্ত নীরবতা। কানের কাছে শুধু বাতাসের ফিসফিসানী গান আর পায়ের তলায় ঝুড়ির মৃদু মচমচ। আর কোনো শব্দ নেই।

প্লেনের কেবিনে বসলে অনেকটা ঘরে বসে থাকার মতোই মনে হয়, মাটিতে। কিন্তু এখানে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে একেবারে অন্যরকমের অনুভূতি হয়। চোখের সামনে একটা কাঁচ পর্যন্ত বাধা হয়ে নেই। যেদিকে তাকানো

যায়, সব খোলা আর খোলা। খোলা আকাশ, খোলা প্রকৃতি। যেন আরব্য রজনীর যাদুর গালিচায় চড়েছে। আকাশে ওড়ার সময় পাখিদের বোধহয় এরকম খোলা অনুভূতিই হয়।

'বেলুনটার কোনো নাম আছে?' জিজ্ঞেস করলো মুসা।

'আছে। ফ্লাইং বার্ড,' জানালেন টমসন। 'নিচে থেকে ভালোমতো দেখলে দেখবে পাশে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে।'

'আকাশ বিহার!' আনমনে বললো কিশোর।

'কি বললে?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'না, বললাম আকাশ বিহার। আমরা যখন চড়বো, তখন এটার নাম রাখবো আকাশ বিহার। লেখাটেখার দরকার নেই। শুধু মুখে বললেই চলবে।'

'নামটা খুব সুন্দর,' মুসা বললো। 'একটা ছন্দ আছে।'

'ভালো বাংলা নাম সব সময়ই সুন্দর। অন্তত আমার কাছে। যাই হোক,' আরেকটা দড়ি দেখিয়ে ওয়ারডেনকে জিজ্ঞেস করলো, 'ওটা কিসের?' ভালভ লাইনের কাছেই রয়েছে এই দড়িটাও।

'আশা করি ওটা টানার দরকার হবে না তোমাদের কখনও। এটা হলো রিপ লাইন। ভালভ লাইন টেনে ইচ্ছেমতো অল্প অল্প গ্যাস ছাড়তে পারবে। কিন্তু এটা টানার পর বেলুনের ওপর আর কোনো কন্ট্রোল থাকবে না তোমাদের। ওপরে একটা মস্ত ফোকর হয়ে সমস্ত গ্যাস বেরিয়ে যাবে চোখের পলকে।'

'তার মানে ধড়াম,' হাত নেড়ে দেখালো মুসা, কিভাবে মাটিতে পড়বে। 'এটা টানতে যাবো কোন দুঃখে?'

'ধরো তেমন কোনো দুঃখ ঘটলো,' মুসার বলার ভঙ্গি দেখে না হেসে পারলেন না টমসন। 'প্রচণ্ড ঝড়ে পড়তে পারো। তীব্র গতিতে হয়তো তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চললো বাতাস। সামনের পাহাড় চূড়া কিংবা গাছের মাথায় বাড়ি খেয়ে ছাতু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলো। দ্রুত মাটিতে নামতে না পারলে মরবে। তখনই এই রিপ লাইন টানতে হবে তোমাকে। গ্যাস বেরিয়ে যাবে, চুপসে যাবে বেলুন, ঝুড়িটাকে মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে কিছুদূর, তারপর ঝপাৎ করে পড়ে যাবে কোমর থেকে হঠাৎ নেয়ার খুলে যাওয়া পাজামার মতো। অনেক আঁচর-টাঁচড় লাগবে শরীরে, কেটে যাবে হয়তো নানা জায়গায়, বলা যায় না, হাত-পাও ভাঙতে পারে, তবে বেঁচে যাবে তুমি। তবে তার পরের বিপদ কতোখানি হবে, সেটা কোন এলাকার ওপর উড়ছিলে তুমি তার ওপর নির্ভর করে। হয়তো কাছের সড়ক থেকে একশো মাইল দূরে পড়লে, দুর্গম এলাকায়, তাহলে মরেছো। বেলুনের ফোকরটা হয়তো সেলাই করতে পারবে, যদি সঙ্গে করে সুচ-সুতো নিয়ে যাও, কিন্তু আর গ্যাস ভরতে পারবে না। পাবে কোথায়? বেজায় ভারি

হাইড্রোজেন গ্যাসের সিলিণ্ডার, বেলুনের ঝুড়িতে করে নেয়া যাবে না। একেকটার ওজন অনেক। ওরকম ভারি আর শক্ত করতে হয়, কারণ ভেতরে প্রচণ্ড চাপে রাখা হয় হাইড্রোজেন গ্যাস। তাহলে কি দাঁড়ালো? চুপসে যাওয়া একটা বেলুন, এবং তোমার কাছে গ্যাস নেই। কি করবে তখন?'

'কি আর করবো? রেডিওতে সাহায্যের আবেদন জানাবো।'

'এই বেলুনে ওয়্যারলেস নেই। তোমাকে একশো মাইল হেঁটে পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। আরেক কাজ করতে পারো, বেলুনটাকে বিছিয়ে রাখতে পারো। আকাশ থেকে কোনো প্লেনের নজরে পড়ার আশায়। তবে যা-ই করো, তোমার বাঁচার আশা খুব ক্ষীণ। কাজেই, ঘুমের ঘোরেও দড়ি খুলে ভেসে পড়ার কল্পনা করো না।' হাসলেন ওয়ারডেন।

'অনেক ভয় দেখালেন,' হাসতে হাসতে বললো কিশোর।

'আসলে সতর্ক করলাম।'

'ওরকম বোকামি করবো না আমরা, বিশ্বাস করতে পারেন।'

'অবশ্যই বিশ্বাস করি তোমাদেরকে। নইলে বেলুনটা তোমাদেরকে ধার দেয়ার কথা ভাবতামই না।'

ওয়ারডেন এতো ভয় দেখানোর পরেও তিন গোয়েন্দার মুখ দেখে মনে হলো না ওরা তেমন ভয় পেয়েছে। কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'এটাকে রেললাইনের কাছে নেবো কিভাবে?'

'খুব একটা কঠিন কাজ না। গাড়ির পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাবে।'

দড়ির সিঁড়ি বেয়ে বেলুন থেকে আবার নেমে এলো কিশোর, রবিন আর টমসন। একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলো মুসা। ভয়ানক দুঃসাহস দেখালো। হাতে রুমাল পেঁচিয়ে আঁকড়ে ধরলো নোঙর বাঁধার দড়িটা। চেপে ধরে রেখে শাঁ করে নেমে চলে এলো মাটিতে, কিশোরদের অনেক আগে।

ভুরু কুঁচকে মুসার দিকে তাকালেন ওয়ারডেন। 'মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, তোমার মতো ছেলে ভূতকে ভয় পায় কি করে!'

'আর পাবো না, স্যার,' হেসে নিজের বুকে টোকা দিয়ে বললো মুসা। 'ইদানীং না পাওয়ার প্র্যাকটিস করছি।'

'এবং তাতে ভয়টা আরো বাড়ছে,' গোপন কথা ফাঁস করে দিলো রবিন। 'ভূতের কথা ভেবে ভেবে সারাক্ষণ অটো সাজেশন দেয় তো, তাতে হয়েছে উল্টোটা। ভূতের কথা ভোলে তো না-ই, আরও বেশি করে মনে পড়ে।'

নিজের সম্পর্কে এসব শুনতে ভালো লাগে না মুসার। বেলুনের দড়ি খুলতে গেল, গাড়ির পেছনে বাঁধার জন্যে।

'রাখো, রাখো!' তাড়াতাড়ি বাধা দিলেন টমসন। 'খোলার সঙ্গে সঙ্গে ফুড়ৎ করে উড়ে যাবে। দড়ির বাড়তি মাথাটা আগে গাড়ির সঙ্গে বাঁধতে হবে।'

গাছের গুঁড়িতে বাঁধার পরেও মাথার কাছে দড়ির অনেকখানিই বাড়তি রয়ে গেছে। সেটা শক্ত করে গাড়ির পেছনের বাম্পার আর টো-হুকের সঙ্গে বাঁধলেন ওয়ারডেন। তারপর গুঁড়ির ওপরের অংশের দড়ি টেনে ধরলো দুজন রেঞ্জার আর তিন গোয়েন্দা, যাতে বাঁধন খোলার পর আচমকা ঝটকা দিয়ে ওপরে উঠতে না পারে বেলুন।

গুঁড়ির বাঁধন খুলে দড়ি ছাড়তে বললেন ওয়ারডেন। ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনুকের ছিলার মতো শক্ত হয়ে গেল দড়িটা।

'আগে ক্যাম্পে যাবো,' টমসন বললেন। 'গ্যাসের কয়েকটা সিলিণ্ডার নিতে হবে। দরকার হতে পারে।'

পথে সিংহ শিকার সম্পর্কে নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'দুটো সিংহ মেরেছো বললে। দুটোই কি মানুষখেকো?'

'একটা মানুষখেকো, কোনো সন্দেহ নেই,' জবাব দিলো কিশোর। 'আরেকটা মানুষখেকো কিনা জানি না। বোমার মধ্যে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছিলো আমাদের। বেশি নড়াচড়া করছিলাম, তাতেই হয়তো আক্রমণ করে বসেছিলো সিংহটা, যেটাকে প্রথম মেরেছি। মানুষখেকো হতেও পারে, না-ও হতে পারে। তবে পরের বার যেটাকে মেরেছি, সেটা মানুষখেকোই। সিংহী। সাথে একটা দুধের বাচ্চা ছিলো।'

'উঁহুহু, এই মা'গুলো যখন মানুষখেকো হয়, তখনই মুশকিল হয়ে যায় বাচ্চাগুলোর জন্যে।'

'না মেরেও উপায় ছিলো না। একে তো মানুষখেকো, তার ওপর আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। বাচ্চাটা নিয়ে গেছি আমরা। আরেকজন মা পেয়ে গেছে অবশ্য,' বুড়ো আঙুল দিয়ে মুসাকে দেখালো কিশোর।

'আর ক'টা মানুষখেকো আছে বলে মনে হয়?'

'এ-পর্যন্ত একটাকে দেখেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না, একটা বা দুটো সিংহ এতো মানুষ মারে কি করে?'

'পারে। দ্য ম্যান ইটারস অভ সাভো বইটা পড়োনি? তখনও দুটোই ছিলো সিংহ। একশোর বেশি মানুষ মেরে ফেলেছিলো। তা যেটাকে দেখলে সেটা কি রকম?'

'একটা দৈত্য। এতো বড় সিংহ কমই দেখেছি। বারো ফুটের কম হবে না লম্বা, সাত-আট মন ওজন, চমৎকার তামাটে রঙের চামড়া, কুচকুচে কালো কেশর। যেমন বড়, তেমনি চালাক। ছায়ার মতো নিঃশব্দে আসে-যায়। নিগ্রোরা তো ভাবছে, ওটা সিংহ নয়, কোনো দুষ্ট প্রেত। শুধু খুনের আনন্দেই খুন করে। যে সিংহীটাকে মেরেছি ওটার সঙ্গী হলেও অবাক হবো না। যা-ই হোক, বেলুনটা পাওয়ায় খুব উপকার হবে। ও লাইনের কাছে যাওয়ার আগেই ওপর থেকে দেখে

ফেলবো আমরা। মই বেয়ে তখন তাড়াতাড়ি নেমে গাড়িতে করে চলে যাবো লাইনের কাছে। ও লাইনের কাছে পৌঁছার আগেই আমরা গিয়ে বসে থাকবো ওখানে। গাড়িতে বসেই গুলি করবো।'

'দেখ, কাজ হয় কিনা,' খুব একটা ভরসা করতে পারছেন না যেন ওয়ারডেন। কারণ সিংহের বিচিত্র স্বভাবের কথা তাঁর জানা।

ক্যাম্পে পৌঁছলো গাড়ি। কেবিন আর তাঁবুগুলো থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে এলো লোকে, এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখার জন্যে। তাদের কেউ রেঞ্জার, কেউ ইউরোপিয়ান কিংবা আমেরিকান মেহমান, সাফারিতে এসেছে। তবে যাদেরকে দেখে অবাক হলো তিন গোয়েন্দা, তারা তাদের নিজেরই লোক, তিরিশজন কুলি আর বন্দুকবাহক।

'তোমরা এখানে?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'ওখানে থাকতে সাহস হলো না, বাওয়ানা,' জবাব দিলো দলপতি খামবু। 'সিংহ হানা দিয়েছিলো কাল রাতেও। আরেকটু হলেই কাকামিকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। সিমবা থাকাতে বেঁচেছে। সিংহের সাড়া পেয়েই ঘেউ ঘেউ শুরু করলো। সতর্ক হয়ে গেলাম আমরা।'

'হুঁ। ভালোই করেছো এসে।'

তিন গোয়েন্দাকে দেখে লাফাতে লাফাতে ছুটে এলো সিমবা। প্রথমে মুসার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার বুকে দুই পা তুলে দিয়ে গাল চাটতে শুরু করলো। মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে আদর করলো মুসা।

তারপর কিশোর আর রবিনকে নিয়ে পড়লো বিশাল কুকুরটা।

দুটো বাড়তি সিলিণ্ডার গাড়িতে তোলা হলো। বেলুন টেনে নিয়ে আবার রওনা হলো গাড়ি, বিশ মাইল দূরে রেললাইনের কাছে যাওয়ার জন্যে।

চলার গতি খুব ধীর। একশো ফুট লম্বা দড়ির মাথায় বাঁধা এতোবড় একটা বেলুনকে টেনে নিয়ে যাওয়াটা চাট্টিখানি কথা নয়। ওয়ারডেন যাচ্ছেন না সঙ্গে। গাড়ি চালাচ্ছে মুসা। তাড়াতাড়ি করলে বেশি কাত হয়ে যাবে বেলুনটা, নিচের খোলা মুখ দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহলে সর্বনাশ! সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল।

তার ওপরে রয়েছে বাতাসের অভদ্রতা। মাঝে মাঝেই জোরালো বাতাস এসে হ্যাঁচকা টান মেরে ছিনিয়ে নিতে চাইছে বেলুনটাকে। আরও বড় বিপদ হলো আশপাশের বড় বড় গাছপালা। কখন কোনটার মাথায় বাড়ি খেয়ে যাবে ফুস্‌স্‌ করে ফেঁসে, ঠিক আছে?

যা-ই হোক, বেলুনটা নিয়ে নিরাপদেই অবশেষে রেলওয়ে ক্যাম্পের কাছে এসে পৌঁছলো ওরা।

আট

বেলুন দেখে সাড়া পড়ে গেল ক্যাম্পে। কাজ ফেলে হাঁ করে সবাই তাকিয়ে রইলো বিশাল গোলকটার দিকে।

'এখন ভালো একটা নোঙর দরকার,' কিশোর বললো।

'ওটা হলে কেমন হয়?' মাটিতে পড়ে থাকা পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটা গাছের কাণ্ড দেখালো মুসা। 'যথেষ্ট ভারি হবে। ডজন-খানেক বেলুন বেঁধে রাখলেও নড়বে না।'

হাসলো কিশোর। 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু গাড়ি থেকে দড়িটা খুলে নিয়ে গিয়ে বাঁধবে কি করে?'

'কেন? আমরা দু'জনে টেনে ধরে রাখবো। দড়িটা খুলে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলবে রবিন।'

'মাথা খারাপ। ভুলে গেছো, ঝুড়িতে চারজন উঠেছিলাম আমরা, তাতেও বিন্দুমাত্র নামেনি বেলুনটা।'

'দু'জনে ধরলে চোখের পলকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে।'

'হুঁ,' ভাবনায় পড়ে গেল যেন মুসা। শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল হলো চোখ। 'তাহলে আটজন দশজন যতোজন লাগে, ডেকে আনবো।'

'রাজা মাকুমার নির্দেশ ভুলে গেছো? যা করার একা আমাদেরকেই করতে হবে।'

গাছের কাণ্ডটার ওপর বসে ভাবতে লাগলো তিনজনে। দশজনের কাজ তিনজনে কি করে করবে?

'মাকুমার কথা না শুনলে কি করবে সে?' রেগে গিয়ে বললো রবিন। 'সিংহ না হয় না-ই মারলাম। আমাদের কাজে আমরা চলে যাবো।'

'এখন আর না শুনে পারবো না। নাক বেশি গলিয়ে ফেলেছি। শত্রু বানিয়ে ফেলেছি তাকে। ভুলে যেও না সে ডিস্ট্রিক্ট অফিসার, একটা ছুতো করে সোজা বের করে দেবে আমাদেরকে এখান থেকে। জন্তুজানোয়ার ধরাও বন্ধ করে দেবে।'

চুপ হয়ে গেল রবিন।

নিচের ঠোঁটে ঘন ঘন কয়েকবার চিমটি কাটলো কিশোর। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। 'দাঁড়াও। ব্যবস্থা বোধহয় একটা হবে।'

গাড়ির বুট থেকে একটা দড়ি বের করে আনলো সে। দড়ির একমাথা বাঁধলো বেলুনের দড়ির সঙ্গে, আরেক মাথা কাণ্ডের সঙ্গে। টেনেটুনে দেখলো যথেষ্ট শক্ত হয়েছে কিনা। তারপর বাম্পার আর হুকের গিঁট খুলে দিলো। লাফিয়ে কয়েক ফুট

ওপরে উঠে গেল বেলুনটা, টান পড়লো নতুন দড়িতে, আরো আঁট হয়ে গেল নতুন গিটগুলো। কিশোরের ভয় হলো, খুলেই না চলে যায়। গেল না। তাড়াতাড়ি সে আর রবিন মিলে বেলুনের মূল দড়ির মাথাটা পেঁচিয়ে বেঁধে ফেললো কাণ্ডর সঙ্গে।

হাসতে হাসতে বললো মুসা, 'বুদ্ধি থাকলে এমনিই হয়। দশজনের কাজ একজনেই সেরে ফেললে। হাহ্ হাহ্!'

কিশোরও হাসলো। একটা কঠিন সমস্যা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

ঝুড়িতে উঠে সিংহের ওপর নজর রাখার জন্যে যেন আর তর সইছে না ওদের। তবে তার আগে আরেকটা জরুরী কাজ আছে মুসার। সিংহের বাচ্চাটাকে খাওয়ানো। টমসনের ক্যাম্প থেকে খাবার নিয়ে এসেছে। ওগুলো বের করে নিয়ে চললো তাঁবুতে। কিশোর আর রবিনও চললো তার সঙ্গে। অনেক পরিশ্রম করেছে। বিছানায় লম্বা হয়ে কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিতে পারলে ভালো হয়। তাড়াতাড়িই ফিরে এলো ওরা। বেলুনে চড়লো দড়ির মই বেয়ে।

বাতাসের জোর বেড়েছে। উত্তাল সাগরে ভাসমান ডিঙির মতোই দুলছে বেলুনের ঝুড়িটা। তবে ঢেউয়ের সঙ্গে এর তফাত হলো, পানিতে প্রতিটি ঢেউয়ের মাথায় চড়ার পর ঝপ করে খাদে পড়ে যায় ডিঙি, আর এখানে দোলনার মতো কাত হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক। বেশি কাত হয়ে গেলে ডিগবাজি খেয়ে গিয়ে পড়তে হবে একশো ফুট নিচে মাটিতে। ভর্তা হয়ে যাবে একেবারে।

ঝুড়ির ধার খামচে ধরে বসে রইলো ওরা। বাতাসের জোর না কমলে কিছু করা যাবে না। আবহাওয়ার কোনো ঠিকঠিকানা নেই এসব অঞ্চলে। এই ভালো তো এই খারাপ। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাতাসের বেগ কমে গেল। দুলুনি অনেক কমলো ঝুড়ির। বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে আশপাশের এলাকায় নজর বোলালো ওরা।

তিন মাইল লম্বা লাইনের মাঝ বরাবর জায়গায় বেলুন বাঁধা হয়েছে। এতো ওপর থেকে বিনকিউলারের সাহায্যে সহজেই এদিকে দেড় মাইল ওদিকে দেড় মাইল জায়গা দেখতে পাচ্ছে ওরা। শ্রমিকেরা কাজ করছে। সাভান্না অঞ্চল এটা। তামাটে রঙের লম্বা লম্বা ঘাসের বন ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের পর মাইল জুড়ে। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়। এখানে ওখানেও খুদে পাহাড়ের মতো মাথা তুলে রেখেছে কয়েক ফুট উঁচু উইয়ের ঢিবি।

'দারুণ!' উল্লাসে প্রায় চিৎকার করে উঠলো কিশোর। 'সবই দেখা যাচ্ছে এখন। ঘাসের মধ্যে কিছু নড়লেই চোখে পড়বে। অথচ আমাদেরকে দেখতে পাবে না।'

পুরো একটা ঘন্টা ধরে সাভান্না আর প্রান্তরের ধার ঘেঁষা বনের দিকে নজর

রাখলো ওরা। তারপর কনুই দিয়ে কিশোরের গায়ে গুঁতো মারলো মুসা। 'ওই দেখো! ওই যে বন থেকে বেরোচ্ছে··· চারটা···পাঁচটা···না, ছয়টা সিংহ!'

'রবিন, থাকো এখানে,' বলেই ঝুড়ির ধার টপকে দড়ির মই ধরলো কিশোর। 'মুসা, জলদি এসো।' সে নামলো মই বেয়ে। মুসা বেলুনের দড়ি ধরে ঝুলে। মাটিতে নেমেই দৌড় দিলো গাড়ির দিকে। মিনিটখানেক পরেই দোল খেতে খেতে রওনা হলো ল্যাণ্ড রোভার।

অবাক হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে শ্রমিকেরা। নিচে থেকে এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছে না ওরা। রেল লাইন থেকে বেশ কিছুটা দূরে বেলুন নোঙর করা হয়েছে। বনটা রয়েছে লাইনের অন্যপারে। ওখানে গাড়ি যাবে না। কাজেই লাইনের কাছে এসে লাফিয়ে নামলো মুসা আর কিশোর। পেছনের দরজা খুলে টান মেরে বের করে নিলো দুটো রাইফেল।

ওদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো না কেউ। কারণ অস্ত্র ব্যবহার তো দূরের কথা, বহন করাও ওদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ডিস্ট্রিক্ট অফিসার। কাজে মন নেই ওদের। বার বার মুখ তুলে তাকাচ্ছে ছেলেদের দিকে। সিংহ ছয়টাকে এখন অনেকেই দেখেছে। ছয়টা মানুষখেকোর বিরুদ্ধে—যদি মানুষখেকো হয় সিংহগুলো, দুটো ছেলে কতোখানি কি করতে পারবে সন্দেহ আছে। তবু ওই ছেলেদুটোই এখন ওদের একমাত্র ভরসা।

হেলেদুলে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সিংহগুলো।

'মনে হচ্ছে সাধারণ সিংহ,' আশা করলো মুসা। 'ক্ষতি করবে না।'

'কি করে বুঝলে?'

শার্ট খুলে ফেললো কিশোর। শ'খানেক ফুট এগিয়ে ওটা ফেলে দিয়ে ফিরে এলো মুসার কাছে।

শার্টটার কাছে এসে কৌতূহলী হয়ে ওটাকে শুঁকলো সিংহগুলো। পা দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো কেউ কেউ। তারপর একটু দূরে গিয়ে শুয়ে পড়লো লম্বা হয়ে।

'ওই যে তোমার জবাব,' কিশোর বললো। 'শার্টে মানুষের গায়ের গন্ধ ভারি হয়ে লেগে আছে। মানুষখেকো হলে ওটাকে চিরে ফালা ফালা করে ফেলতো সিংহগুলো।'

'সব সময় সেটা না-ও করতে পারে,' পেছনে বলে উঠলো একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকিয়ে ওরা দেখলো, সেই শ্বেতাঙ্গ শিকারী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'আপনার নাম জন কক, জানি,' হাত বাড়িয়ে দিলো কিশোর।

হাতটা ধরে জোরে জোরে ঝাঁকিয়ে দিলো শিকারী। মুখটা অনেকটা লেবুর মতো। চোখে সার্বক্ষণিক বিরক্তি। ঠোঁটের কোণ দুটোও বেঁকে রয়েছে বিরক্তিতে। 'ভাবলাম, সাহায্য লাগতে পারে তোমাদের। ছ'টা সিংহকে সামলানো সহজ কথা

নয়। তাছাড়া তোমরা ছেলেমানুষ।'

হাসলো কিশোর। জবাব দিলো না।

'একটু আগে যে শার্টের কথা বলছিলে,' আবার বললো কক, 'সেটা ঠিক নয়। তোমার ধারণা ভুল। সিংহ ভীষণ চালাক। বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকে অনেক সময়, শিকারকে কাছে পাওয়ার জন্যে। সিংহ খেয়াল করছে না ভেবে অসতর্ক হয়ে পড়ে শিকার। ঠিক তখনই এসে তার ঘাড়ে পড়ে সিংহ।'

'জানি এসব কথা,' কিশোর বললো। 'তবে শিওর না হয়ে গুলি করতে পারবো না। মানুষখেকো ছাড়া সাধারণ সিংহ মারার অনুমতি দেয়া হয়নি আমাদেরকে। এক কাজ করা যায়, আসুন ভয় দেখিয়ে ওগুলোকে আবার বনের ভেতরে ফেরত পাঠাই।'

'ভালো বুদ্ধি,' একমত হলো কক। এক চিলতে শয়তানী হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল তার ঠোঁটে। কাঁধে রাইফেল ঠেকালো সে।

একসঙ্গে গর্জে উঠলো তিনটে রাইফেল।

লাফিয়ে উঠে বনের দিকে দৌড় দিলো সিংহগুলো। আবার গর্জে উঠলো রাইফেল। টলে উঠলো একটা সিংহ। ঝট করে মুসার দিকে ফিরলো কিশোর। 'তুমি গায়ে গুলি করেছো!'

'না। মাথার ছয় ফুট ওপরে। গায়ে লাগতেই পারে না।'

'তাহলে কে করলো?' বলতে বলতেই ককের দিকে ফিরলো কিশোর। কিন্তু কোথায় কক? আগের জায়গায় নেই। দৌড় দিয়েছে রেললাইনের দিকে।

ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো দুই গোয়েন্দা। বন থেকে বেরোলো না সিংহগুলো। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করে বনের দিকে পা বাড়ালো ওরা। খুব সাবধানে। বনের কাছাকাছি এসে দেখলো, ঘাসের মধ্যে পড়ে রয়েছে একটা সিংহ। এটার গায়েই গুলি লেগেছে। নড়লো না। ঘুমন্ত কুকুরের মতো গুটিশুটি হয়ে আছে তামাটে রঙের বিশাল জানোয়ারটা। বাঁ কানের কাছে একটা ফুটো থেকে রক্ত পড়ছে। চিরনিদ্রায় শায়িত পশুরাজ, তার এ-ঘুম আর ভাঙবে না কোনোদিন।

শার্টটা তুলে নিলো কিশোর। স্টেশনে চললো কিমবার কাছে রিপোর্ট করার জন্যে। বলতে গিয়ে বাধা পেলো সে। কাটা কাটা গলায় স্টেশন মাস্টার বললো, 'শুনেছি। কক এইমাত্র বলে গেল। এরকম একটা ভুল করলে কি করে? রাইফেল চালাতে জানো না, তো ধরেছো কেন?'

হাঁ করে তাকিয়ে রইলো কিশোর।

রেগে গেল মুসা। 'আমাদের ওপর দোষটা চাপিয়ে গেছে নাকি ব্যাটা?'

'দেখ,' অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়লো কিমবা, 'কককে আমিও দেখতে পারি না। কিন্তু তার নিশানা খারাপ, একথা কিছুতেই বলতে পারবো না। যতো যা-ই

হোক, সে পেশাদার শিকারী। নিশানা ভালো না হলে একাজ করা যায় না। ভুলই করেছি আমি! গাধামি! বড় মানুষের কাজ কয়েকটা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে।'

'ঠিকই বলেছেন,' শান্তকণ্ঠে বললো কিশোর। 'একটা ব্যাপারে অন্তত ঠিক বলেছেন আপনি। নিশানা সত্যিই ভালো ককের। রাইফেল চালাতে জানে সে। একটি বারের জন্যেও কি আপনার মনে হয়েছে সিংহটাকে সে-ই মেরেছে, ইচ্ছে করে?'

'মানে?'

'আপনাকে বোঝানোর জন্যে, যে সিংহটাকে আমরা মেরেছি। আমাদের নিশানা খারাপ। এবং তা-ই বুঝেছেন আপনি। আপনিই আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন, আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করবে কক। কিন্তু সত্যিই যখন করলো, তার কথাই বিশ্বাস করলেন আপনি, তাকে ছেড়ে দিলেন। ঠিকই বলেছেন আপনি, আমরা ছেলেমানুষই। নইলে ওর মতো একটা সাপকে বিশ্বাস করি! কিন্তু মিস্টার কিমবা, আপনি একজন বড় মানুষ, আমাদের মতো ছেলেমানুষ নন, আপনাকে কি করে বোকা বানালো সে?'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলো কিমবা। 'জানি না! ... মাথায় ঢুকছে না কিছুই!' দ্বিধায় পড়ে গেছে সে। 'যাই হোক, রাজা মাকুমার কাছে রিপোর্ট করতেই হবে আমাকে।'

'যান, গিয়ে সব বলুন তাকে,' ঝাঁঝালো হয়ে উঠলো কিশোরের কণ্ঠ। 'আশা করি, জন ককের মতো শয়তানকে চেনার মতো বুদ্ধি অন্তত তার ঘটে আছে।'

নয়

আবার এসে ঝুড়িতে উঠলো মুসা আর কিশোর। রবিনকে জানালো সব কথা। শুনে সে-ও রেগে গেল।

মানুষখেকোর জন্যে নজর রাখতে শুরু করলো আবার ওরা।

স্টেশনে এসে থামলো মোমবাসার ট্রেন। দু'জন মহিলা নেমে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলো প্ল্যাটফর্মে। মাটিতে হলে ওদের কথাবার্তা একশো ফুট দূরে থেকেও শোনা যাবে না। কিন্তু বেলুনের ওপর থেকে বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'ঈশ্বর, এ-কোথায় এলাম!' বললো একজন।

'এখন ট্যাক্সি পাই কোথায়?' দ্বিতীয়জন বললো।

বেঞ্চে বসে ঢুলছে একজন নিগ্রো। তারদিকে এগিয়ে গেল দু'জনে। প্রথমজন বললো, 'এক্সকিউজ মী, কিতানি সাফারি লজে যাবো কিভাবে বলতে পারেন?'

ঘুমজড়ানো চোখ মেলে তাকালো লোকটা। এমন ভঙ্গিতে হাত নাড়লো, যেন মাছি তাড়ালো।

'বোঝেনি!' দ্বিতীয় মহিলা বললো। 'কি যে করি এখন!'

ঝুড়ির কিনার দিয়ে ঝুঁকে তাকালো কিশোর। চেঁচিয়ে বললো, 'সাহায্য লাগবে?'

এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো দুই মহিলা।

'কে কথা বললো? সত্যি শুনলাম?'

'হ্যাঁ। ইংরেজিতে বলেছে!'

বেঞ্চে বসা নিগ্রোর দিকে তাকালো আবার দু'জনে। ঘুমিয়ে পড়েছে আবার লোকটা। চারপাশে তাকাতে তাকাতে প্রথম মহিলা বললো, 'আশ্চর্য...'

'আশ্চর্যের কিছু নেই, ম্যাডাম,' কিশোর বললো। 'ওপরে তাকান। তাহলেই দেখতে পাবেন।'

ওপর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো দুই মহিলা।

'নরিয়া!' বলে উঠলো প্রথমজন, 'দেখ কাণ্ড! বেলুন!'

'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!' বললো নরিয়া। 'ওটা আসল না! স্বপ্ন দেখছি!'

'তোমরা ওখানে কি করছো, ইয়াং ম্যান?' ডেকে জিজ্ঞেস করলো প্রথম মহিলা।

হেসে বললো কিশোর, 'সিংহ দেখছি। আপনাদের সমস্যাটা কি?'

'কিতানি সাফারি লজে যেতে চাই।'

'তাহলে বসতে হবে। নাইরোবির ট্রেন ধরবে এসে লজের গাড়ি।'

'কতোক্ষণ?'

'দুই ঘন্টা।'

'সর্বনাশ! ইয়াং ম্যান, আমরা আমেরিকান টুরিস্ট। এ-কি ধরনের ব্যবহার? দুই ঘন্টা! এতোক্ষণ কি করবো আমরা, কোথায় বসবো!'

'স্টেশনেই বসুন।'

'স্টেশনে বসার জন্যে আফ্রিকায় আসিনি আমরা। কাছাকাছি আর কিছু দেখার নেই?'

'গাঁয়ে যেতে পারেন। যাবেন?'

'যাবো।'

'কাছেই দুটো গ্রাম আছে। একটার নাম মমবো। হেঁটে যেতে কয়েক মিনিট লাগে।'

'নিয়ে যাবে আমাদেরকে?'

'সরি, ম্যাডাম, এখানে একটা জরুরী কাজ করছি আমরা। একাই যান, কিছু হবে না।'

নিজেদের মধ্যে দ্রুত আলোচনা করে নিলো দুই মহিলা। ঘড়ি দেখলো। তারপর মমবোর পথ কোনটা কিশোরের কাছে জেনে নিয়ে রওনা হয়ে গেল গাঁয়ের

দিকে।

ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে তিন গোয়েন্দা। খোলা অঞ্চল পেরিয়ে গিয়ে ছোট একটা বনে ঢুকলো দু'জনে, ওপাশ দিয়ে বেরিয়ে ছোট পাহাড়ের ঢাল বেয়ে গাঁয়ের দিকে উঠতে শুরু করলো।

ঠিক এই সময় সিংহটা চোখে পড়লো রবিনের। বন থেকে বেরিয়ে মহিলাদের পিছু নিয়েছে। ওরা টেরই পায়নি কিছু।

সিঁড়ি দিয়ে নামার আর সময় নেই। মুসার মতো হাতে রুমাল জড়িয়ে প্রাণের মায়া না করে পিছলে মাটিতে নামলো কিশোর। দৌড় দিলো গাড়ির দিকে। দু'জনে দুটো রাইফেল ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ছুটলো মহিলাদের পেছনে।

খোলা জায়গা পেরিয়ে, বন পেরিয়ে ওপাশে বেরিয়ে তাকালো ঢালের দিকে। সিংহটাও নেই, মহিলাদেরকেও চোখে পড়ছে না। গেল কোথায়?

'ধরে নিয়ে যায়নি তো!' হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মুসা।

ঢাল বেয়ে প্রায় দৌড়ে উঠে এসে গাঁয়ে ঢুকলো দু'জনে। কুঁড়েগুলোর মাঝের পথ দিয়ে ছুটে এসে দাঁড়ালো গাঁয়ের বারোয়ারি উঠনে, যেখানে নাচ গান হয়।

মহা উত্তেজনা চলছে এখানে। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো-মহিলারা যেন এসে ভেঙে পড়েছে। ঘিরে ধরেছে সাংঘাতিক আকর্ষণীয় কিছুকে।

তাড়াতাড়ি এসে ঠেলে ভিড় সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো দুই গোয়েন্দা। দুই মহিলা আর সিংহটাকে পাওয়া গেল ওখানেই। লাফ দিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর আর মুসা। রাইফেল তুললো সিংহটাকে মেরে মহিলাদেরকে বাঁচানোর জন্যে।

ওরা আশা করেছিলো, মানুষখেকোটাকে মারতে আসায় খুশি হয়ে ওদেরকে স্বাগত জানাবে গাঁয়ের লোক। কিন্তু উল্টো ব্যাপার ঘটলো। রেগে গেল জনতা। লাফিয়ে এগিয়ে এসে থাবা দিয়ে ওদের রাইফেল নামিয়ে দিলো বিশালদেহী একজন নিগ্রো। চেঁচিয়ে বললো, 'না না, গুলি করো না! সিংহটাকে মারলে আমরা তোমাদেরকে মারবো!'

তাজ্জব হয়ে গেল দুই গোয়েন্দা।

'কেন?' কিশোর জিজ্ঞেস করলো, 'এমন কি হয়ে গেল সিংহটা?'

লোকটা জবাব দিলো, 'ও ভালো সিংহ। আমাদের এখানে থাকে। পাহারা দেয়। কুত্তার চেয়ে ভালো। আমাদের দেখাশোনা করে। খারাপ মোষ গাঁয়ে ঢুকতে চাইলে মোষকে মেরে ফেলে। বন থেকে অনেক শুয়োর আসে, ফসল নষ্ট করে, বাগান নষ্ট করে। শুয়োরকে মেরে ফেলে ও।'

বোকা হয়ে গেছে যেন দুই গোয়েন্দা। পরস্পরের দিকে তাকালো। কি করতে এসেছিলো, আর কি হলো। ওরা ভেবেছিলো মানুষখেকো মেরে বাহাদুরি নেবে,

তার বদলে পেলো লজ্জা। এমনকি যে মহিলাদেরকে মানুষখেকোর হাত থেকে উদ্ধার করবে ভেবেছিলো, তারাও ওদের এই 'বীরত্বকে' ভালো ভাবে নিতে পারলো না।

'সিংহ তাহলে ভালো চেনো না তোমরা,' বললো নরিয়া।

'আপনারা মনে হচ্ছে চেনেন?' মোলায়েম গলায় কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গেই বললো কিশোর।

'চিনি। ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কে গিয়েছিলাম, সেখান থেকেই আসছি। অনেক সিংহ দেখেছি, ওগুলোর মাঝে ঘুরে বেরিয়েছি, কিচ্ছু করেনি আমাদের। পনেরো ফুটের মধ্যে গাড়ি নিয়ে গিয়েছে গাইড, বসে বসে দেখেছি আমরা। সিংহগুলো চোখ তুলেও তাকায়নি আমাদের দিকে। হাই তুলেছে। আকাশের দিকে পা তুলে দিয়ে গড়াগড়ি খেয়েছে বেড়ালের বাচ্চার মতো। কেউ কেউ চুপচাপ ঘুমিয়ে থেকেছে। একেবারে যেন পোষা বেড়াল, শুধু অনেক বড়, এই যা।'

'গাড়ি থেকে নেমেছিলেন?'

'না। অনুমতি দেয়া হয়নি। কিন্তু দিলেও কোনো ক্ষতি হতো না, বুঝতে পেরেছি। এতো ভদ্র আর শান্ত জানোয়ার আর দেখিনি। একটা মাছিও মারতে পারবে না।'

'সিংহকে বেশি বিশ্বাস করে ফেলেছেন।'

'জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে আমাকে শেখাতে এসো না, ইয়াং ম্যান,' কড়া গলায় বললো নরিয়া। 'বাড়িতে অনেক বেড়াল পুষি আমি। এই সিংহগুলো অবিকল ওদের মতো। এটাকেই দেখ না, কি ভদ্র।'

'ভদ্র' জানোয়ারটা ইয়া বড় হাই তুললো। দেখিয়ে দিলো তিন ইঞ্চি লম্বা ধারালো শ্বদন্ত, আর একসারি ক্ষুরধার দাঁত। নরিয়ার মুখটা সহজেই এঁটে যাবে বিশাল ওই মুখগহ্বরে।

কিশোরদেরকে যে বাধা দিয়েছে সে গাঁয়ের সর্দার। মাপ চাওয়ার ভঙ্গিতে বললো, 'খারাপ ব্যবহার করে ফেলেছি। কিছু মনে করো না। তোমাদের কোনো দোষ নেই, তোমরা তো আর জানতে না এটা ভালো সিংহ। ও আমাদের ফসল বাঁচায়, বাগান রক্ষা করে। দেখতে চাইলে এসো।'

ঘুরে ঘুরে বাগান দেখালো সর্দার। কিশোরদের সঙ্গে মহিলারাও দেখলো। দেখা শেষ করে আবার সিংহটার কাছে ফিরে এলো ওরা।

'বেট,' নরিয়া বললো, 'এক কাজ করা যাক। এতো ভালো
একটা সিংহকে মনে রাখার জন্যে কিছু নিয়ে যাই। একগুচ্ছ কেশর কেটে নিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'কিংবা একটা নখ?' একমত হয়ে বললো বেট। 'চমৎকার দেখতে, তাই না? কেমন চকচক করছে। বাড়ি ফিরে গিয়ে জুয়েলারের দোকান থেকে আংটিতে

বসিয়ে নেবো। দারুণ হবে কিন্তু! ব্যাগে কাঁচি আছে। কাটার চেষ্টা করি, কি বলো?'

'করো।'

ব্যাগ থেকে কাঁচি বের করলো দু'জনেই। কিন্তু সিংহের কাছে এসে আর গায়ে হাত দেয়ার সাহস করতে পারলো না। একজন আরেকজনকে চাপাচাপি করতে লাগলো কাটার জন্যে।

অবশেষে সাহস করে সিংহের কেশরে হাত রাখলো নরিয়া।

চোখ মেলে তাকালো সিংহ। ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় বিরক্ত হয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলো দুই মহিলাকে। আর সিংহের ঠেলা মানেই এক সাংঘাতিক ব্যাপার। প্রায় ছিটকে গিয়ে কাছের কুঁড়ের দেয়ালে পড়লো দু'জনে। একজন পড়ে গেল মাটিতে। আরেকজন পড়লো তার ওপর।

আবার চোখ মুদে ঘুমাতে লাগলো সিংহ।

ধরেটরে মহিলাদেরকে তুললো কিশোর আর মুসা। মাটি লেগে গেছে মহিলাদের পোশাকে, সিংহের নখ লেগে ছিঁড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। কনুয়ের কাছে ছাল উঠে গেছে। আর বারোটা বেজে গেছে স্নায়ুর। একটা গাছের কাণ্ডের ওপর দুর্বল ভঙ্গিতে বসে পড়লো দু'জনে, কাণ্ডটা ঢাক হিসেবে ব্যবহার করে গ্রামবাসীরা। ঘুমন্ত সিংহটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে অবাক দৃষ্টিতে।

'এরকম একটা কাজ কি করে করতে পারলো!' অনুযোগের সুরে বললো নরিয়া।

ওদের কাছে এসে বসলো কিশোর। লেকচার দেয়ার মানসিকতা নেই তার এখন, তবে এই বোকা মহিলাদেরকে সাবধান না করলে যে কোনো সময় সিংহের খাবার হয়ে যেতে পারে।

'খুব বাজে একটা ব্যাপার ঘটে গেল,' নরম গলায় বললো সে। 'তবে সিংহটাকে দোষ দিতে পারবেন না। ঘুম থেকে আপনারা উঠে যদি দেখেন চুল কাটছে কেউ, কি করবেন? রেগে যাবেন না? বাধা দেবেন না?'

'কিন্তু সিংহটাকে আমরা খুব ভদ্রলোক ভেবেছিলাম,' বললো বেট।

'ওদেরকে বিরক্ত যতোক্ষণ না করবেন, ভদ্র থাকবে। খোঁচাখুঁচি করলে আফ্রিকার সব চেয়ে ভয়ংকর জানোয়ার হয়ে যায় ওরা।'

তর্ক শুরু করলো দুই মহিলা। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলো না, সিংহেরা বিপজ্জনক প্রাণী।

নানা রকম বই থেকে উদাহরণ দিয়ে, শিকারীদের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলে, অনেক লেকচার-টেকচার দিয়ে অবশেষে বোঝাতে পারলো কিশোর। অন্তত সিংহ যে পোষা বেড়াল নয়, এটুকু বোঝাতে সমর্থ হলো।

কিশোররা গেছে বেশিক্ষণ হয়নি, বড়জোর আধ ঘন্টা। কিন্তু ইতিমধ্যেই দু'জন লোককে মেরে ফেলেছে সিংহ।

ফিরে এসে কিশোর-মুসা দেখলো, বেলুনের দড়ির কাছে অপেক্ষা করছে কিমবা।

'কোথায় গিয়েছিলে?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো সে।

'মমবো গাঁয়ে। বড় একটা সিংহকে দেখে ভাবলাম ওটা মানুষখেকো। মারতে গিয়ে জানলাম, নিরীহ। গ্রামবাসীদের পোষা কুকুরের মতো।'

'গুলি করোনি তো?'

'না।'

'বেঁচেছো। নইলে এতোক্ষণে মারা পড়ে যেতে। কিলিয়ে তোমাদের হাড্ডি ভেঙে দিতো গাঁয়ের লোকে।'

'মানুষখেকোর কথা বলুন। কি করে মারলো?'

'ঘাসের ভেতর দিয়ে চুপি চুপি এগিয়ে এলো। কেউ তাকে আসতে দেখেনি। একটা লোককে ধরলো। পাশে কাজ করছিলো আরেকজন। শাবল দিয়ে বাড়ি মারলো সিংহটাকে। এক থাবায় তার ঘাড় মটকে দিয়েছে জানোয়ারটা। তারপর প্রথম লোকটাকে টেনে নিয়ে বনের ভেতর চলে গেছে।'

ওপর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো মুসা, 'রবিন, তুমি কিছু দেখনি?'

'নাহ্,' বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিলো রবিন। 'ঝুড়িটা বাতাসে ভীষণ দুলছিলো। আঁকড়ে ধরে রাখতেই হিমশিম খাচ্ছিলাম। বিনকিউলার আর চোখে লাগাতে পারিনি।'

কিমবাকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'আর কেউ দেখেছে সিংহটাকে? দেখতে কেমন?'

'অনেক বড়। কালো কেশরওয়ালা।'

'হুঁ! ওইটাই! ইস্, কেন যে মরতে গেলাম মহিলাদের পিছে পিছে! কিন্তু বুঝবো কিভাবে? মানুষের পিছু নিয়েছিলো, ভাবলাম মানুষখেকোটাই।'

'ঠিকই করেছো,' কিমবা বললো। 'আসলেই বোঝার উপায় নেই। ওটাও মানুষখেকো হতে পারতো। আসলে কপালই খারাপ লোকগুলোর, তোমরা কি করবে?'

আনমনে মাথা নাড়লো একবার স্টেশন মাস্টার। ফিরে চললো স্টেশনে।

দশ

মাথা নিচু করে হাঁটতে গিয়ে আরেকটু হলেই কালো লম্বা ছেলেটার গায়ে ধাক্কা

লাগিয়ে বসেছিলো কিমবা। মুখ তুলে চেয়ে দেখলো গুলা গাঁয়ের ওংগার ছেলে বংগা।

ছেলেটা কিন্তু তখনও তাকে দেখেনি। একশো ফুট ওপরের ঝুড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। দড়ির মই বেয়ে তখন সবে ওপরে উঠেছে কিশোর আর মুসা।

বংগার চোখে তীব্র ঘৃণা। দৃষ্টি দিয়ে যদি কাউকে খুন করা সম্ভব হতো এতোক্ষণে তিন গোয়েন্দাকে খতম করে দিতো সে। তার কাঁধে ধনুক, পিঠে তূণ ভর্তি তীর। তীরের ফলায় কালো দাগ দেখেই বোঝা যায় ওগুলোতে মারাত্মক বিষ মাখানো। ঝুড়িতে বসা ছেলেগুলো এখন তার জন্যে চমৎকার নিশানা।

বংগা খুন করতে চায়, একথাটা একবারও ভাবলো না কিমবা। তবে গণ্ডগোলের গন্ধ পেলো সে। এই এলাকায় কোনো পুলিশ নেই। এখানে সরকারী কর্মচারী বলতে শুধু সে আর ডিস্ট্রিক্ট অফিসার মাকুমা। ঝামেলা-টামেলাগুলো মিটমাট করার দায়িত্ব এই দু'জনেরই।

ব্যাপারটা কি? ভাবলো কিমবা। বংগার উদ্দেশ্য জানার জন্যে বললো, 'কেমন আছো, বংগা? মনে হচ্ছে ওই ছেলেগুলোকে তোমার পছন্দ হচ্ছে না?'

এতোক্ষণে কিমবাকে দেখতে পেলো বংগা। বিড়বিড় করে দায়সারা একটা জবাব দিয়ে সরে পড়তে চাইলো।

'এক মিনিট,' তার পথরোধ করলো বংগা। 'কিছু হয়েছে?'

তিক্ত কণ্ঠে বংগা বললো, 'আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনি জানেন না?'

'মানে?'

'আমার বাবা। আপনি জানেন তাকে খুন করা হয়েছে।'

'জানি। একটা সিংহ তাকে মেরে ফেলেছে।'

'না, মেরেছে ওই ছেলেগুলো,' হাত তুলে ঝুড়িটা দেখালো বংগা। 'বাবাকে খুন করেছে।'

'ওরা করলো কিভাবে?'

'সিংহটা ওদের তাঁবুতে ঢুকেছিলো। সহজেই গুলি করতে পারতো ওরা, মেরে ফেলতে পারতো। মারেনি, ছেড়ে দিয়েছে। সিংহটা তখন পাশের তাঁবুতে ঢুকে আমার বাবাকে মেরেছে। দোষটা ওদেরই। বাবার মৃত্যুর জন্যে ওরাই দায়ী।'

'তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে, বংগা। রিভলভার থাবা মেরে ফেলে দিয়েছিলো সিংহটা, ওরা কি করবে? ওদেরই তখন প্রাণ যায় যায়। তবু মারার যথেষ্ট চেষ্টা করেছে।'

'করেছে? হাহ্ হাহ্! কি দিয়ে! ময়দার গুঁড়ো! আহা, সিংহের সঙ্গে লড়াইয়ের

কি অস্ত্র! দেখুন, ওদের হয়ে যতো কথাই বলুন, লাভ হবে না। আমি বলবো, ওরাই আমার বাবাকে খুন করেছে। আর এর জন্যে পস্তাতে হবে ওদেরকে।'

ছেলেটার কাঁধে হাত রাখলো কিমবা। 'বংগা, শোন, তোমার যদি সে-রকম কিছু মনে হয়, আদালতে গিয়ে নালিশ করো। নিজের হাতে কিছু করতে যেও না।'

'আদালত! ফুহ্! আপনি ভালো করেই জানেন, আমাদের গোত্রের নিয়ম নয় সেটা। কেউ খুন হলে খুনের প্রতিশোধ তার ছেলেকে অবশ্যই নিতে হবে। কোনো আদালতে গিয়ে কাজ হবে না। আমাদের গোত্রের জন্যে সামান্যতম শ্রদ্ধা-ভক্তি যদি থাকে আপনার, দয়া করে এতে নাক গলাতে আসবেন না।'

'শ্রদ্ধা-ভক্তি অবশ্যই আছে,' জোর দিয়ে বললো কিমবা। 'কিন্তু আমার কথাও শুনে রাখো। এমন কিছু করতে যেও না, যাতে হাতকড়া পরে গিয়ে নাইরোবি জেলে পচতে হয়। ভেবে দেখো কথাটা। আর ওই ছেলেগুলোর ওপর থেকে রাগটা একটু কমানোর চেষ্টা করো।'

'কেন করবো?'

'বলছি, কেন করবে। একবারও কি ভেবে দেখেছো, কিশোর পাশা না থাকলে তোমার বাবার লাশও পেতে না? রাতের বেলায়ই শেয়াল-হায়েনায় খেয়ে ফেলতো। হাড্ডিগুলোও পেতে না। ওর জন্যেই বাবার লাশ নিয়ে গিয়ে ঠিকমতো কবর দিতে পারলে। তুমি শিক্ষিত ছেলে। নতুন দুনিয়ার আইন-কানুন সম্পর্কে তুমি অজ্ঞ নও। পুরনো কুসংস্কার আঁকড়ে ধরে রেখে প্রতিশোধের জন্যে খুন করে বসাটা কোনো কাজের কথা নয়, নেহায়েত বোকামি। যাও, ভেবে দেখো আমার কথাগুলো।'

বিড়বিড় করে কি বললো বংগা, বোঝা গেল না। তবে রাগ যে কমেনি তার, আচরণেই বুঝিয়ে দিলো। এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে গটমট করে রওনা হয়ে গেল গুলা গাঁয়ের দিকে।

এলোমেলো প্রচণ্ড বাতাস এসে টান মেরে কাত করে ফেললো ঝুড়িটা। দড়িতে বাঁধা আকাশ-বিহার বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হয়ে গেল, আরেকটু হলেই নিচের মুখ দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে যাবে। ভীষণ দুলতে আরম্ভ করলো ঝুড়ি। বসে থাকাই দায় হয়ে উঠলো তিন গোয়েন্দার জন্যে। নামাও প্রায় অসম্ভব এখন। এমন ভাবে দুলছে দড়ির সিঁড়ি, পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা।

ওপরের দিকে তাকিয়ে মুসা দেখলো, কালো মেঘ ধেয়ে আসছে যেন বেলুনটাকেই গ্রাস করার জন্যে। 'খাইছে! বসে থাকলে তো মরবো!'

'নামতে গেলেও মরবো!' কিশোর বললো। 'দেখ, কাণ্ডটা দেখ!' নিচের দিকে আঙুল তুললো সে।

আবহাওয়ার এই হঠাৎ পরিবর্তনে সমস্ত জন্তুজানোয়ারই ঘাবড়ে গেছে। ঝড় আসছে নাকি? মাঠের ওপর তীরবেগে ছুটে চলেছে একপাল জেব্রা। ইমপালা হরিণগুলোর যেন পাখা গজিয়েছে। একেক লাফে দশ ফুট ওপরে উঠে পড়ছে। জেব্রাগুলো যেদিকে যাচ্ছে সেইদিকেই ছুটেছে হরিণগুলোও। বন থেকে বেরিয়ে এসেছে বেবুনের দল, উত্তেজিত চিৎকারে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। প্রখর রোদের উষ্ণতায় আরামে ঘুমিয়েছিলো যেসব সিংহ, আচমকা শীতল বাতাস লাগাতে ধড়মড়িয়ে উঠে অস্থির পায়চারি করছে এখন ইতিউতি। একহাতে ঝুড়ির কিনার খামচে ধরে রেখে আরেক হাতে বিনকিউলার চোখে লাগালো কিশোর, পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে। মানুষখেকোটা আছে কিনা দেখার জন্যে।

'হাতি! হাতি!' বলে চিৎকার করে উঠলো রবিন।

চল্লিশ-পঞ্চাশটা হাতির একটা পাল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে যাচ্ছে গুলা গাঁয়ের দিকে। প্রচণ্ড ঝড়ের মতো গিয়ে পড়লো গাঁয়ের ওপর। ওদের চলার পথে পড়েছে কুঁড়েগুলো, পাশ কাটিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না। ওগুলো ভেঙেচুরে গুঁড়িয়ে দিতে লাগলো। চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে আসছে ছেলেমেয়ে, নারীপুরুষ।

'এসো!' বলে আর দেরি করলো না কিশোর। বেলুনের নোঙরের দড়ি ধরে ঝুলে পড়লো। শাঁ করে নামলো মাটিতে।

কি করে নামতে হয় রবিনকে দেখিয়ে দিলো মুসা। দড়ি আঁকড়ে ধরে চোখ বন্ধ করে ফেললো রবিন। মাটিতে পা ঠেকার আগে আর খুললো না।

মুসাও নামলো। তিনজনে দৌড় দিলো স্টেশনের দিকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে কিমবাকে জানালো কিশোর, 'হাতি! হাতি! গুলা গাঁয়ের ওপর চড়াও হয়েছে। লোক দরকার! জলদি! টিনফিন এসব নিয়ে আসতে বলুন!'

একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে গুলার দিকে দৌড় দিলো তিন গোয়েন্দা। কিমবাও দেরি করলো না। বাইরে বেরিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দিলো। মিনিটখানেকের মধ্যেই দলে দলে রেলশ্রমিক ছুটলো গাঁয়ের দিকে। সবার হাতেই টিনের বাসন কিংবা টিনের অন্য কোনো পাত্র।

গাঁয়ের লোকে দিশেহারা হয়ে ছুটছে এদিক ওদিক। বাগানে চড়াও হয়েছে হাতির পাল। ধ্বংস করে দিচ্ছে সব কিছু। হাতির পায়ের তলায় পড়ে না মরলেও বাগান নষ্ট হয়ে গেলে না খেয়ে মরতে হবে গ্রামবাসীকে।

কখন যে শ্রমিকদের নেতা হয়ে বসলো কিশোর, সে নিজেও বলতে পারবে না। ওদেরকে একসারিতে দাঁড় করালো। পাথর কিংবা কাঠি কিংবা ডাল দিয়ে টিনের পাত্র বাজাতে বাজাতে একসঙ্গে এগোতে বললো। টিন পেটানোর শব্দ হাতির ভীষণ অপছন্দ।

বিকট বিচ্ছিরি শব্দ, এমনকি হাতিদের সম্মিলিত নিনাদকেও ছাড়িয়ে গেল।

শ্রমিকদের সাথে এসে যোগ দিলো গাঁয়ের লোকেরা। টিন আর ঢাক বাজাচ্ছে, সেই সাথে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে সবাই।

হাতিদের নিয়ে ব্যস্ত গাঁয়ের লোক, ঠিক এই সময় সুযোগ বুঝে এসে হানা দিলো কালো কেশর। গাঁয়ের একপ্রান্তে কুঁড়েতে বসে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে এক বৃদ্ধা, শীতে ঠাণ্ডা হওয়া হাত-পা সেঁকার জন্যে। তার স্বামী গেছে হাতি তাড়াতে। তাড়াহুড়োয় দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে যেতে ভুলে গেছে। বৃদ্ধাও খেয়াল করছে না।

নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকে পড়লো কালো কেশর। দরজা খুলে যেতেই মুখ তুলে তাকালো বৃদ্ধা। সিংহ দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো। একটানে একটা জ্বলন্ত চেলাকাঠ তুলে নিয়ে ঠেসে ধরলো সিংহের মুখে। এরকম অভদ্র আচরণে অভ্যস্ত নয় কালো কেশর। নাকে মুখে গরম ছ্যাঁকা লাগতেই ব্যথায় গর্জন করে উঠলো। আবার চেলাকাঠ দিয়ে বাড়ি মারলো বৃদ্ধা।

এসব জ্বালাতন একটুও ভালো লাগলো না কালো কেশরের। চুলোয় যাক বুড়ি, অন্য কাউকে ধরবো, ভেবেই যেন আবার বেরিয়ে গেল সে।

উঁকি দিয়ে সিংহটাকে চলে যেতে দেখলো বৃদ্ধা। আর একটা মুহূর্ত দেরি না করে জ্বলন্ত চেলাকাঠ হাতে বেরিয়ে এলো বাইরে। 'সিংহ! সিংহ!' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড় দিলো পুরুষেরা যেখানে হাতি তাড়াচ্ছে।

প্রচণ্ড হট্টগোলে বিরক্ত হয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেল হাতিরা। তখন বৃদ্ধার কথা শোনার অবকাশ হলো সকলের। সিংহ মেরে দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানানো হলো তিন গোয়েন্দাকে।

জন ককও এসে হাজির হয়েছে গাঁয়ে। মোড়লকে বললো, 'ওরা কোনোদিনই ওই সিংহ মারতে পারবে না। রাইফেলই ধরতে পারে না ঠিকমতো।'

'তাহলে আপনিই মেরে দিন না!' ককনে অনুরোধ করলো মোড়ল। 'পারবেন?'

'নিশ্চয়ই পারবো। কিন্তু…'

'কোনো কিন্তু নেই!' ককের হাত জড়িয়ে ধরলো মোড়ল। 'মেরে দিন! দয়া করে বাঁচান আমাদেরকে! ওই ছেলেগুলোর ওপর ভরসা নেই!'

কক ভাবলো, এইই সুযোগ। যদি সিংহটাকে মারতে পারি, আমার ওপর আবার আস্থা বাড়বে কিমবার, ভবিষ্যতে সিংহ মারার সমস্ত কাজগুলো আমি পাবো। কোমর থেকে রিভলভার খুলে কালো কেশরকে খুঁজতে বেরোলো সে। তার ধারণা, মানুষ যখন নিয়ে যেতে পারেনি, বেশি দূরে যায়নি সিংহটা, কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে দ্বিতীয় সুযোগের অপেক্ষায়।

তিন গোয়েন্দা তখন বৃদ্ধার ঘরের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে। সিংহটা কোন দিকে গেছে বোঝার চেষ্টা করছে।

হঠাৎ কিশোরের বাহুতে হাত রাখলো রবিন। ফিসফিস করে বললো, 'নড়ো

না! কালো কেশর! ডানের ঝোপের মধ্যে!'

কিশোর আর মুসাও দেখলো সিংহটাকে। বিশাল মুখটা বের করে বসে রয়েছে কুকুরের মতো পেছনের পা গুটিয়ে। সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রাইফেল তুলতে গেলে হয় ঝাঁপিয়ে এসে পড়বে, নয়তো সরে যাবে। কাজেই কুঁড়ের আড়ালে চলে এলো তিন গোয়েন্দা। একসাথে গুলি করার জন্যে রাইফেল তুললো কিশোর আর মুসা।

ওই সময় ককও দেখতে পেলো ওটাকে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করলো। কিন্তু দূর থেকে রিভলভার দিয়ে গুলি চালাতে গিয়ে মিস করলো। লাফ দিয়ে উঠলো সিংহটা। নিশানা করার আর সময় নেই। গুলি করলো কিশোর আর মুসা। মিস করলো ওরাও। কারণ কিসে লাগাবে গুলি? ততোক্ষণে বিরাট এক উইয়ের ঢিবি টপকে পেরিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে কালো কেশর। দেখতে দেখতে হারিয়ে গেল বনের ভেতরে।

'ওই হারামজাদা ককটার জন্যে!' রাগে চিৎকার করে উঠলো মুসা। 'নইলে এতোক্ষণে মরে যেতো কালো কেশর!'

কককে একটা কড়া কথা বলার জন্যে মাথা ঘোরালো সে। কিন্তু কোথায় কক? গুলি মিস করার পর পরই গায়েব হয়ে গেছে। বড় বড় কথা বলেছে মোড়লকে, থাকবে কে, মুখ দেখাবে কি করে?

শ্রমিকেরা চলে যেতে শুরু করলো।

চেঁচামেচি করে কি সব বলতে লাগলো গাঁয়ের লোকে।

মোড়লকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, ওরা কি বলছে? মোড়ল জানালো, 'ওরা বলছে, সিংহটাকে কখনোই মারতে পারবে না। আসল সিংহ হলে তো মারবে। ওটা হলো গিয়ে দুষ্ট প্রেতাত্মা।'

'আপনি কি বলেন?'

'আগে বিশ্বাস করিনি, এখন করছি। শাদা মানুষের বন্দুকও যার কোনো ক্ষতি করতে পারে না, সে প্রেত না হয়ে যায়ই না।'

নাহ, অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে অনেক দেরি হবে ওদের, ভাবলো কিশোর। এতো কুসংস্কার দূর করতে হলে একটাই উপায়, শিক্ষা।

এগারো

ফেরার পথে সেই ছোট বনটা পেরোনোর সময় খুব সতর্ক থাকলো তিন গোয়েন্দা। বলা যায় না, কালো কেশর লুকিয়ে থাকতে পারে এখানে।

বড় বড় গাছাপালার নিচে আবছা অন্ধকার দিয়ে যাওয়ার সময় খসখস শব্দ কানে এলো ওদের। শুকনো পাতায় ঘষা লেগেছে কারও শরীর। ঝট করে মুখ ঘোরাতেই চোখে পড়লো বংগাকে।

সাথে এখন তীর-ধনুক নেই। কিশোর ভাবলো, মন বদলেছে বংগার, ওদের সঙ্গে খাতির করতে এসেছে। ভুল ভেবেছে সে। কোমরের খাপ থেকে একটানে লম্বা ছুরিটা বের করলো বংগা। 'এইবার পেয়েছি বাগে। এখানে কেউ আমাকে বিরক্ত করবে না, বাধা দিতে আসবে না। এইবার দেখাবো মজা।'

'বংগা,' কিশোর বললো, 'সব কিছু ভুলে গিয়ে বন্ধু হয়ে যেতে পারি না আমরা? বিশ্বাস করো, তোমার বাবার জন্যে সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। আমাদের কোনো দোষ ছিলো না।'

'তোমরা খুন করেছো ওকে!' চেঁচিয়ে উঠলো বংগা। 'আর আজকেই বা কি করলে? তোমাদের সিংহটাকে দিয়ে গাঁয়ের আরেকজনকে খুন করাতে চেয়েছিলে।'

'আমাদের সিংহ?' গরম হয়ে বললো মুসা। 'এমন ভাবে বলছো যেন আমরাই ওকে পাঠিয়েছি!'

'তাই তো করেছো। নইলে এতো কাছে পেয়েও সিংহটাকে মারলে না কেন?'

গরম আরেকটা জবাব দিতে যাচ্ছিলো মুসা, তাকে থামালো কিশোর। 'তর্ক করে লাভ নেই, বংগা। একটা কথা ঠিকই বলেছো, এতো কাছে পেয়েও সিংহটাকে মারতে পারলাম না কেন? কেন বার বার আমাদের হাত ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে, বেঁচে যাচ্ছে? এর কারণ, ওটার ভাগ্য ভালো। মরার সময় হয়নি এখনও। এছাড়া আর কি বলবো? নইলে এতো চেষ্টা করেও মারতে পারছি না কেন? সুযোগ পাচ্ছি, অথচ শেষ মুহূর্তে একটা না একটা গোলমাল ঘটেই যাচ্ছে।' বংগার চোখে চোখে তাকালো সে। 'সিংহের কথা থাক। এখন একটা কথা বলো, বংগা, আজকে হাতির কবল থেকে তোমাদের বাগান রক্ষা করেছি কিনা?'

'তা করেছো, কয়েকটা গাজর আর বাঁধাকপি,' মুখ বাঁকিয়ে বললো বংগা। 'ওসব দিয়ে খুনের ঋণ শোধ হয় না। অনেক হয়েছে, তৈরি হও। এখন মারবো আমি তোমাদেরকে।'

'তুমি বোকা, বংগা। দেখছো আমাদের হাতে রাইফেল আছে?'

'থাকলে কি হয়? আমি জানি, বিদেশীরা ভীতু। বন্দুক ছাড়া কিছু করতে পারে না। আর তোমরা বন্দুক নিয়েও পারবে না আমার সঙ্গে,' হাতের ছুরিটা নাড়লো বংগা। স্বল্প আলোতেও চকচক করে উঠলো ফলাটা।

হাল ছেড়ে দিলো কিশোর। এই বোকাটাকে বোঝায় কি করে? সমাধান করে দিলো মুসা। হাত থেকে রাইফেল ফেলে দিলো। কোমর থেকে খুলে রাখলো রিভলভার। বললো, 'ভীতু বলছো তো? বেশ, দিলাম ফেলে। তোমার হাতে ছুরি আছে, আমার হাতে তা-ও নেই। এসো, দেখি, কে হারে কে জেতে।'

মুসার কোমরে ছুরির খাপটার দিকে তাকালো বংগা। একটানে ওটাও খুলে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেললো মুসা। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিলো লড়াই করার

জন্যে। বংগা কিন্তু ছুরি ফেললো না। সামনে লাফ দিয়ে পড়ে শাঁ করে চালালো একপাশ থেকে আরেক পাশে। লাগলে এক খোঁচায়ই ভুঁড়ি বেরিয়ে যেতো মুসার। সময় মতো পেছনে সরে আসতে পেরেছে বলে লাগেনি।

ছুরিটা আরেকবার চালানোর সুযোগ পেলো না বংগা, তার আগেই কব্জি চেপে ধরলো মুসা। বাঁ হাতে। ডান হাতটা যেন সাপের মতো ছোবল মারলো দু'বার, একবার লাগলো বংগার চোয়ালে, আরেকবার সোলার প্লেক্সাসে। তারপর যথেষ্ট হয়েছে ভেবে ছেড়ে দিলো কব্জি।

সাধারণ কেউ হলে ওই আঘাতেই চিৎ হয়ে যেতো। বংগা সাধারণ নয়। সামলে নিয়ে আবার ছুরি চালালো মুসার গলা ফাঁক করে দেয়ার জন্যে। কিন্তু মুসা তখন নেই সেখানে। সরে গেছে। পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে আরেকবার চেপে ধরলো বংগার ছুরিধরা হাতটা। বিশেষ জায়গায় চাপ দিয়ে জোরে এক মোচড় দিতেই ঢিল হয়ে গেল আঙুল, খসে পড়লো ছুরিটা।

কিন্তু ছুরি হারিয়ে একটুও হতাশ হলো না বংগা। ঘুসি মারলো মুসার মুখে। এটা এড়াতে পারলো না মুসা। তার মনে হলো হাতুড়ির বাড়ি পড়েছে। গায়ের জোরে এই নিগ্রোর সঙ্গে পারবে না সে, বুঝে গেল। কৌশল। একমাত্র কারাত আর জুজুৎসুর কৌশলই এখন জিতিয়ে দিতে পারে তাকে।

সেটাই প্রয়োগ করলো মুসা। গলায় আর পেটে দ্রুত কয়েকটা আঘাত তাজ্জব করে দিলো বংগাকে। কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল বুঝতেই পারলো না। সংবিৎ যখন ফিরলো, টের পেলো হাঁ করে শ্বাস নিতে হচ্ছে তাকে। সামলে নিয়েই আবার ঘুসি পাকিয়ে ছুটে এলো।

ঘাড়ের পাশে হাতের একপাশ দিয়ে কোপ মারলো মুসা। কাটা কলাগাছের মতো টলে উঠলো বংগা, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। হুঁশ ফিরতে মিনিট পনেরো লাগবে এখন।

হুঁশ ফিরলে দেখলো, মাটিতে পড়ে রয়েছে সে। লিয়ানা লতা দিয়ে হাত-পা বাঁধা। তিন গোয়েন্দা বসে আছে তাকে ঘিরে।

'দেরি করছো কেন?' মুখের ভেতর মাটি ঢুকেছে, থুহ্ করে সেটা ফেললো বংগা। 'কাজ শেষ করে ফেলো।'

'কিসের কথা বলছো?' মুসা জিজ্ঞেস করলো।

'মেরে ফেলো আমাকে। হেরেই তো গেছি।'

'তোমাকে মারার কোনো ইচ্ছেই নেই আমাদের।'

'আমার এখনও আছে। সুযোগ দিলেই খুন করবো।'

'ভাবো, বংগা, ভালো করে ভেবে দেখো,' কিশোর বললো। 'চাইলে তোমাকে সহজেই মেরে ফেলতে পারতাম। মারিনি। কারণ, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'বলার আর কিছু নেই এখন। শুধু খুন করা ছাড়া।'

'নিরাশ করতে হচ্ছে তোমাকে, বংগা, খুনটুন কিছু হবে না। তোমার সত্যি সত্যি কি হয়েছে আমাকে না বলা পর্যন্ত এখান থেকে যাচ্ছি না। বসেই থাকবো। কি হয়েছে, বল তো? ওই পুরনো কুসংস্কারটা ব্যাপার নয়। ওসব ধরে নিয়ে মানুষ খুন করতে আসার মতো বোকা তুমি নও। ইংরেজি ইস্কুলে পড়ো। যথেষ্ট বুদ্ধিমান তুমি। আসল ব্যাপারটা কি, বলে ফেলো তো? তোমার রাগটা কোথায়?'

'কোথায় আবার? সিংহ মারতে পারোনি, ওটা আমার বাবাকে মেরেছে। খুনের প্রতিশোধ নেবো।'

'অসম্ভব। আমাদের ওপর রেগে যাওয়ার অন্য কারণ আছে। বেশ, তুমি না বলা পর্যন্ত আমরাও উঠছি না।'

'থাকো বসে। আমার কি?'

কিন্তু আধ ঘন্টা যেতে না যেতেই অস্থির হয়ে উঠলো বংগা। 'কতোক্ষণ বসে থাকবে?'

'যতোক্ষণ না বলবে।'

'বলি না বলি, তোমার কি?'

'হয়তো তোমাকে সাহায্য করতে পারবো।'

'তোমরা মিশনারি? ওরকম কিছু?'

'না, আমরা অতি সাধারণ মানুষ। ব্যবসার খাতিরে আফ্রিকায় এসেছি। তোমার জেদ খুব বেশি, বংগা, তবে তুমি মানুষ হিসেবে ভালো। এতো কিছু করছো, তা-ও তোমাকে অপছন্দ করতে পারছি না। বলে ফেলো, প্লীজ, আমাদেরকে খুন করতে যাওয়ার আসল কারণটা কি? গলা কেটে ফেললেও আমি বিশ্বাস করবো না তোমার বাবার প্রেতাত্মা কষ্ট পাচ্ছে ভেবে আমাদেরকে খুন করতে চাইছো।'

পুরো একটা মিনিট চুপ করে রইলো বংগা। তারপর হাসলো। 'তুমি মাইণ্ড রীডার।'

'তাই মনে হচ্ছে?'

'ঠিকই ধরেছো, কুসংস্কারে বিশ্বাস করে তোমাদেরকে খুন করতে চাইনি। দাঁড়াও, সব খুলে বলি, তাহলেই বুঝবে। বাঁধন খোলো। কষ্ট লাগছে।'

বাঁধন খুলতে হাত বাড়ালো কিশোর। চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, 'খুলো না, খুলো না! ফাঁকি দিয়ে খোলাতে চাইছে।'

'মনে হয় না।' খুলে দিলো কিশোর।

উঠে বসে ডলে ডলে হাত-পায়ের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে লাগলো বংগা। কাছেই পড়ে রয়েছে তার ছুরিটা, হাত বাড়ালেই ধরতে পারে। কিন্তু তোলার চেষ্টা করলো না। উঠে গিয়ে বসলো একটা পড়ে থাকা কাণ্ডের ওপর।

'তোমাদের ব্যাপার-স্যাপারই বুঝতে পারছি না,' বললো সে। 'আমাকে মেরে ফেলার এমন সুযোগটা পেয়েও ছেড়ে দিলে। অথচ শাস্তিটা আমার পাওনা ছিলো। সব সময়ই খিটখিটে মেজাজ আমার, একধরনের মানসিক রোগী, মিশনারি ডাক্তার বলেছে। লোকের ওপর খালি মেজাজ দেখাতাম। দুনিয়ার কাউকেই দেখতে পারতাম না আমি।'

'শুনেছি,' রবিন বললো, 'বেশি দিন একা থাকলে এরকম হয়।'

'ডাক্তারও তাই বলেছে। ডাক্তারের পরামর্শে আমাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলো বাবা। রোগটাও সারলো আমার, দুনিয়া কি জিনিস জানলাম। তখন থেকেই মনে হতে লাগলো, আমার বেচারা গ্রামটার জন্যে ভালো কিছু করি।'

'কি করতে চাও?' জানতে চাইলো কিশোর।

'আমি টীচার হতে চাই। আমার গাঁয়ের সবচে বেশি দরকার এখন একটা ইস্কুলের। রাজা মাকুমার কাছে গিয়েছিলাম। টিটকারি দিয়ে বিদেয় করলো আমাকে। নাইরোবির এডুকেশন বোর্ডে গিয়েছিলাম। ওরা সাফ বলে দিলো, পঞ্চাশ মাইল দূরের হ্যালোতে ইস্কুল আছে, সেখানে গিয়ে পড়তে। বললাম, এতো দূরে গিয়ে কি করে পড়বো? ওরা বললো, বেশি টীচার রাখার পয়সা নেই ফাণ্ডে। বললাম, আমি পড়াবো, আমাকে পয়সা দিতে হবে না। বললো, ইস্কুল বানানোর পয়সাও নেই ওদের ফাণ্ডে। বললাম, কিছুই লাগবে না। ঘর আমরা বানিয়ে নেবো। আমাদের গাঁয়ের লোকেই বানিয়ে দেবে। ওরা তখন বললো, ইস্কুল চালাতে আরও অনেক কিছু লাগেঃ বই, খাতা, পেন্সিল, ব্ল্যাকবোর্ড, আরও অনেক কিছু। ওসবের খরচ দিতে পারবে না। ইস্কুলের স্বপ্ন আমাকে ভুলে যাওয়ার পরামর্শ দিলো। খুব রাগ হলো। ঠিক করলাম, যা করার একাই করবো। বাবা রেলওয়েতে কাজ করে পয়সা ভালোই পেতো। তাকে বলতে তার মাইনে থেকে কিছু টাকা আমার ইস্কুলের জন্যে দিয়ে দিতে রাজি হলো। কিন্তু আমি কাজ শুরু করার আগেই বাবা মারা গেল। মনে হলো, সব তোমাদের দোষ। সিংহটাকে মারতে পারোনি বলেই ওটা বাবাকে মারলো। মনে হলো, আমার সমস্ত স্বপ্ন ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার জন্যে তোমরাই দায়ী। এখন আমার পরিবারের খাওয়ারই সঙ্গতি নেই, ইস্কুল করবো কি দিয়ে? রেলওয়েতে কাজ জোগাড়ের জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম। ওরা বলে দিয়েছে, এমনিতেই বেশি হয়ে গেছে, আর লোকের দরকার নেই।'

'শ্রমিক দরকার নেই হয়তো,' কিশোর বললো। 'কিন্তু তোমার যা শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাতে অন্য কোনো কাজ পাওয়া উচিত।'

'কে দেবে আমাকে কাজ? ইস্কুলে পড়েই বা কি লাভটা হলো? ওই লেখাপড়া তো কোনো কাজেই লাগাতে পারলাম না।'

'নাইরোবিতে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারো,' পরামর্শ দিলো রবিন।

'তা নাহয় গেলাম, পরিবারের ভরণ-পোষণের একটা ব্যবস্থা হবে। কিন্তু আমার ইস্কুল? আমার গাঁয়ের লোক? এই ভাবনাই স্থির থাকতে দিচ্ছে না আমাকে। সারাক্ষণ খচখচ করছে মাথার মধ্যে। নাইরোবি আমাকে চায় না, ওখানে আমার দরকার নেই। গুলার আছে। কিন্তু কিছুই করতে পারছি না ওদের জন্যে। হাত-পা বাঁধা।'

'খুলে তো দিয়েছি, তাই না? বাকিটাও দেয়ার চেষ্টা করবো,' হেসে বললো কিশোর। 'তিরিশজন লোক আছে আমার, হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে ওরা। খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে, কিছুই করার নেই। কাজ পেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। ওদেরকে লাগিয়ে দেবো তোমার ইস্কুল বানানোর জন্যে। জন্তুজানোয়ার ধরে দেয়ার জন্যে একটা কমিশন পাবো আমরা, তিনজনেই সব টাকা দান করে দেবো তোমার ইস্কুলের ফাণ্ডে। কি বলো তোমরা?' সহকারীদের দিকে তাকালো সে। মাথা ঝাঁকালো দু'জনেই। 'টাকা আরও পাবে। এই এলাকায় যতো জন্তুজানোয়ার ধরবো, সেগুলো বিক্রি করে যতো টাকা পাবো, সব দেয়া হবে ইস্কুলের জন্যে। আমার চাচা আর মুসার আব্বাকে সহজেই রাজি করাতে পারবো। শুধু তাই না। আমার মেরিচাচী, মুসার আম্মা, রবিনের আম্মা, সবাই দান করবেন। মেরিচাচী শুনলে তো বাড়ি বাড়ি গিয়ে রীতিমতো চাঁদা তুলতে আরম্ভ করবেন। ইস্কুল চালানোর খরচের কোনো অসুবিধে হবে না তোমার, বংগা, আমরা কথা দিচ্ছি।' তিন গোয়েন্দার তরফ থেকে বললো সে।

হাঁ হয়ে গেছে বংগার মুখ। চোখ গোল গোল। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত এমন ভঙ্গিতে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইলো, যেন জীবনে তাকে এই প্রথম দেখছে। বিড়বিড় করে কিছু বললো তার মাতৃভাষায়, বুঝতে পারলো না তিন গোয়েন্দা।

'কবে থেকে শুরু করতে চাও?' জিজ্ঞেস করলো কিশোর।

'পারলে কাল থেকেই। কাল সকাল?'

'প্ল্যান করতে হবে না?'

'করে রেখেছি। বহু বছর ধরেই করছি।'

'বেশ। স্টেশনে ফিরেই আমি সাফারি ক্যাম্পে ফোন করে দেবো। কাল সকাল নাগাদ হাজির হয়ে যাবে আমার লোকেরা। ওদেরকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নাইরোবি চলে যাবে তুমি, ডেস্ক, বেঞ্চ, ব্ল্যাকবোর্ড আর যা যা লাগে অর্ডার দেয়ার জন্যে। বিল পাঠিয়ে দিও আমার কাছে।'

বংগা বিশ্বাস করতে পারছে না, এই ছেলেগুলো সত্যিই তার জন্যে এতো কিছু করছে! হঠাৎ পাতার ফাঁক দিয়ে রোদের ফালি এসে পড়লো গায়ে। তারমানে মেঘ কেটে গেছে, পরিষ্কার হয়েছে আকাশ। তার চোখের কোণে পানি চিকচিক করছে, ঠোঁটের কোণে হাসি। দেখতে দেখতে হাসিটা ছড়িয়ে গেল একান-ওকান, বেরিয়ে পড়লো ঝকঝকে শাদা দাঁত।

এই প্রথম বিষণ্নতা কাটলো বংগার, তাকে হাসতে দেখলো তিন গোয়েন্দা। প্রথমে হাসিটা সংক্রমিত হলো মুসার মাঝে, তারপর অন্য দু'জন।

হা হা করে হাসতে লাগলো চারজনেই। হাত মেলালো।

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালো বংগা। বললো, 'যাই, গাঁয়ের লোককে সুখবরটা দিইগে।'

'দাঁড়াও,' ডাকলো কিশোর।

ঘুরে দাঁড়ালো বংগা। 'কী?'

'এটা ফেলে যাচ্ছো।' মাটি থেকে ছুরিটা তুলে দিলো কিশোর।

'থ্যাংক ইউ।' হেসে ছুরিটা কোমরে গুঁজলো বংগা। তারপর দৌড় দিলো গাঁয়ের দিকে।

বারো

টেলিফোন শেষ করে তাঁবুতে ফিরে এলো তিন গোয়েন্দা। তাড়াতাড়ি সিংহের বাচ্চাটাকে খাইয়ে নিজেরাও নাকেমুখে কিছু গুঁজে নিলো। তারপর আবার রওনা হলো বেলুনের দিকে।

'ওই যে, রাজা সাহেব,' রবিন বললো।

রেললাইন আর শ্রমিকদের কাজ পরিদর্শনে এসেছে ডিস্ট্রিক্ট অফিসার।

'চলো, কথা বলবো,' কিশোর বললো।

কিন্তু ওদেরকে এগোতে দেখেই সরে চলে গেল মাকুমা।

'নাহ্, বলতে চায় না। জিজ্ঞেস করতাম, বিদেশীদের ওপর এতো রাগ কেন তার।'

জিজ্ঞেস করা আর হলো না। বেলুনের কাছে এসে দাঁড়ালো তিন গোয়েন্দা। জোর বাতাস বইছে এখনও। একখানে স্থির থাকতে পারছে না আকাশ-বিহার। গ্যাজেল হরিণের মতো নাচানাচি করছে ঝুড়িটা। বেলুনে চড়ার জন্যে দিনটা মোটেই সুবিধের নয়, তবু এছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই। সাপের লেজের মতো মোচড় খাচ্ছে সিঁড়িটা। নিচে থেকে টেনে ধরলো মুসা। উঠতে শুরু করলো কিশোর। তার পর উঠলো রবিন। সব শেষে ওই মোচড় খাওয়া সিঁড়ি বেয়েই মস্ত ঝুঁকি নিয়ে ওপরে উঠে এলো মুসা।

ঝুড়িতে বসে তিনজনেই জিরিয়ে নিলো কিছুক্ষণ। ঠিক জিরানো বলা যায় না এটাকে। ঝুড়ির ধার খামচে ধরে বার বার ঝাঁকি খাওয়াটা মোটেই আরামদায়ক নয়। এখানে এসে অযথা বসে থাকারও কোনো মানে হয় না। শেষে একহাতে ঝুড়ি ধরে আরেক হাতে বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে যতোটা দেখা সম্ভব দেখতে লাগলো ওরা।

স্পষ্ট করে বোঝার উপায় নেই কিছুই। একে তো বিনকিউলার স্থির রাখতে

পারছে না চোখে, তার ওপর নিচের ঘাস এমন ভাবে নড়ছে বাতাসে, তার ভেতরে সিংহ নড়লেও এখন বোঝা যাবে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথা ঘুলিয়ে উঠলো ওদের। পেট ব্যথা হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। ঝুড়ি এতো নাচানাচি করলে কি আর বসা যায়!

তবু হাল ছাড়লো না ওরা। বসে রইলো অন্ধকার নামাতক। শেষে যখন শেষ শ্রমিকটাও লাইন ছেড়ে ক্যাম্পে ফিরে গেল, নামার জন্যে তৈরি হলো ওরা।

সিঁড়ি বেয়ে নামার চেয়ে দড়ি বেয়ে নামা এখন অনেক সহজ আর নিরাপদ। ঝুড়ির কিনার দিয়ে এক পা তুলে দিয়ে দড়িটা ধরলো কিশোর। কিন্তু এ-কি! এরকম ঢিল লাগছে কেন? দড়িটা টান টান হয়ে থাকার কথা? টান দিতেই উঠে আসতে শুরু করলো ওটা।

হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেল যেন কিশোরের মাথায়। বুঝে ফেললো ব্যাপারটা। বাতাস আর এখন ওদের দিকে ছুটে আসছে না, ঝাপটা দিচ্ছে না, বরং বাতাসের গতিপথেই চলেছে ওরা, বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে।

নিচে তাকাতে চোখে পড়লো মাটি যেন দৌড়াচ্ছে। কোনো ভাবে খুলে গেছে নোঙরের দড়ি। নাকি কেটে দেয়া হয়েছে? খানিক আগে যেখানে বাঁধা ছিলো দড়িটা, সেখানে তাকাতে দেখতে পেলো কালো একটা ছায়া সরে যাচ্ছে। হেঁটে চলেছে একজন মানুষ। তবে আলো এতো কম, লোকটাকে চেনার জো নেই।

পা-টা ঝুড়ির ভেতরে নামিয়ে আনলো আবার কিশোর। শান্তকণ্ঠে বোমা ফাটালো, 'ভেসে চলেছি আমরা।'

ঝট করে নিচে তাকালো রবিন আর মুসা। নিচে স্টেশনের ছাতটা সরে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে উঠলো মুসা, 'জলদি, জলদি নামো! এখনও সময় আছে! বেশি ওপরে উঠে গেলে আর পারা যাবে না!'

'পারা এখনও যাবে না,' কিশোর বললো। 'সিঁড়ি বেয়ে নামলাম, ততোক্ষণে যদি উঠে যায়? এই অবস্থায় সিঁড়ি বেয়ে আবার ওপরে ওঠা!' হাত নাড়লো সে। 'আমি পারবো না!'

'কিন্তু কিছু একটা তো করা দরকার!' কেঁপে উঠলো রবিনের গলা। 'ভালভ লাইন টানবো? নিচে নামা যাবে তাহলে।'

'তা যাবে,' স্বীকার করলো কিশোর, 'তবে লাভ হবে না আমাদের। দেখছো না কোনদিকে যাচ্ছে বেলুন? বনের দিকে। গাছের মাথায় বাড়ি খেয়ে মরবো। বেলুনটাও ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হবে।'

ব্র্যাকেট থেকে টর্চ খুলে নিয়ে নিচের দিকে করে জ্বাললো সে। মাটিতে পৌঁছলো না আলো। নিভিয়ে আবার আগের জায়গায় রেখে দিলো ওটা। শাদা রঙ করা স্টেশনের ছাত, ফলে অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে। এছাড়া বাকি সব কিছু ঢেকে দিয়েছে ঘনায়মান অন্ধকার।

'নড়ছি বলেই তো মনে হচ্ছে না,' রবিন বললো।

নোঙর করা অবস্থায় কানের পাশ দিয়ে শাঁই শাঁই করে বয়ে যাচ্ছিলো বাতাস। চেঁচিয়ে কথা না বললে শোনা যায়নি। অথচ এখন সব নীরব।

'মনে হচ্ছে নড়ছি না,' কিশোর বললো, 'আসলে চল্লিশ মাইল বেগে ছুটছি। বাতাসের যা জোর দেখেছি!'

শোঁ শোঁ শব্দ শোনা গেল সামনে।

'বস্তা ফেলো!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'কুইক!'

'কিসের শব্দ?' বস্তা ফেলতে শুরু করেছে মুসা।

'গাছের ভেতর দিয়ে বাতাস বইছে। বাড়ি লাগলে গেছি।' অলটিমিটারের ওপর আলো ফেলে দেখলো কিশোর। 'মাত্র একশো দশ ফুট উঁচুতে রয়েছি। ঠিক হচ্ছে না। কোনো কোনো গাছ এখানে দেড়শো ফুট উঁচু।'

আরও কিছু বস্তা ছুঁড়ে ফেলা হলো বাইরে।

শোঁ শোঁ বাড়ছে। তার মানে কাছে এসে গেছে গাছপালা। বেলুন এখন উঠছে, তবে ধীরে ধীরে। সময় মতো গাছের মাথার ওপরে উঠে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ।

বালির বস্তা ফেলে চলেছে রবিন আর মুসা। দড়ির সিঁড়িটা টেনে তুলছে কিশোর। ওটা ডালেটালে আটকে গেলে বিপদ। নোঙরের দড়িটাও তোলা দরকার, তবে সময় নেই এখন আর।

তারপর লাগলো বাড়ি। আরেকটু হলেই উল্টে গিয়েছিলো ঝুড়ি। হাতেমুখে ডালপাতার বাড়ি লাগলো। আটকে যাওয়ায় বাতাসের জোর আবার অনুভব করতে পারছে।

বেলুনটা কি ফুটো হয়ে গেছে? টর্চ জ্বেলে দেখলো কিশোর। না, বেলুনটা গাছে লাগেনি। শুধু ঝুড়িটা আটকেছে।

'কি করবো?' মুসার প্রশ্ন। 'নেমে পড়বো গাছ বেয়ে?'

ঝুড়ির বাইরে আলো ফেলে দেখলো কিশোর। 'নাহ্। একটা বানরও ঝুলতে পারবে না, এতো সরু ডাল।'

'খারাপ কথা।'

'না, ভালো। নরম ডাল বেশিক্ষণ আটকে রাখতে পারবে না ঝুড়িটাকে।'

কিন্তু নিরাশ হতে হলো ওদেরকে। জোরালো আরেক ঝলক বাতাস আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দিলো ঝুড়িটাকে। বিরক্ত হয়ে চেঁচামেচি করতে করতে বেরিয়ে এলো হর্নবিল পাখির ঝাঁক, ডালে বসে ঘুমোচ্ছিলো ওগুলো।

আরও জোরে বয়ে গেল আরেক ঝলক বাতাস। আরও শক্ত হয়ে আটকে গেল ঝুড়ি। ব্যাপার কি? যে ডালে ঝুড়ি আটকেছে, ওগুলো তো বেলুনটাকে ধরে রাখতে পারার কথা নয়! তাহলে? আবার আলো জ্বেলে ভালোমতো দেখলো

কিশোর। না, ঝুড়ি নয়, আটকেছে নোঙরের দড়িটা।

দড়িটা ধরে টানাটানি শুরু করলো সে আর মুসা মিলে। কিন্তু যে দড়ি বেলুনে ছুটাতে পারছে না সেটা কি আর ওরা পারে? কাজটা অবশেষে ওদের হয়ে বাতাসই করে দিলো। এক হ্যাঁচকা টান মেরে দিলো ছুটিয়ে। আবার ছুটতে শুরু করলো বেলুন।

আনন্দে চিৎকার করে উঠলো রবিন। যেন দড়িটা ছুটে যাওয়াতেই সমস্ত ঝামেলা মিটে গেল। গাছপালাবিহীন ভালো একটা সমতল জায়গা দেখে বেলুন নামালেই হবে এখন। নামানোটা তো আর কঠিন কিছু না, গ্যাস ছেড়ে দিলেই হবে।

কিন্তু ভাবা যতো সহজ, করা ততোটা না। নিচে গাছপালা ছাড়া ভালো জায়গা আছে কিনা কিভাবে বুঝবে? অন্ধকারে দেখাই যায় না কিছু। রেললাইন থেকে দূরে তেমন জায়গা আছে কিনা তা-ও জানা নেই। আর এই বাতাসের মধ্যে নামার অর্থ হচ্ছে মাটি ঘেঁষে শ'খানেক ফুট ছেঁচড়ে যাওয়া। এবং তার মানে ভীষণ শক্ত উইয়ের ঢিবি আর বড় বড় পাথরে ক্রমাগত বাড়ি খাওয়া। ঝুড়ি তো যাবেই, ছাতু হয়ে যাবে শরীর।

এমনও হতে পারে, চমকে যাওয়া হাতির পাল, অস্থির গণ্ডার কিংবা রাক্ষুসে হায়েনার মধ্যে পড়লো। রাতের এই সময়ে সিংহও শিকারে বেরোয়। ওগুলোর সামনে পড়াটাও মারাত্মক।

প্রতিটি মিনিট যাচ্ছে, আর ক্যাম্প থেকে ওদেরকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে বাতাস। অন্য ক্যাম্পের কথা ভাবলো কিশোর। এই যেমন, কিতানি সাফারি লজ। পুবের হাওয়া বইছে। কোনদিকে যাচ্ছে আন্দাজ করার চেষ্টা করলো সে। সাভো নদীর পশ্চিম ধার ঘেঁষে উপত্যকা পেরিয়ে যাবে সম্ভবত লজের দিকেই।

হয়তো এখনই রয়েছে লজের ওপরে। নিচের দিকে টর্চ জ্বাললো সে। জানে, দেখার সম্ভাবনা প্রায় নেই, তবু চেষ্টা করলো। আরও একটা কারণ আছে টর্চ জ্বালার। যদি ভাগ্য ভালো হয়, আর আলোটা ক্যাম্পের কারো চোখে পড়ে যায়!

টর্চটা আবার নেভাতেই নিচে মিটমিটে আলো চোখে পড়লো। নিশ্চয় ক্যাম্প, কেবিনের জানালা দিয়ে বেরোচ্ছে।

'চেঁচাও!' বলেই চেঁচাতে শুরু করলো কিশোর।

গলা ফাটিয়ে এমন জোরে চেঁচাতে শুরু করলো তিনজনে, মরা মানুষ জেগে যাবে। তাদের সেই চিৎকার ভেসে চলে গেল বাতাসে। দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই সরে চলে এলো ক্যাম্পের ওপর থেকে। এরপর থেকে শুরু হয়েছে পূর্ব আফ্রিকার সাংঘাতিক বুনো এলাকা। নিচে এখন কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না।

সামনে কালো বিশাল একটা কিছু যেন ঠেলে উঠেছে আকাশে, তারা ঢেকে

দিয়েছে। কালোর ওপরে শাদামতো কিছু, শাদা ছাত বলা যায়, কিংবা রাতের আকাশে শাদা মেঘ।

কালো স্তম্ভের ওপরে শাদা ছাত, কি ওটা? কল্পনায় এই এলাকার ম্যাপটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলো সে। কিতানির সোজা পশ্চিমে কি কি আছে?

মনে পড়লো। পর্বত! ধড়াস করে উঠলো বুক। গলা শান্ত রাখার চেষ্টা করলো, 'খারাপ খবর আছে। সামনে কিলিমানজারো পর্বত। এভাবে এগোলে বাড়ি লাগবেই।'

অন্ধকারে গলা বাড়িয়ে পর্বত দেখার চেষ্টা করলো মুসা আর রবিন।

'ঘুরে যাওয়া যায় না?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'না,' জবাব দিলো কিশোর। 'এটা অ্যারোপ্লেন নয় যে যেদিকে খুশি ঘোরাবো। বাতাসের ইচ্ছেমতোই চলবে এটা।'

'জানি। তবু বললাম। এক কাজ তো করতে পারি, ওপর দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারি।'

'উনিশ হাজার ফুট ওপর দিয়ে! আফ্রিকার সবচেয়ে উঁচু পর্বত ওটা। বড় জোর ছয় হাজার ফুট ওপরে। তোলা যাবে বেলুন। ঝুড়ির সমস্ত বস্তা ফেলে দিলেও উনিশ হাজার ফুট উঠবে না।'

'তাহলে লাগুগগে বাড়ি। ছালচামড়া উঠবে, দু'চার জায়গায় বাড়ি লেগে ফুলবে। ফুলুক। ঢাল বেয়ে নেমে কোনো গাঁয়ে চলে যাবো। ওখান থেকে ফেরার একটা ব্যবস্থা হবেই।'

তিক্ত হাসি হাসলো কিশোর। 'পর্বতের একপাশে কোনো ঢালই নেই? একেবারে দেয়ালের মতো খাড়া। বাড়ি লাগলেও বেরোনোর চেষ্টা করবে না, যদি তখনও বেঁচে থাকো। দেয়ালে ঠেকে থাকবে বেলুন, আমরা ঝুড়িতে বসে থাকবো।'

'না খেয়ে না মরা পর্যন্ত?'

'বাতাসের গতি না বদলানো পর্যন্ত। তারপর আরেক দিকে আমাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বাতাস।'

'তা বোধহয় সম্ভব না,' মুখ খুললো রবিন। 'যতদূর মনে হয়, এটা বাণিজ্য বায়ু।

'ঠিক। বছরের সব সময়েই প্রায় একরকম ভাবে বয়ে যায় পুব থেকে পশ্চিমে। কিন্তু অলৌকিক কাণ্ডও তো ঘটে এই পৃথিবীতে। সে-রকমই কিছুর আশায় থাকবো আমরা।'

ভূগোলে বেশ ভালোই জ্ঞান আছে কিশোরের। তবে এই উত্তেজনার মাঝে অনেক কিছুই মনে পড়ছে না তার। সামনে আলো ফেলে দেখলো মুসা। আশা করেছিলো, পর্বতের গায়ে আলো পড়বে। পড়লো না।

'আরে, গতি কমে গেছে মনে হয়!' বললো সে। 'কি করে হলো?'

অনুমান করলো কিশোর, 'নিশ্চয় পর্বতের জন্যে। সোজা এগোনোর পথ পাচ্ছে না বাতাস, ফলে গতিও গেছে কমে। এরকম হারে কমতে থাকলে ধাক্কাই খাবে না বেলুন।'

ধাক্কা সত্যি লাগলো না, এমনকি ছোঁয়াও না। বরং, ওদের চোখের সামনে যেন পিছলে নেমে যেতে শুরু করলো পর্বতের ধার। ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি! ভয় পেয়ে গেল মুসা। তবে মুহূর্ত পরেই ব্যাপারটা বুঝে ফেললো। পর্বত নামছে না; ওরাই উঠছে, দ্রুতগতিতে। আশ্চর্য!

অলটিমিটারের দিকে তাকালো কিশোর। পাঁচশো ফুট...এক হাজার.... পনেরোশো...দুই হাজার। মাথার মধ্যে কেমন বোঁ বোঁ করছে। পাঁচ হাজার...দশ...পনেরো...

'থারমালে পড়েছি আমরা!' হঠাৎ বলে উঠলো রবিন।

'থারমালটা কি?' মুসা বুঝলো না।

'গরম বাতাসের ওপরে ওঠা।'

'এখানে গরম বাতাস আসবে কোত্থেকে?'

'ওই পর্বত। সূর্যের উত্তাপ ধরে রেখেছে। গরম পাথরের সংস্পর্শে এসে বাতাসও গরম হয়ে যাচ্ছে। উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। কাজেই আমরাও যাচ্ছি।'

'যাক, অলৌকিক ব্যাপারই ঘটলো!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো মুসা।

'এরকমটা কনটিনিউ করলেই হয়,' কিশোর বললো।

'কেন করবে না?'

'যতোই ওপরে উঠছি, ঠাণ্ডা বাড়ছে। বিষুব অঞ্চল থেকে যেন মেরু অঞ্চলে এসে পড়েছি। আধ ঘন্টা আগেও ছিলো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জঙ্গল। আর এখন দেখ।'

পর্বতের গায়ে পাথর চোখে পড়ছে না আর এখন, বরফ আর তুষারে ঢেকে দিয়েছে। জোর কমে আসা থারমালের মধ্যে পড়ে নাচানাচি করছে বেলুন, বেরোনোর চেষ্টা করছে যেন চিরস্থায়ী তুষার অঞ্চল থেকে। আবার নামতে শুরু করলো নিচের দিকে।

'জলদি! জলদি বস্তা ফেলো!' চেঁচিয়ে উঠলো কিশোর। 'এখানে আটকা পড়লে জমেই মরে যাবো!'

একের পর এক বস্তা ফেলেও সুবিধে হচ্ছে না। অনেক নেমে চলে এসেছে বেলুন, ঝুড়িটা ছেঁচড়ে চলেছে এখন তুষার-স্তূপের ওপর দিয়ে একনাগাড়ে তুষার ঝরছে। বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা।

হাসলো মুসা। পরিবেশ সহজ করার জন্যে বললো, 'কি আর করবো নেমে গেলে ইগলু বানিয়ে বাস করবো আরকি পর্বতের মাথায়। ঈগল ধরে ধরে খাবো' শীতে কেঁপে উঠলো সে। 'যতোদিন না সাহায্য আসে।' আঙুলের ডগা ইতিমধ্যেই বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, জমে যাওয়ার পূর্বাভাস। অক্সিজেনের অভাব অনুভব করতে আরম্ভ করেছে।

জোরে একবার কেঁপে উঠে থেমে গেল ঝুড়ি। একঝলক বাতাস এসে হ্যাঁচকা টানে আরও খানিকটা সরিয়ে নিলো। আরও বস্তা ফেলা হলো। বেতো ঘোড়ার মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে যেন তুষারের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললো ঝুড়িটা। হঠাৎ করেই গতি সঞ্চারিত হলো। লাফিয়ে উঠলো কয়েক ফুট। সামান্য গরম মনে হলো বাতাস। তুষারপাতের ভেতর দিয়ে নিচেটা আবছামতো চোখে পড়ছে। শাদা বরফ কিংবা তুষার কিছুই দেখা গেল না। শুধু বিরাট কালো এক শূন্যতা। অনেক নিচে আগুন দেখা যাচ্ছে।

হাজার হাজার বছর আগে জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি ছিলো কিলিমানজারো। তারপর বহুদিন যাবত মৃত, কিংবা সুপ্ত ছিলো। ইদানীং আবার তার জেগে ওঠার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। গলিত লাভা কারও চোখে পড়েনি এখনও, বরফ আর তুষারও গলে পানি হয়ে যায়নি, তবে কিছু ছোট ছোট জ্বালামুখ থেকে নাকি বাষ্প বেরোতে দেখেছে অনেকে।

কথাটা সত্যি। কারণ ওই বাষ্পই বাঁচিয়ে দিলো আকাশ- বিহারকে। যেখানে বাষ্প বেরোচ্ছে সেখানে বাতাস গরম। শাঁ করে পঞ্চাশ-ষাট ফুট উঠে গেল বেলুন। দ্রুত পেরিয়ে আসতে লাগলো চূড়াটা।

হাঁপ ছাড়লো তিন গোয়েন্দা।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেললো কিশোর। 'যাক, একটা ফাঁড়া কাটলো। বাজি রেখে বলতে পারি, বেলুনের ঝুড়িতে করে কিলিমানজারো পেরোলাম আমরাই প্রথম।'

তেরো

নামতে শুরু করেছে বেলুন।

ব্যাপারটা প্রথম খেয়াল করলো রবিন।

অলটিমিটার দেখলো কিশোর। আঠারো হাজার ফুট। দেখতে দেখতে নেমে চলে এলো পনেরো হাজারে।

'এটা ঘটবেই,' মন্তব্য করলো সে। 'গরম থারমাল আমাদেরকে উঠিয়েছিলো। এখানে বাতাস ঠাণ্ডা। আর ঠাণ্ডা বাতাসে অতো ওপরে থাকতে পারবে না বেলুন।'

পর্বতের এপাশটা পাথর-সর্বস্ব নয়। খাড়াও নয় অন্যপাশের মতো। বেশ ঢালু। মাটি আছে। কাজেই সূর্যের তাপ ধরে রাখতে পারে না বেশিক্ষণ। ওপাশে বাতাস যেমন গরম, এপাশে তেমনি ঠাণ্ডা।

আট হাজার ফুটে নেমে এসেছে বেলুন। কমপক্ষে আরও দু'মাইল নামবে, তারপর যদি থামে।

দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগতে আরম্ভ করেছে রবিনের। 'বেশি তাড়াতাড়ি নামছে!'

কথাটায় একটা ধাক্কা খেলো কিশোর। নতুন বিপদের ইঙ্গিত। হ্যাঁ, বেশি

তাড়াতাড়িই নামছি।'

'নামলেই তো ভালো,' মুসা বললো।

'না। বেলুনের মুশকিলই হলো, চলতে আরম্ভ করলে থামানো যায় না। থামলে চালানো যায় না। আবার উঠতে আরম্ভ করলে সহজে নামানো যায় না, তেমনি নামতে শুরু করলে ওঠানো যায় না। এমনকি বন্ধও করা যায় না সহজে। এই যে আমরা তখন এতো বস্তা ফেললাম, সহজে উঠলো কি? এমনও হতে পারে একেবারে মাটিতে না নামার আগে থামবেই না। প্রচণ্ড বাড়ি লাগবে ঝুড়িতে। আর এক আছাড়েই আমরা খতম। বস্তা ফেল, আর কোনো উপায় নেই।'

আবার বস্তা ফেলা হতে লাগলো। কোনো কাজ হচ্ছে না। পর্বতে বাড়ি খেয়ে ওপরে, নিচে, পাশে ছড়িয়ে পড়ছে বাতাস। নিম্নগতি একটা স্রোতের মধ্যেই পড়েছে আকাশ-বিহার। নেমে চলেছে শাঁ শাঁ করে। মাটিতে আছড়ে না পড়ে যেন আর থামবে না।

'দড়ি!' চেঁচিয়ে বললো মুসা। 'দড়িটা দিয়ে থামানো যায় না!'

'তাই তো! আগে ভাবলাম না কেন!' বলতে বলতেই দড়িটা তুলে পর্বতের ঢালের দিকে ছুঁড়ে মারলো কিশোর। একশো ফুট দড়ির একমাথা বাঁধা রয়েছে ঝুড়িতে, আরেক মাথা খোলা। ঢালের গায়ে অনেক পাথর আছে, ঝোপঝাড় আছে। কোনোটাতে আটকে গেলেই হয়। নিচে নামা আটকাতে পারবে বেলুনের।

কিন্তু কোথাও আটকাচ্ছে না দড়ি। নেমেই চলেছে বেলুন, যেন পাথরের মতো পড়ছে। থামার আশা ছেড়ে দিয়েছে ছেলেরা। ভাবছে এখন, মাটিতেই পড়বে, না পাথরের ওপর? গাছের মাথায় পড়লেও বাঁচার ক্ষীণ আশা আছে। কিন্তু নিচে গাছ আছে তো? টর্চ জ্বেলে দেখলো কিশোর।

শুরুতে ঢাল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না। তারপর চোখে পড়লো আরও নিচে যেখানে সমতল হয়ে গেছে উপত্যকা। 'ফাইন,' বললো সে। 'মনে হচ্ছে নরম ঘাস। আছাড়টা কমই লাগবে।'

আরও নিচে নামার পর নিচে তাকিয়ে আঁতকে উঠলো মুসা। দেখলো লক্ষ লক্ষ তলোয়ার যেন ফলা উঁচু করে রেখেছে ওদেরকে বিদ্ধ করার জন্যে।

উদ্ভিদ, কোনো সন্দেহ নেই। খাড়া হয়ে আছে, প্রায় ছয় ফুট উঁচু। তলোয়ারের মতো এই পাতাগুলো দূর থেকে কিংবা উঁচু থেকে দেখলে মনে হয় সবুজ ঘাসের মাঠ। প্রতিটি পাতার ডগায় রয়েছে চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা চোখা কাঁটা।

'বস্তা ফেলো! বস্তা ফেলো!' চিৎকার করে বললো কিশোর।

যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেলা হতে লাগলো। কিন্তু বেলুন আর থামে না। পড়ার মোহে পেয়েছে যেন ওটাকে। তলোয়ার-পাতায় খোঁচা লাগিয়ে নিজেকে না ফাঁসানো পর্যন্ত আর নিস্তার নেই যেন।

'ঝুড়িতে আর থাকা যাবে না,' কিশোর বললো। 'দড়ি বেয়ে উঠে যাও।'

যেসব দড়ি দিয়ে বেলুনের সঙ্গে ঝুড়িটা বাঁধা রয়েছে ওগুলোর কথা বললো সে।

দড়ি ধরে ঝুলে পড়তে না পড়তেই খচাং খচাং করে অসংখ্য তলোয়ারের খোঁচা লাগলো ঝুড়িতে। কট কট করে ভাঙলো খেজুর কাঁটার মতো শক্ত কাঁটাগুলো। উঠতে আর এক মুহূর্ত দেরি করলেই পায়ে খোঁচা খেতো ওরা।

ওঠার সময় তো উঠেছে, খোঁচা বাঁচিয়েছে, এখন কি করবে? সকাল পর্যন্ত আটকে থাকতে হবে। কপাল ভালো হলে তখন এই তলোয়ার খেতের মালিক এসে ওদেরকে মুক্ত করবে। কিন্তু এতোক্ষণ কি আর ঝুলে থাকা সম্ভব! কোমরের বেল্টে ঝুলছে লুপে বাঁধা ছোট একটা টর্চ, সেটা জ্বাললো কিশোর।

কাঁটায় বিঁধে আটকে রয়েছে ঝুড়িটা। নিচ দিয়ে ঢুকে ওপর দিয়ে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য কাঁটা, ঝুড়ির তলাটা দেখতে লাগছে এখন শজারুর পিঠের মতো। টর্চ নিভিয়ে দিলো আবার সে।

'কি পাতা ওগুলো?' মহা খাপ্পা হয়ে বললো মুসা। 'হতচ্ছাড়া এই দেশে আরও যে কতো কিছু দেখবো!'

'সিসল,' রবিন বললো।

'কি হয় ওগুলো দিয়ে?'

'তা-ও জানো না। এদেশের প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। দেখতে ক্যাকটাসের মতোই। সেঞ্চুরি প্ল্যান্টের খালাতো ভাই।'

'সেঞ্চুরি প্ল্যান্ট। যেসব গাছে একশো বছরে একবার ফুল ফোটে, তারপর মরে যায় গাছ, ওগুলোর কথা বলছো?'

'লোকে তাই ভাবে বটে। আসলে একশো বছর বাঁচেই না ওই গাছ। বড় জোর দশ। তারপর লম্বা মোচা বেরোয়, ফুল ফোটে, এবং তারপরই দুনিয়ার মায়া কাটায়। সিসল গাছও তাই করে।'

'দেখি তো ফুল আছে কিনা? কিশোর, টর্চটা জ্বালো তো।'

জ্বাললো কিশোর। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলতে লাগলো খেতের ওপর। একহাতে দড়ি ধরে ঝুলে থাকা ভীষণ কষ্ট। ঝুড়ির কিনারে চোখ পড়তেই বলে উঠলো, 'আজ হলো কি আমার! তোমাদেরও কি একবার মনে হলো না! ঝুড়ির কিনারে পা রেখে দাঁড়ালেই তো পারি।'

'তাই তো!' একসঙ্গে বলে উঠলো মুসা আর রবিন।

দড়ি ধরে রেখেই ঝুড়ির কিনারে দাঁড়ালো ওরা।

'হ্যাঁ, এবার জ্বালো,' মুসা বললো, 'গাছগুলো দেখি।'

একটা উদ্ভিদের অনেকগুলো করে পাতা। কোনো কোনোটার ঠিক মাঝখান থেকে বেরিয়েছে লম্বা ডাঁটা, বিশ ফুট উঁচুতে উঠে গেছে। কোনোটার মাথায় মোচা। মোচা থেকে বেরিয়েছে শাদা শাদা ফুল।

'কি কাজে লাগে এই সিসল?' জানতে চাইলো মুসা।

'আঁশ খুব শক্ত এই পাতার। পাতা কেটে কারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ওখানে মেশিনের সাহায্যে পাতার রস আর মাংস ছেঁচে ফেলে দিয়ে আঁশ বের করে। তারপর ওগুলো পাকিয়ে তৈরি করা হয় দড়ি। মোটা করে পাকালে এতো শক্ত হয় ওসব দড়ি, বড় বড় জাহাজকেও বেঁধে রাখা যায়।'

'বুঝলাম। ওসব দড়ি আমাদের কোনো কাজে লাগবে না। সিসল পাতা খাওয়া গেলে তা-ও না হয় এককথা ছিলো। বিচ্ছিরি ওই কাঁটাগুলো বরং আটকেই দিলো আমাদেরকে। কাঁটা থেকে এখন ঝুড়িটা খুলবো কি করে?'

'চলো, জোরে জোরে ঝাঁকাই,' বুদ্ধি দিলো রবিন। 'ভেঙে খুলে যেতে পারে কাঁটাগুলো।'

দড়ি ধরে রেখে প্রথমে পা দিয়ে ঝাঁকানোর চেষ্টা করা হলো। তারপর এক হাতে দড়ি ধরে রেখে আরেক হাতে ঝুড়ির কিনারা চেপে ধরে। কিন্তু একটা ইঞ্চি সরানো গেল না কাঁটা থেকে। 'বুঝেছি গোলমালটা কোথায়,' জোরে জোরে দম নিচ্ছে কিশোর। 'প্রতিটি পাতার দুই কিনারে আরো অসংখ্য শক্ত কাঁটা আছে, বড়শির মতো, আটকেছে ওগুলোতেই। ওগুলো না ছাড়ালে ঝুড়িটাকে ছোটানো যাবে না। দেখি, কিছু করা যায় কিনা।'

আস্তে করে পাতাগুলোর মাঝে শরীরটাকে ছেড়ে দিলো কিশোর। 'উফ্!' করে চিৎকার করে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। কালো কাঁটার খোঁচা খেয়ে। তবে হাত-পা বেশি নাড়াচাড়া করলো না, বড়শি বিঁধে যাওয়ার ভয়ে। ছুরিটা খুলে দিতে বললো মুসাকে। কোমর থেকে ছুরি খুলে বাড়িয়ে দিলো মুসা। ঝুড়ির গায়ে আটকে থাকা কাঁটাগুলো সরাতে হলে পাতার কিনার চেঁছে ফেলতে হবে। আরও কাঁটা যাতে শরীরে না বেঁধে, হুঁশিয়ার থেকে আস্তে আস্তে ছুরি দিয়ে পাতার কিনার চেঁছে ফেলতে লাগলো কিশোর।

মুসাও নামবে কিনা ভাবছে, এই সময় নড়ে উঠলো ঝুড়িটা। 'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'এই দেখ দেখ, বেলুনটা দেখ!'

মুখ তুলে কিশোর দেখলো, কাত হয়ে গেছে বেলুনটা। মাটির অনেক কাছাকাছি নেমে এসেছে, পাতাগুলোর ওপরে। আর সামান্য নামলেই ফুটো হয়ে সমস্ত গ্যাস বেরিয়ে যাবে।

এই গোলমালের মূল হলো বাতাস। পর্বতের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে। মাটির কাছাকাছি এসে ধাক্কা খেয়ে মোড় নিয়ে বয়ে চলেছে কাত হয়ে, বেলুনটাকেও কাত করে ফেলেছে।

মরিয়া হয়ে দ্রুত হাত চালালো কিশোর। কাঁটার খোঁচা অগ্রাহ্য করে মুসাও নেমে পড়লো তাকে সাহায্য করার জন্যে। রবিনের কিছুই করার নেই, সে দড়ি ধরে ঝুলে রয়েছে, আর মনে মনে প্রার্থনা করছে, ঈশ্বর, বেলুনটা যেন ফুটো না হয়!

একধরনের পিচ্ছিল রস বেরোচ্ছে সিসলের পাতা থেকে। সাবানের মতো। প্রাচীন কালে সাবান হিসেবেই ব্যবহার করা হতো এই রস। এখনও খেতের কাছে বসবাসকারী আফ্রিকানরা তা করে। প্রাকৃতিক এই জিনিসটি আধুনিক সাবানের চেয়ে ভালো পরিষ্কারক।

পানি থাকলে না হয় ধুয়ে ফেলা যেতো। নেই, তাই যা হওয়ার তাই হলো। মুসা আর কিশোরের হাত ভরে গেল আঠালো পিচ্ছিল তরলে। ছুরির বাঁটই পিছলে যেতে চায়।

একপাশের আরও অনেক খানি উঠে গেল ঝুড়ি। রবিনকে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'রবিন, টান কি রকম?'

'বাড়ছে।'

'মুসা,' কিশোর বললো, 'তুমি উঠে যাও।'

'কিন্তু তাতে তো ভার বাড়বে। আরও নেমে যাবে।'

'যাবে না। আমি আর কয়েকটা কাঁটা সরিয়েই লাফিয়ে উঠে পড়বো।'

ঝুড়িতে উঠে গেল মুসা। বেশির ভাগ কাঁটাই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মুসা ওঠার পরও ভার নিয়ে বেশ টানছে এখন বেলুন। আরেকটু টান বাড়লেই বাকি কাঁটাগুলো থেকে টেনে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে ঝুড়িটা।

বেলুনের টানে চড়চড় করে কয়েকটা কাঁটা ছিঁড়ে গেল। ওর পাশটায় আরও কাত হয়ে গেল ঝুড়ি। জোরে দুলে উঠলো একবার।

'কিশোর, জলদি ওঠো, জলদি!' মুসা বললো।

তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে কিশোরের প্যান্টে বিঁধে গেল একটা বড়শির মতো কাঁটা। ওদিকে টান বেড়েছে আরও। যে কোনো মুহূর্তে ঝুড়িটা ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে বেলুন। আরও কাত হয়ে গেছে এখন টানের চোটে। বাতাসের জোরও বেড়েছে বোঝা যায়। এখুনি যদি ছুটতে না পারে আকাশ-বিহার, তাহলে আর পারবে না, ফেঁসে যাবে।

চড়চড় করে উঠলো আবার, আরও কিছু কাঁটা ছুটলো। আর দেরি করা যায় না। কাঁটা খোলার চেষ্টা করলো না আর কিশোর, টান লেগে প্যান্ট ছিঁড়ে যায় যাক। মুসা আর রবিনকে বললো সাহায্য করতে। সে-ও উঠলো ঝুড়িতে, ওমনি ছুটে গেল ঝুড়িটা। কাঁটার ওপর দিয়ে সড়সড় করে হিঁচড়ে গেল অনেকখানি, যতোক্ষণ না সোজা হলো বেলুনটা।

আরও কিছু কাঁটার খোঁচা সহ্য করতে হলো ওদেরকে। তারপর মুক্তি।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না রবিন। বসতে গিয়ে খেয়াল করলো, একেবারে অক্ষত অবস্থায় মুক্তি দেয়নি কাঁটা, ঝুড়ির অনেক বাঁধন কেটে গেছে, বেশি চাপ লাগলে তলাটা খসে পড়ার সম্ভাবনা আছে। নীরবে আঙুল তুলে সেটা দেখালো বন্ধুদের।

'হুঁ,' গম্ভীর হয়ে মাথা দোলালো কিশোর। 'কোনোভাবে বাঁধনগুলো আরেকটু খুললেই হয়, খসে পড়ে যাবে। বেশি ভার দেয়া যাবে না।'

নোঙরের দড়িটা টেনে তুলতে তুলতে মুসা জিজ্ঞেস করলো, 'ল্যাণ্ড করার ভালো একটা জায়গা পাওয়া যায় না?'

'সম্ভাবনা খুবই কম,' জবাব দিলো রবিন। 'এই সিসলের খেত মাইলের পর মাইল ছড়িয়ে থাকে।'

পুব দিগন্তে আবছা আলো। রঙ লাগতে শুরু করেছে আকাশে। ভোর হচ্ছে। পেছনে কিলিমানজারো, আকাশের পটভূমিতে যেন এক প্রকাণ্ড দৈত্য মাথা তুলে রেখেছে। সামনে, সিসল খেত ছাড়িয়ে আরও দূরে মাথা তুলেছে আরেকটা পর্বত, মাউন্ট মেরু, পনেরো হাজার ফুট উঁচু।

'খাইছে, আবার!' ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেল যেন মুসা।

'ওটার জন্যে আর ভাবি না,' কিশোর বললো। 'ওটাও পেরিয়ে যেতে পারবো। আসল বিপদটা শুরু হবে ওটা পেরিয়ে যাওয়ার পর।'

কিলিমানজারো যেভাবে পেরিয়েছিলো, মাউন্ট মেরুও সেভাবেই পেরোলো আকাশ-বিহার। পাথরে আটকে থাকা উত্তাপই সাহায্য করলো ওটাকে। চূড়ার কয়েকশো ফুট ওপর দিয়ে পেরিয়ে এলো। বাঁয়ে কয়েক মাইল দূরে দেখা গেল আরুশা শহর। বিনকিউলার চোখে লাগালো কিশোর। আশা করছে, ওই শহরের কারো চোখে বেলুনটা পড়বে, খবর চলে যাবে কিতানি লজে। কিন্তু এই ভোরবেলা জীবনের কোনো চিহ্নই চোখে পড়লো না শহরের পথে।

নিরাশ হলো কিশোর। তার জানা আছে, সামনে কয়েকশো মাইলের মধ্যে আর কোনো শহর নেই।

যা বলেছিলো মুসাকে, খারাপ হয়ে আসছে জায়গা। সুন্দর, কিন্তু নামার উপায় নেই। জোরালো বাতাসে তীব্র বেগে ধেয়ে চলেছে এখন আকাশ-বিহার। যেখানে সেখানে মাথা তুলে রেখেছে ছোট-বড় পাহাড়, টিলা। উপত্যকা আছে প্রচুর, বড় বড় গাছের বন আছে। কিন্তু সমতল জায়গা প্রায় চোখেই পড়ছে না যেখানে ল্যাণ্ড করা যায়। আর এই গতিতে নামতে যাওয়ার চেষ্টা করা মানে গাছে কিংবা পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে ছাতু হয়ে যাওয়া।

নিরাপদ জায়গা এখানে একটাই, আকাশ। তবে পুরোপুরি নিরাপদ বলা যায় না কিছুতেই, কারণ ঝুড়ির তলা নরম হয়ে গেছে। দমকা বাতাসের একটা জোরালো ঝাপটাতেই খসে যেতে পারে কাগজের ঠোঙার তলার মতো।

চোদ্দ

বিশাল এক গিরিখাত চোখে পড়লো। আমেরিকার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন দেখেছে ওরা, তার চেয়ে কম চওড়া নয় খাতটা, তবে গভীরতা কিছুটা কম।

'দা গ্রেট রিফট,' গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলো কিশোর। 'বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা গিরিখাত। জামবেসি নদী থেকে শুরু হয়েছে। মধ্য আর উত্তর আফ্রিকার ভেতর দিয়ে গিয়ে, লোহিত সাগরের পাশ দিয়ে চলে গেছে একেবারে মরু সাগর পর্যন্ত। পৃথিবীর পুরো পরিধির চার ভাগের এক ভাগের সমান লম্বা।'

'তৈরি হলো কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলো বিস্মিত মুসা।

'অবশ্যই প্রাকৃতিক কারণে,' রবিন জবাব দিলো। 'আগ্নেয়গিরি আর ভূমিকম্পই এর কারণ। ওই যে দেখ, সামনে কতগুলো হ্রদ। লবণের হ্রদ ওগুলো। ওটা লেক ম্যানিয়ারা।'

গিরিখাতের এক দেয়াল থেকে আরেক দেয়াল পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে হ্রদটা। কিন্তু লবণ থাকলে যেরকম শাদা হওয়ার কথা তেমন নয়, হয়ে আছে টুকটুকে লাল, যেন সূর্যাস্তের রঙ লেগেছে।

লাল কেন, জানা আছে ওদের। কোটি কোটি ফ্লেমিংগো পাখির বাস এই হ্রদে। এতো ঘন হয়ে থাকে ওগুলো, ওপর থেকে দেখলে মনে হয় হ্রদটাই বুঝি লাল।

হ্রদ পেরিয়ে এসে উপত্যকার ওপর দিয়ে উড়ে চললো বেলুন। এটা হলো বিখ্যাত ম্যানিয়ারা গেম রিজার্ভ। জন্তুজানোয়ারের স্বর্গ।

আরেকটু এগোতে হঠাৎ করেই যেন বদলে গেল ভোরের আকাশ। রোদ ঝলমলে দিন ছিলো, হয়ে গেল মেঘলা। পুবের আকাশ থেকে ধেয়ে আসছে বজ্র। দিগন্ত ছাড়িয়ে দ্রুত উঠে আসছে কুচকুচে কালো মেঘ। তার বুকে একনাগাড়ে ছোবল মারছে যেন রূপালি বিদ্যুতের ধারালো ফলা।

বিকট শব্দে বাজ পড়লো। গ্রেট রিফটের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুললো সে আওয়াজ, কয়েক গুণ জোরালো হয়ে ফিরে এসে আঘাত হানলো কানের পর্দায়। ভূমিকম্প শুরু হলো। খাতের দেয়াল থেকে হুড়মুড় করে পিছলে নামতে লাগলো পাথর আর মাটি, ভূমিধস নেমেছে।

আচমকা এসে আঘাত হানলো দমকা হাওয়া। আসার এক মুহূর্ত আগেও বোঝা যায়নি যে আসছে। এতো জোরে ঝাঁকালো ঝুড়িটাকে, পট পট করে ছিঁড়ে গেল দুটো দড়ি।

'দেখ, কি আসছে!' এতোই অবাক হয়েছে মুসা, ভয় পাওয়ার কথাও যেন ভুলে গেছে। খাতের পশ্চিম দেয়ালটা তীব্র গতিতে ছুটে আসছে। আসলে বেলুনটাই ছুটে যাচ্ছে ওটার দিকে। প্রচণ্ড ঝড় বইছে ওখানে, গাছপালার মোচড় দেখেই বোঝা যায়।

নোঙরের দড়িটা তুলে নিলো সে। ছুঁড়ে মারবে। কোথাও আটকে গিয়ে যদি আকাশ-বিহারকে থামিয়ে দেয়, সেই আশায়।

'ওই কাজও করো না,' হুঁশিয়ার করলো রবিন। 'ওখানে নামতে চাই না

আমরা। বরং ওপর দিয়ে পেরিয়ে যেতে চাই। তাই না কিশোর?'

মাথা ঝাঁকালো গোয়েন্দাপ্রধান। সামনে যেন দ্রুত মাথা উঁচু করছে খাতের দেয়াল। কালো। আতঙ্ককর। 'তিন হাজার ফুট ওপরে উঠতে হবে। পারবো কিনা আল্লাহই জানে। বস্তা ফেলো।'

কিছু বস্তা ফেলা হলো। বিপজ্জনক হারে কমে গেছে বস্তার সংখ্যা। রবিন আর কিশোর শঙ্কিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু মুসা ভয় পাচ্ছে না আর। ও ধরেই নিয়েছে, কিলিমানজারো আর মাউন্ট মেরু পেরোনোর সময় যে-রকম অলৌকিক ব্যাপার ঘটেছে, এখানেও তেমনি কিছু ঘটবে। বাতাসের কোনো উর্ধ্বমুখী স্রোত ওদেরকে ওপাশে নিয়ে যাবে। বললো সেকথা।

'এখানে সেরকম বাতাস থাকার কথা নয়,' কিশোরের গলায় সন্দেহ। 'মনে হচ্ছে, সাইক্লোন তৈরি হচ্ছে ওখানটাতে। আর তার মধ্যে পড়লে বারোটা বাজবে বেলুনের।'

বিদ্যে জাহির করলো রবিন, 'সাইক্লোন কি জানো? বাতাসের তীব্র স্রোত। অনেকখানি জায়গা জুড়ে গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে...'

'কোন দিকে ঘোরে?' জানতে চাইলো মুসা।

'বিষুবরেখার দক্ষিণে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেদিকে। আর বিষুবরেখার উত্তরে উল্টোদিকে।'

'আমরা আছি কোথায়?'

'আরে, তাই তো, একথা তো মনে ছিলো না! বিষুবরেখার ওপরেই রয়েছি আমরা!'

'তার মানে,' কিশোর বললো, 'বাতাস এখানে জানে না কোনদিকে যাবে। বলা যায়, বাতাস এখানে খেপা। সব দিকেই ছুটতে চাইবে। একারণেই গ্রীষ্মমণ্ডলের সাইক্লোন অন্যান্য এলাকার চেয়ে ভয়াবহ হয়। বস্তা ফেল, বস্তা ফেল!'

'সব?' মুসার প্রশ্ন।

'সব। এটাই এখন একমাত্র উপায়।'

শেষ বস্তাটাও ফেলে দেয়া হলো। করুণ চোখে সেটার পতন দেখলো কিশোর। বেলুনটাকে নিয়ন্ত্রণ করার একটা বড় উপকরণ শেষ। এখন বাতাস আর রোদের ওপরই পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে।

তবে এসব নিয়ে ভাবনার সময় নেই এখন। দড়ি ধরে রেখেছিলো বলে রক্ষা, নইলে বাতাস যেভাবে ঝটকা দিয়ে ঝুড়িটাকে উপুড় করে দিলো, তাতে তিনজনেই এতোক্ষণে ডিগবাজি খেয়ে রওনা হয়ে যেতো মাটির দিকে। বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঝুলে রইলো দড়ি ধরে, হাজার ফুট নিচে রয়েছে পাহাড়ের পাথুরে ঢাল। ওখানে পড়লে একেবারে ভর্তা।

আরেক দমকা বাতাসে আবার ঠিক করে দিলো ঝুড়িটাকে, আগের অবস্থায় নিয়ে এলো। ঝুড়িতে নামলো ওরা। মুখ ফ্যাকাশে। কেউ কথা বলছে না। বলার অবস্থাই নেই।

বস্তাগুলো ফেলায় অনেক হালকা হয়ে গেছে ভার, উঠতে শুরু করেছে বেলুন। তবে চূড়া পেরিয়ে যেতে পারবে কিনা এখনও বোঝা যাচ্ছে না। কখনও আশা দিচ্ছে বাতাস, ওপর দিকে খানিকটা উঠে গিয়ে, পরক্ষণেই আগের চেয়েও নিরাশ করছে, আরও নেমে গিয়ে! নানারকম শব্দে ভরে গেছে চারপাশটা। বাতাস যে এতো বিচিত্র শব্দ করতে পারে জানা ছিলো না ওদের।

ওপরে উঠছে বেলুন, আরও ওপরে, আরও। মুসার 'অলৌকিক কাণ্ডটা' এবারেও বাতাসের কারসাজি। ঢালে ধাক্কা খেয়ে কোণাকুণি উঠে যাওয়ার চেষ্টা করছে বাতাসের স্রোত। টেনে নিয়ে চলেছে বেলুনটাকে।

আশা হলো ওদের। মনে হচ্ছে পেরোতে পারবে শেষ পর্যন্ত।

পনেরো

যে ঝড়ের ভয়ে আতঙ্কিত হয়েছিলো ওরা, সেই ঝড়ই বাঁচিয়ে দিলো ওদেরকে। দেয়ালের ওপর দিয়ে ঠেলে বের করে দিলো আকাশ-বিহারকে। গলাধাক্কা দিয়ে গেট থেকে বের করে দিলো যেন। তা দিক, কিছু মনে করলো না তিন গোয়েন্দা। বরং মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো ঝড়কে।

ওরা অক্ষতই রইলো, তবে ঝুড়িটার ক্ষতি হলো অনেক। বড় বড় ফাঁক দেখা যাচ্ছে, কয়েক জায়গার বেত খসে পড়ে গেছে। আরও দুটো দড়ি ছিঁড়েছে। আর বেলুনের নোঙরের দড়িটা ছিঁড়ে চলে গেছে গোড়া থেকে। বোধহয় কোনো গাছেটাছে আটকেছিলো, ঝড়ের মধ্যে খেয়ালই রাখতে পারেনি তিন গোয়েন্দা।

দেয়ালের এপাশে এসে দেখা গেল মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। এতো ভারি বৃষ্টিপাত, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সেই সাথে রয়েছে কনকনে ঠাণ্ডা, হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিতে চায়। সারা শরীর ভিজে চুপচুপে হয়ে গেল চোখের পলকে, শীতে কাঁপতে লাগলো ওরা।

নিচে এখন বড় বড় গাছের জঙ্গল।

নগোরোংগোরো জ্বালামুখ পেরোলো বেলুন, বৃষ্টির মধ্যেই। মৃত আগ্নেয়গিরির এই জ্বালামুখটা তিন হাজার ফুট গভীর। তলায় দেড়শো বর্গমাইল জায়গা জুড়ে জন্মেছে ঘন জঙ্গল। মাঝে মাঝে হ্রদ। জন্তুজানোয়ারের অভাব নেই। ডাঙায় হাতি-গণ্ডার থেকে শুরু করে পানিতে কুমির-জলহস্তী সবই আছে।

জ্বালামুখ পেরিয়ে সেরেংগেটি মরুভূমির ওপর চলে এলো আকাশ-বিহার। পেছনে ফেলে এসেছে মেঘ। কালো অন্ধকার থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে উজ্জ্বল আলোয়। চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো ছেলেদের। কনকনে ঠাণ্ডা থেকে

গনগনে গরমে এসে পড়ে কেমন করে উঠলো শরীর, সইতে সময় লাগলো। সামনে যতদূর চোখ যায় শুধু বালি, আর বালি, আর বালি। লোক নেই জন নেই, গাছ নেই পালা নেই, ঘর নেই বাড়ি নেই, জীবনের কোনো চিহ্নই নেই।

দেখতে দেখতে ভেজা শরীর, ভেজা জামাকাপড় শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেল ওদের। প্রচণ্ড পিপাসায় ছাতি ফাটার উপক্রম। খিদে টের পাচ্ছে না কেউ, এমনকি মুসাও না, শুধু তৃষ্ণা। অস্বাভাবিক তৃষ্ণা।

বাতাসের খেপামি নেই এখানে, শান্ত, একটানা। বেলুন চলেছে...চলেছে... নির্মম ভাবে শরীরে আঘাত হানছে যেন রোদের চাবুক। মাথার ওপরে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে বুঝি মরুর সূর্য, অন্তত মুসার সে-রকমই মনে হলো।

'ইস্, পানির একটা বোতলও যদি থাকতো!' আফসোস করলো মুসা।

কেউ জবাব দিলো না।

'একটা বন্দুক-টন্দুক আনতে পারলেও হতো। হরিণ মেরে তার মাংস খেতে পারতাম, রক্ত পান করে পিপাসা মেটাতে পারতাম।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মুসা,' কিশোর বললো শুকনো গলায়। 'চুপ করো।' গত বারো ঘন্টার উত্তেজনা আর পরিশ্রমে তার নিজের মাথাও যে গরম হয়ে গেছে, বুঝতে পারছে।

এমন সব জিনিস চোখের ওপর ভেসে উঠছে, যেগুলো অবাস্তব। দিগন্তে গ্রাম দেখতে পাচ্ছে। গ্রামের লোকজন বিধ্বস্ত বেলুনটাকে দেখে ছুটে আসছে সাহায্য করার জন্যে। সে জানে, যেদিকে যাচ্ছে, পশ্চিমে, সেদিকে কোনো লোকালয় নেই। তবে মিঠে পানির বিশাল এক আধার রয়েছে। ভিকটোরিয়া হ্রদ। ওটাতে নামতে পারলে প্রাণভরে পানি খাওয়া যেতো।

কিন্তু সেটাও দুরাশা, জানে সে। পশ্চিমেই রয়েছে ভিকটোরিয়া হ্রদ, ঠিক, তবে একশো মাইলের বেশি দূরে। ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে বেলুনটা যদিও বা ঠিক থাকে, ওরা থাকবে না। পিপাসায়ই মরে যাবে।

'দেখ দেখ, জলস্তম্ভ!' চিৎকার করে উঠলো মুসা। 'পানি! পানি!'

কিশোর আর রবিনও দেখতে পাচ্ছে স্তম্ভটা। তবে ওদের বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না, ওটা পানি নয়, বালির স্তম্ভ। মরুভূমিতে বালির ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়েছে।

হোকগে। পরোয়া করে না আর ওরা। মরলে মরুক, বাঁচলে বাঁচুক, কিছুই আর এসে যায় না যেন। চেষ্টা করার উপায় থাকলে না হয় করতো, কিন্তু করবেটা কি? বাতাসের যেদিকে গতি, সেদিকেই যাবে বেলুন। যাক!

মুসা আশা করতে লাগলো, এবারেও অলৌকিক কিছু ওদেরকে বাঁচিয়ে দেবে।

কিন্তু বাঁচানোর কোনো লক্ষণই দেখতে পেলো না। বেলুনটা সোজা ধেয়ে

চলেছে ঘূর্ণির দিকে। এর মধ্যে পড়লে বেলুনটা তো যাবেই, ওদেরকেও শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে হবে।

কি যেন একটা কথা খচখচ করছে কিশোরের মগজে। মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। বিড়বিড় করে রবিন বললো, 'টর্নেডোটা আসছে না। আমরাই এগিয়ে চলেছি। কোনো ভাবে যদি থামা যেতো...'

বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেল যেন কিশোরের মাথায়। মনে পড়েছে! রিপ লাইন! হাত বাড়িয়ে চেপে ধরলো দড়িটা।

'এই, কি করছো?' আঁতকে উঠলো রবিন।

'গ্যাস বের করে দেবো।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার!'

'হয়তো। কিন্তু আর কোনো উপায়ও নেই টর্নেডো থেকে বাঁচার। শক্ত হয়ে বসো।'

দড়ি ধরে টান দিলো কিশোর। কিছুই হলো না। আরও জোরে টানলো। শেষে দু'হাতে দড়ি চেপে ধরে গায়ের জোরে টানতে ফড়ফড় করে তেকোণা একটুকরো কাপড় ছিঁড়ে চলে এলো বেলুনের গা থেকে। ফুস্‌স্ করে বেরিয়ে যেতে শুরু করলো গ্যাস।

দ্রুত নামছে বেলুন। তৈরি রয়েছে ওরা, তারপরেও ঝাঁকুনিটা অনেক বেশি মনে হলো। শরীরের হাড়গোড় সব আলগা করে দিলো যেন। বালিতে প্রায় শ'খানেক ফুট ছেঁচড়ে গিয়ে প্যারাসুটের কাপড়ের মতো নেতিয়ে পড়ে গেল বেলুনের কাপড়। ঢেকে ফেললো ওদেরকে, যেন কবর দিয়ে দিলো।

ঝুড়িটা একেবারে শেষ। নেমেছে নরম বালিতে, তবে ছেঁচড়ে উঠে এসেছে পাথুরে জায়গায়। মরুভূমির এসব অঞ্চলকে বলে হামাডা, অর্থাৎ পাথুরে মরু।

কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হুঁশ হারালো যেন তিনজনেই। সবার আগে সংবিৎ ফিরে পেলো মুসা। মাথা দিয়ে ঠেলে কাপড় তুলে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো নিচ থেকে। কিশোরের অবস্থা তার চেয়ে কাহিল, রবিনের আরও বেশি। কিশোর একাই বেরোতে পারলো। রবিনের সাহায্য লাগলো, একা পারলো না।

গ্যাস পুরো বেরিয়ে যায়নি বেলুনের। কিছু রয়ে গেছে। ঝুড়ি নেই, কোনো রকম ভার নেই, পিংপং বলের মতো লাফ দিয়ে উঠলো হঠাৎ ওটা। বাতাস লাগলো গায়ে। উঠে গেল আরও কিছুটা। ছুটে এলো মরুর দমকা হাওয়া। একটানে তুলে ফেললো প্রায় পঞ্চাশ ফুট।

মাটিতে পড়ে থেকে জিরিয়ে নিয়ে যেন বল ফিরে পেয়েছে আকাশ-বিহার। জোরালো বাতাসে ভর করে উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছে।

'কোথায় যায়?' মুসার প্রশ্ন।

'আল্লাহ জানে,' কিশোরের জবাব।

'ওটার দিকে তাকিয়ে আর লাভ নেই!' দীর্ঘশ্বাস ফেললো রবিন।

'আমরা এখন কি করবো?' আবার মুসা প্রশ্ন করলো।

'জানি না,' বলে উঠে দাঁড়াতে গেল কিশোর। আঁউ করে বসে পড়লো আবার। হাত চলে গেছে ডান পায়ে।

'কি ব্যাপার, ভাঙলো নাকি?' জিজ্ঞেস করলো রবিন।

'বুঝতে পারছি না। তোমাদের কারো কাছে এক্স-রে মেশিন আছে?'

'সরি,' শুকনো হাসি হাসলো মুসা।

'তাহলে দেখি আবার চেষ্টা করে।' জোর করে উঠতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো কিশোর। 'নাহ্, গেছি।'

'তোমরা এখানে বসো,' প্রস্তাব দিলো মুসা। 'আমি গিয়ে দেখি, সাহায্য-টাহায্য মেলে কিনা?'

'কোথায় যাবে?'

'দেখি, কোনো একদিকে।'

'জায়গাটার নাম কি জানো?' রবিন বললো, 'সেরেংগেটির এই অঞ্চলটার নাম দিয়েছে শিকারীরা, শূন্য অঞ্চল। শুধুই শূন্যতা এখানে। বালি আর পাথর ছাড়া কিছু নেই।'

'গ্রামট্রাম কিচ্ছু নেই?'

'কিচ্ছু না। পানিও নেই কাছাকাছি।'

'তাহলে ওই জানোয়ারগুলো বাঁচে কি করে? পানি ছাড়া কোনো জীব বাঁচতে পারে না।'

'তা ঠিক। তবে ওগুলো এখানে বাস করে না। হাজারে হাজারে আসে, দল বেঁধে মাইগ্রেট করে চলে যায় শত শত মাইল দূরের নদীর কাছে। বছরের একটা সময় যায় উত্তরে, আরেকটা সময় উত্তর থেকে আবার ফিরে যায় দক্ষিণে। আর ওসব জানোয়ার পানির কষ্ট সইতে পারে অনেক দিন। পানি না খেয়ে চলতে পারে। যারা পারে না, তারা আসেই না।

'দেখ, অতো কথা শুনতে পারবো না,' অধৈর্য হয়ে উঠলো মুসা। 'আমি যাবোই। কোথায় যাবো জানি না, তবে যাবো।'

'দাঁড়াও,' বাধা দিলো কিশোর। 'ফিরবে কি করে?'

তাই তো! এবারে থমকে গেল মুসা। দিক নির্ণয়ের কোনো যন্ত্র নেই ওদের কাছে। কম্পাস নেই, সেক্সট্যান্ট নেই, কিছু না।

'একটা কাঠি দিয়ে দাগ দিতে দিতে যাবো,' মুসা বললো। 'ফিরে আসবো ওই দাগ ধরে। আরেক কাজ করতে পারি, একটু পর পর পাথর ফেলে যেতে পারি।'

'তা পারো। তবে ফেরার সময় দাগ বা পাথর কিছুই দেখতে পাবে না। যে হারে বালি ওড়ে, এক ঘন্টার মধ্যেই ঢেকে ফেলবে।'

চুপ হয়ে গেল মুসা। তার চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে মরুর বুকে। পোয়াটাক মাইল দূর দিয়ে উত্তরে হেঁটে চলেছে একপাল জেব্রা। গায়ে প্রায় গা ঘেঁষে চলছে। ওগুলোর পেছনেই চলেছে কয়েকশো ওয়াইল্ডবীস্ট। ওগুলোও চলছে গা ঘেঁষে। ছড়িয়ে তো পড়ছেই না, দলছুট হয়ে চলারও লক্ষণ দেখাচ্ছে না কোনোটা। দলটার দিকে তাকিয়ে থেকে কি ভাবলো সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'দাঁড়াও, দেখে আসি।'

সে ওগুলোর কাছে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখেও দেখলো না জানোয়ারগুলো, চলেছে তো চলেছেই।

শীতের দেশ থেকে শীত কাটাতে যেভাবে গরমের দেশে চলে যায় ভ্রমণকারী পাখির দল, আফ্রিকার এসব জানোয়ারও আবহাওয়া বদলের কারণেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরে যায়। এই সরে যাওয়াকেই বলে মাইগ্রেট করা।

সেরেংগেটি পেরিয়ে অনেক জানোয়ার উত্তরে যাতায়াত করে। বেশ কয়েকটা যাত্রাপথ রয়েছে। তারই একটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে মুসা। সেই কোন্ আদিকাল থেকে পাথর আর শক্ত মাটি কেটে দিয়েছে কোটি কোটি খুর। গজখানেক গভীর আর কয়েকশো গজ চওড়া একটা নালামতো সৃষ্টি করে ফেলেছে। ওটাই ওদের যাত্রাপথ, ওপথ ধরেই বার বার আসাযাওয়া করে। পথ থেকে সরে না, ফলে পথ ভুল করে অন্য জায়গায় সরে যাওয়ারও উপায় নেই।

ফিরে এলো মুসা। 'হয়ে গেছে কাজ। সমস্যা খতম। দারুণ রাস্তা বানিয়ে ফেলেছে জানোয়ারগুলো। ওটা ধরে চলে যাবো। কোথাও না কোথাও মানুষের দেখা পাবোই। সাহায্য নিয়ে একই পথ ধরে ফিরে আসবো। তোমরা কিন্তু জায়গা ছেড়ে একেবারেই নড়বে না।'

'তা নাহয় না নড়লাম,' কাছেই বড় একটা পাথরের টিলার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কিশোর। ছায়া মিলবে ওটার ওপাশে। 'কিন্তু এটা মানুষের তৈরি রাস্তা নয়। এর ধারে গ্রাম কিংবা বসতি থাকার সম্ভাবনা নেই। মাইগ্রেট করে যেসব জানোয়ার, ওরা সাধারণত মানুষের বসতি এলাকা এড়িয়ে চলে। একশো মাইল গিয়েও হয়তো দু'পেয়ে কারো দেখা পাবে না, উটপাখি ছাড়া।'

'তাহলে অন্য কোনো উপায় বাতলাও। আর কি করতে পারি?'

'কোনো বুদ্ধিই করতে পারছি না।'

'রবিন, তুমি?'

'না।' মাথা নাড়লো রবিন।

'তাহলে আর কোনো কথা নেই।' গা থেকে বুশ-জ্যাকেটটা খুলে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিলো মুসা। 'এটা রাখো। রাতে কাজে লাগবে।'

'কাজে তো তোমারও লাগবে।'

'আমি তোমার মতো অসুস্থ নই। তাছাড়া হাঁটবো। গা এমনিতেই গরম হয়ে

থাকবে। এটার আর দরকার পড়বে না।'

ষোলো

অজানার উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে মুসা। উড়ন্ত ঝুড়িতে এতোগুলো ঘন্টা বেকায়দায় কাটানোর পর হাঁটতে ভালোই লাগছে। জানোয়ার-ধরা পথের ধার দিয়ে চলেছে সে। তাড়াতাড়ি যেতে পারলে হয়তো অন্ধকার হওয়ার আগেই কাউকে পেয়ে যাবে।

ধোঁয়া, কুঁড়ে কিংবা তাঁবু দেখার জন্যে কড়া নজর রেখেছে সে। কিন্তু মানুষ বাসের কোনো চিহ্নই চোখে পড়ছে না। তবে একাকী লাগছে না তার। দিনের আলো আছে। জানোয়ারগুলো রয়েছে পাশাপাশি।

ভীষণ গরম রোদ। দরদর করে ঘামতে শুরু করেছে সে। চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছে, সেখানে বালু লেগে গিয়ে চটচট করছে। সাংঘাতিক অস্বস্তিকর। নাকেমুখে বালি ঢুকে পড়তে চায়। শেষে নাকের ওপর রুমাল বাঁধলো।

খিদে যেন করাত চালাচ্ছে পেটের মধ্যে। বিশ ঘন্টা কিছু খায়নি। তবে বেশি কষ্ট দিচ্ছে পিপাসা।

কল্পনা করতে করতে চলেছে সে—সবুজ তৃণভূমির মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে মিষ্টি পানির নহর। উপুড় হয়ে মুখ ডুবিয়ে পানি পান করছে। তারপর নহরের পাশেই ঘাসের গালিচায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু তার পা ঠিকই চলছে, আর বালি ঢুকছে চোখের ভেতর। এবং আহত কিশোর আর দুর্বল রবিন অসহায় হয়ে মরুভূমিতে পড়ে রয়েছে তার সাহায্য নিয়ে ফেরার অপেক্ষায়।

অপূর্ব সুন্দর সূর্যাস্ত। না লাল, না গোলাপী, না সোনালি। অথচ সব ক'টাই মনে হয়। পুরো আকাশে যেন হলুদ রঙ গুলে দেয়া হয়েছে, জণ্ডিস হয়ে গেছে পশ্চিম আকাশটার। তার পর দ্রুত ঘনিয়ে আসতে লাগলো অন্ধকার।

জানোয়ারগুলোর মতিগতি বদলে যেত শুরু করলো অন্ধকার নামতেই। রাতের আতঙ্ক এখন ওদের মনে। অন্ধকারে গা ঢেকে চুপি চুপি আসবে মাংসাশী জানোয়ারের দল। কখন যে কাকে ছিনিয়ে নেবে বলার জো নেই।

মুসারও ভয় ভয় করতে লাগলো। দিনের বেলা মনে হয়েছিলো, বন্ধুদের পাশেই রয়েছে। এখন মনে হতে লাগলো অন্যরকম। অন্ধকারে মরুভূমি ভরে গেছে শুধু শত্রুতে। ভূত ছাড়া আর কাকে কাকে ভয় পাবে, হিসেব শুরু করলো সে মনে মনে।

প্রথমেই ধরা যাক সিংহ। সিংহের অঞ্চল বলা হয় এটাকে। বাকি সমস্ত আফ্রিকায় যতো সিংহ আছে, শুধু সেরেংগেটিতেই আছে ততগুলো।

দুই নম্বর, চিতাবাঘ। দিনের বেলা প্রায় দেখাই যায় না ওগুলোকে, শিকারে

বেরোয় রাতের বেলা।

'তিন নম্বর, ক্যারাকাল, বেড়াল গোষ্ঠির প্রাণী। মরুভূমিতেই বাস, বিশেষ করে সেরেংগেটিতে। সিংহ-চিতাবাঘের চেয়ে ছোট, তবে ভয়ংকরত্বের দিক দিয়ে ওগুলোর চেয়ে কম নয়, বরং বেশি। নিজের ওজনের দশগুণ বড় জানোয়ারকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করে না।

চার নম্বর, হায়েনা। আফ্রিকার এমন কোনো জায়গা নেই, যেখানে দেখা যাবে না ওগুলোকে।

পাঁচ, নেকড়েবাঘের মতো একজাতের শেয়াল। একলা এলে ভয় নেই, কিন্তু দল বেঁধে যখন আসে, রীতিমতো ভয়ংকর।

আর ছয় নম্বর প্রাণীটি হলো সাপ, যাকে এড়িয়ে চলতে হয় এখানে। গোখরো, মামবা, পাইথন তিন ধরনেরই আছে। দিনে বেজায় গরমে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, শিকার ধরতে বেরোয় রাতের বেলা। যে কোনো সময় পায়ের নিচে পড়ে যেতে পারে। তাহলেই সর্বনাশ। প্রথম দুটো মারবে বিষ দিয়ে, আর তৃতীয়টা পেঁচিয়ে, শ্বাসরুদ্ধ করে। সাপ আরও আছে এখানে। এই যেমন সিংওলা ভাইপার। বালিতে শরীর ডুবিয়ে শুধু মুখটা বের করে পড়ে থাকে। মনে হয় আলসের ধাড়ি। কিন্তু লেজে পা পড়লেই বোঝা যায়, কি পরিমাণ ক্ষিপ্র। বিদ্যুতের মতো ছোবল হানে। মারাত্মক বিষাক্ত।

রাতের বেলা তৃণভোজী প্রাণীরাও কম ভয়ংকর হয়ে ওঠে না। সারাক্ষণই অস্থির হয়ে থাকে গণ্ডার। সামনে কাউকে দেখলেই গুঁতোতে আসে। মোষেরও প্রায় একই অবস্থা। আর বিশাল মদ্দা হাতি আসে নিঃশব্দে, টেরই পাওয়া যায় না। যখন পাওয়া যায়, তখন আর সময় থাকে না। পিঠের ওপর পা তুলে দেয়। দশ টনী শরীরের ভার দিয়ে চেপে চিড়ে চ্যাপ্টা বানিয়ে দেয় মানুষকে।

প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা তো আছেই, তার ওপর এতোগুলো ভয়াবহ জানোয়ারের কবল থেকে বেঁচে লোকালয়ে যেতে পারবে, এখন আর আশাটা করতে পারছে না মুসা। রাতের অন্ধকার মানুষের মনের জোর কেড়ে নেয়। তারও হয়েছে সেই অবস্থা। তবে থামলো না সে, কিংবা ফেরার কথা ভাবলো না। এগিয়েই চললো।

গায়ে কাঁটা দিলো কিশোরের। ভয়ে নয়, শীতে। পাশেই গা ঘেঁষে শুয়েছে রবিন। সে-ও কাঁপছে। নিজেদেরগুলো তো রয়েছেই, মুসার দেয়া বুশ-জ্যাকেটটাও গায়ের ওপর চাপালো, দু'জনেরই, ভাগাভাগি করে।

কোন একজন গীতিকার লিখেছিলেনঃ টিল দা স্যাণ্ডস অভ দা ডেজার্ট গ্রো কোল্ড। তাঁর ধারণা ছিলো, মরুভূমি কখনোই ঠাণ্ডা হয় না। ধরে এনে তাঁকে রাতের মরুভূমি দেখিয়ে দেয়া উচিত ছিলো, ভাবলো কিশোর। বিশেষ করে

সেরেংগেটি কিংবা সাহারা, প্রচণ্ড গ্রীষ্মে হলেও অসুবিধে নেই। সূর্য ডোবার খানিক পরেই উত্তাপ হারায় মরুভূমি, বালি তাপ ধরে রাখতে পারে না বেশিক্ষণ। তার ওপর রাতের হাওয়া বয়ে আসে সেরেংগেটির বেলায় কিলিমানজারো কিংবা মাউন্ট কেনিয়া, কিংবা মাউনটেইন অভ দা মুনের তুষারে ঢাকা চূড়া ছুঁয়ে, নিয়ে আসে কনকনে শীত। আর সাহারার বেলায় অ্যাটলাস পর্বত থেকে। উত্তাপ যা-ও বা কিছুটা থাকতো বালিতে, তা-ও আর রাখে না, ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায়। হীমশীতল করে দিয়ে যায় আবহাওয়া।

এখনই এতো ঠাণ্ডা, সারা রাত কাটাবে কি করে! ভাবতে লাগলো দু'জনে।

নতুন দিনের সূচনা হলো। কিন্তু বুঝতেই যেন পারছে না মুসা, এটা দিন। রাত কেটে গেছে নিরাপদেই। আড়ষ্ট, ভোঁতা হয়ে গেছে যেন মন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, অনিদ্রা, কোনো কিছুই যেন আর টের পাচ্ছে না এখন। কোনো অনুভূতি নেই শরীরের। মগজে একটা চিন্তাই গেঁথে রয়েছেঃ এগিয়ে যেতে হবে ওকে।

লাল টকটকে ক্লান্ত চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে মানুষের চিহ্ন। যেদিকেই চোখ যায়, দেখা যাচ্ছে, দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে মরুভূমি। বাড়িঘর তো দূরের কথা, একটা গাছ কিংবা ঝোপও চোখে পড়ছে না। পাশে পাশে চলা জানোয়ারগুলোর অবস্থাও তারই মতো হয়েছে। বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছে যেগুলো, চলার শক্তি হারাচ্ছে, সেগুলো আর্ত চিৎকার দিয়ে লুটিয়ে পড়ছে বালিতে। ওটাকে পাশ কাটাচ্ছে, কিংবা হয়তো মাড়িয়েই চলে যাচ্ছে পেছনেরগুলো।

ভোর আর দুপুরের মাঝামাঝি সময়টায় বাঁয়ের জমিতে একটা পরিবর্তন দেখা গেল। দ্রুত ছুটে গেল মুসা। তাড়াহুড়োয় আরেকটু হলেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলো খাতের মধ্যে। কয়েকশো ফুট গভীর একটা গিরিখাতের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

চোখ কচলালো মুসা। ভুল দেখছে না তো? আবার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে? না, সত্যিই মনে হয়! ওই তো, কয়েকটা তাঁবুর মতো! আর কিছু কালো কালো প্রাণী নড়াচড়া করছে, মানুষেরই মতো।

ক্লান্ত পেশিতে নতুন শক্তির জোয়ার এলো যেন তার। গিরিখাতের দেয়াল এখানে খাড়া নয়, ঢালু। তবু বেয়ে নামার ক্ষমতা নেই তার। শেষে বসেই পড়লো বালিময় ঢালের ওপরে, পিছলে নেমে যেতে শুরু করলো। শেষ একশো ফুট পড়লো গড়িয়ে।

বোধহয় বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলো। চোখ মেলতে চোখে পড়লো একজন মানুষকে। শাদা চুল। পরনে ময়লা ওভারঅল।

মাথা পরিষ্কার হয়ে এলো মুসার। এই মানুষটাকে চেনে সে। পত্রিকায় ছবি দেখেছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. উইলবার নরিংহ্যাম। আর এই গিরিখাতটাই নিশ্চয়

ওলডুভাই গর্জ। এই গিরিসঙ্কটেই প্রায় বিশ বছর ধরে খননকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ডক্টর আর তাঁর স্ত্রী। সব চেয়ে পুরনো মানুষের কঙ্কাল আবিষ্কার করে পৃথিবীবাসীকে রোমাঞ্চিত করেছেন।

ঠিক এইখানটাতেই প্রায় পঁচিশ বছর আগে খননকাজ চালিয়ে ছিলেন আরেক দম্পতি, ডক্টর লুই লিকি। বিশ লক্ষ বছরের পুরনো আদিম মানুষের ফসিল আবিষ্কার করেছিলেন তাঁরা। পত্রিকাতেই পড়েছে মুসা।

খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে ডক্টর নরিংহ্যামের সঙ্গে হাত মেলালো সে। 'আমি মুসা আমান। আপনাকে আমি চিনি। কিন্তু আমাকে চিনবেন না,' বেশ কুণ্ঠা নিয়েই বললো মুসা।

'আমান! মুসা আমান!' কি যেন মনে করার চেষ্টা করলেন ডক্টর। 'তুমিই সেই তিন কিশোরের একজন নও তো? সাভো থেকে কিছুদিন আগে পোচার তাড়িয়েছে যারা?'

'তিন গোয়েন্দার কথা বলছেন, স্যার?' তাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিদেরও কিছুটা সুখ্যাতি আছে ভেবে অবাকই হলো মুসা।

'হ্যাঁ, তিন গোয়েন্দা। এবারেও শুনেছি তোমাদের কথা। আবার এসেছো আফ্রিকায়, জন্তুজানোয়ার ধরতে। এসেই চিতামানবদের একটা দলকে পাকড়াও করেছো। তারপর সাভোর ভয়াবহ মানুষখেকো সিংহের পেছনে লেগেছো, পড়েছি পত্রিকায়। মানুষখেকোর ওপর চোখ রাখার জন্যে বেলুন ব্যবহার করছো।'

'হ্যাঁ, স্যার, ঠিকই শুনেছেন। তবে বেলুনটা আর নেই। আমরা ওটাতে থাকতেই নোঙরের দড়ি কেটে দেয়া হয়েছিলো। ভেসে গিয়েছিলাম আমরা। পড়েছি মরুভূমির ওপর। আমার দুই বন্ধু কিশোর আর রবিন এখন মরুভূমিতেই পড়ে আছে। কিশোরের পা বোধহয় ভেঙেই গেছে। আমি অনেক কষ্টে এখান পর্যন্ত এসেছি।'

'হুঁ, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। লাঞ্চে বসতে যাচ্ছিলাম আমরা। এসো। খাও আগে। তারপর তোমার বন্ধুদের আনতে যাবো।'

স্বপ্নের মধ্যেই যেন পেট পুরে খেলো মুসা, পান করলো, তারপর ল্যাণ্ড রোভারে চড়ে ডক্টর নরিংহ্যামের সঙ্গে চললো বন্ধুদের উদ্ধার করতে। জানোয়ার চলার পথ ধরে।

টিলাটার পাশেই পড়ে থাকতে দেখা গেল কিশোর আর রবিনকে। মুসা তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলো, মরে গেছে ভেবে। না, মরেনি।

ফুলে গেছে কিশোরের পা। রবিন এতো কাহিল, কথাই বলতে পারছে না। সাথে করে আরও লোক নিয়ে এসেছেন ডক্টর। কিশোরকে গাড়িতে তোলা হলো। রবিনকেও উঠতে সাহায্য করা হলো।

পানি আর খাবার খেয়ে অনেকটা চাঙা হলো দু'জনেই।

পা-টা পরীক্ষা করে ডক্টর বললেন, 'না, ভাঙেনি। মচকেছে শুধু। দু'একদিনেই ভালো হয়ে যাবে। তোমাদেরকে সেরোনিরা সাফারি ক্যাম্পে পৌঁছে দেবো। একটা ছোট প্লেন আছে ওদের। ভাড়া করে সাভোতে ফিরে যেতে পারবে।'

শুরুতে কয়েক মাইল জানোয়ার-চলা পথ ধরে চললো ল্যাণ্ডরোভার। তারপর মোড় নিলো উত্তর-পুবে। রাস্তা নেই। কম্পাস দেখে দেখে গাড়ি চালাচ্ছেন ডক্টর।

একসময় শেষ হয়ে এলো মরুভূমি। সামনেরটাকেও আরেক ধরনের মরুভূমি বলা চলে। মাটির বড় বড় ঢিবি, আর ফুটখানেক লম্বা রুক্ষ ধরনের ঘাস, ব্যস, আর কিছু নেই। এতো ঝাঁকুনি লাগতে লাগলো, এর চেয়ে মরুভূমিতে চলা অনেক ভালো ছিলো। অন্তত মসৃণ ছিলো জায়গাটা। প্রচণ্ড ব্যথা পাচ্ছে কিশোর। শেষে জ্ঞানই হারালো একবার, সেনোরিয়ায় পৌঁছার একটু আগে।

সেনোরিয়া কোনো শহরও নয়, গ্রামও নয়। ডজনখানেক গোল মাটির দেয়াল আর পাতার ছাউনি দেয়া কুঁড়ে নিয়ে একটা ক্যাম্প। চমৎকার একটা মরুদ্যানের মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে এই ক্যাম্প। মিষ্টি পানির একটা ঝর্না আছে, কিছু গাছপালা আছে, আর আছে প্রচুর সিংহ—পুরোপুরি ঘিরে রেখেছে যেন জায়গাটাকে।

ওয়ারডেনের সঙ্গে কথা বলে প্লেনটার ব্যবস্থা ডক্টরই করে দিলেন।

তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিমানে চড়ে বসলো তিন গোয়েন্দা।

সতেরো

সাভোতে ফিরে কিমবাকে সমস্ত ঘটনা জানালো ওরা। কিমবার কাছেও সংবাদ আছে, জন ককের খবর। বললো, 'কক আমাদেরকে দেখাতে চেয়েছে, কতোটা বড় সিংহ শিকারী সে। মানুষখেকোর খোঁজে খোঁজে ঝোপঝাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। গতকাল সূর্য ডোবার ঠিক পর পর ঝোপের ভেতরে নড়াচড়া চোখে পড়লো তার। সিংহ ভেবে গুলি করে বসলো। পড়ে গেল জানোয়ারটা। গিয়ে দেখে, সিংহ নয়, একটা গরুকে গুলি করে মেরেছে। লোকে দেখলে টিটকারি দেবে। তাড়াতাড়ি গর্ত খুঁড়ে ওটাকে মাটি চাপা দিলো সে।

'আজ সকালে গুলার এক লোক তার গরুটাকে বাড়ি ফিরতে না দেখে খুঁজতে বেরোলো। খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে সেই ঝোপের কাছে হাজির। গরুর খুরের দাগ দেখতে পেলো। শেষে ঝোপ থেকে মাটি খুঁড়ে বের করলো মরা গরুটাকে। ওটার কাঁধের নিচে গুলি লেগেছে।

'গুলার লোকেরা বোকা নয়। ওরা জানে একমাত্র তোমাদের আর ককের কাছে বন্দুক আছে। তোমরা নেই, বাকি রইলো কক। দল বেঁধে ক্যাম্পে গিয়ে চড়াও হলো ওরা। তাঁবু থেকে টেনে বের করলো তাকে। তারপর কিছু কিলঘুসি দিয়ে নাইরোবির ট্রেনে তুলে দিলো। শাসিয়ে দিয়েছে আর যদি এখানে তাকে দেখা যায়, হাত-পা নুলো করে দেবে।'

শয়তান লোকটার শয়তানী থেকে রেহাই পেয়ে খুশি হলো তিন গোয়েন্দা। ফিরে এলো তাদের ক্যাম্পে।

সিংহের বাচ্চাটা আগের মতোই বাঁধা রয়েছে তাঁবুতে। ওটার অবস্থা দেখেই বোঝা যায়, ওরা যাওয়ার পর আর কিছু পেটে পড়েনি। তাড়াতাড়ি খাওয়াতে বসলো মুসা।

মালিশ-টালিশ করে আর বেশ কিছু ট্যাবলেট গিলে কিশোরের পায়ের ব্যথা অনেক কমলো, ফোলাও।

আবার কিছু খেয়ে নিলো তিনজনে। তারপর গড়িয়ে পড়লো বিছানায়। সারারাত আর জাগার ইচ্ছে নেই। কিন্তু দুই কি তিন ঘন্টা বাদেই অদ্ভুত একটা শব্দ ঘুম ভাঙিয়ে দিলো ওদের। বেশি জোরালো নয়, তবে বেশ কাছেই মনে হলো। হায়েনার ডাক নয়, তার চেয়ে ভারি। গর্জন নয়, অনেকটা গোঙানির মতো। বিষণ্ন আর নিঃসঙ্গতায় ভরা যেন। তাঁবুর বাইরে হচ্ছে শব্দটা।

টর্চ জ্বাললো কিশোর। আজব আচরণ করছে সিংহের বাচ্চাটা। মিউ মিউ করে জবাব দিচ্ছে বাইরের ডাকের। শেকলে বাঁধা রয়েছে। ছোটাতে পারবে না। ছোটানোর চেষ্টাও করলো না ওটা। তাঁবুর কানার নিচ দিয়ে বাইরে চলে গেল। টান পড়লো শেকলে।

বাইরে খুব কাছেই, একেবারে তাঁবুর পাশে কয়েকবার ডাকলো সিংহটা। শেকলে ঢিল পড়ছে একবার, পরক্ষণে শক্ত হচ্ছে। এরকম চললো বারকয়েক।

আবার ডাকলো সিংহটা। জবাবে বাচ্চাটার মিউ মিউ।

অনেকক্ষণ ডেকেডুকে যেন হতাশ হয়েই ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগলো বাইরের ডাক। মিলিয়ে যেতে লাগলো দূর থেকে দূরে।

'কালো কেশর না তো!' ফিসফিসিয়ে বললো রবিন। 'হয়তো ওরই বাচ্চা। নিয়ে যেতে এসেছিলো। টেনেটুনে ছুটাতে না পেরে চলে যাচ্ছে। সিংহরা করে ওরকম...'

'এখন গেলে হয়তো ধরা যায়!' লাথি দিয়ে কম্বল সরাতে গিয়ে মনে পড়লো কিশোরের, এই পা-টাতেই ব্যথা। আছে এখনও, তবে কমেছে।

'আমরা যখন ছিলাম না,' আবার বললো রবিন, 'তখনও নিশ্চয় এসেছে কালো কেশর। বাচ্চাটাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। শেকলও ছিঁড়তে পারেনি, নিয়েও যেতে পারেনি।'

'কেন, ছিঁড়তে পারলো না কেন?' মুসার প্রশ্ন। 'সিংহের গায়ে জোর নেই?'

'আছে, তবে বাচ্চাটা ব্যথা পাবে ভেবে সে-চেষ্টা করেনি হয়তো। আরও একটা ব্যাপার, মাঝখান থেকে দড়ি কিংবা শেকল ছেঁড়ার চেষ্টা করে না সিংহ। নিশ্চয় বাচ্চার ঘাড় কামড়ে ধরে টানাটানি করেছে। ওভাবেই নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তো...'

তাড়া দিলো কিশোর, 'চল, আর দেরি করা যায় না।'

রিভলভার আর টর্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়লো ওরা। একজোড়া ক্রাচ জোগাড় করে দিয়েছে কিমবা, তাতে ভর দিয়ে চলছে কিশোর। এখনও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে সিংহটার ডাক। সেই শব্দ শুনে শুনে অনুসরণ করলো তিন গোয়েন্দা। তারপর, একটা ঝোপের ডাল সরাতেই আলো পড়লো একেবারে সিংহের মুখে, জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ। বিশাল জানোয়ার। কুচকুচে কালো কেশর।

সহজ নিশানা। রিভলভার তুললো কিশোর আর মুসা। টর্চ ধরে রেখেছে রবিন। ওরা ধরেই নিয়েছে এখুনি গর্জে উঠে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে আসবে সিংহটা। কিন্তু ওরকম কিছুই করলো না ওটা। মৃদু স্বরে গুঙিয়ে চলেছে, যেন মনের দুঃখে কাঁদছে।

বুঝতে অসুবিধে হলো না ওদের। সিংহের স্বভাব ওদের অনেকখানিই জানা। সঙ্গিনী আর বাচ্চার জন্যে বিলাপ করছে কালো কেশর, কোনো সন্দেহ নেই। অন্যান্য জানোয়ারের মতো বছর বছর স্ত্রী বদল করে না সিংহ। একটাকেই বেছে নেয়। মৃত্যু না হলে সেটাকে আর ছাড়ে না। আর বেড়াল গোষ্ঠির অন্যান্য বাবার মতোও নয় এরা। নিজের বাচ্চাকে খেয়ে ফেলা তো দূরের কথা, এড়িয়েও চলে না। রীতিমতো যত্ন নেয় স্নেহশীল পিতার মতো।

কালো কেশরের এখনকার অবস্থা দেখে দুঃখিত না হয়ে উপায় নেই। খুব কষ্ট লাগলো তিন গোয়েন্দার। ওরাই খুন করেছে তার সঙ্গিনীকে, বাচ্চা কেড়ে নিয়েছে। সিংহটার বিষণ্ন চোখের দিকে তাকিয়ে কিছুতেই ট্রিগার টানতে পারলো না কিশোর আর মুসা। তবে একথাও ভুললো না কালো কেশর মানুষখেকো। এটাকে মারার দায়িত্ব নিয়েছে ওরা। ছেড়ে দিলে মানুষ মারতেই থাকবে এটা।

রিভলভার নামিয়ে নিলো মুসা, 'আমি পারবো না।'

'কিন্তু পারতেই হবে,' বললো বটে কিশোর, কিন্তু সে-ও গুলি করতে পারছে না।

'পারবো না।'

'তাহলে কি করা যায়?'

'জ্যান্ত ধরবো,' রবিন পরামর্শ দিলো।

কিশোরও রিভলভার নামিয়ে নিলো। 'কি করে? এতোবড় একটা মানুষ খেকোকে কি করে জ্যান্ত ধরবো আমরা?'

'জানি না। তবে উপায় নিশ্চয় আছে।'

সিংহটাকে মারলো না ওরা। ওটাও ওদেরকে কিছু করলো না। ঝোপের মধ্যে শুয়ে শুয়ে কাতরাতে লাগলো।

মানুষখেকো মারার সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিয়ে ফিরে চললো তিন গোয়েন্দা। আলোচনা করতে করতে, কিভাবে সিংহটাকে ধরা যায়।

'আমাদের ওপর ঝাঁপ দিলো না কেন?' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো মুসা।

'ওরু মন জুড়ে রয়েছে এখন অন্য কিছু, খাওয়া নয়। তার সঙ্গিনী আর বাচ্চা।' কিশোর বললো।

'আশ্চর্য! কল্পনাই করিনি কোনোদিন, সিংহেরা এতো সেন্টিমেন্টাল! এরকম একটা কাণ্ড করলো!'

'নতুন কোনো ব্যাপার নয়,' রবিন বললো। 'সঙ্গিনীর জন্যে কাঁদতে কাঁদতে জীবন দিয়েছে সিংহ, না খেয়ে থেকে মারা গেছে, এরকম কথা বলেছে অনেক বিখ্যাত সিংহ শিকারী। নিজের চোখেও নাকি এরকম ঘটনা ঘটতে দেখেছে কেউ কেউ।'

'হুঁ।...' পেছনে মৃদু একটা শব্দ শুনে ঝট করে পেছনে ফিরে তাকালো মুসা। 'খাইছে! কালো কেশর আমাদের পিছু নিয়েছে!'

'মেরেই ফেলা দরকার...,' বলতে বলতে থেমে গেল কিশোর। 'দাঁড়াও, বুদ্ধি একটা পেয়েছি! আমি একাই ধরতে পারবো ওটাকে!'

'একা!' একসঙ্গে বলে উঠলো রবিন আর মুসা।

'হ্যাঁ।'

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা।

'বললাম তো, ধরবো। এসো।'

তাঁবুতে এসে ঢুকলো তিনজনে। মুসাকে দেখেই মিউ মিউ শুরু করলো বাচ্চাটা, বোধহয় আবার খিদে পেয়েছে। দুধটা তৈরি করে তাঁবুর দরজার কাছে নিয়ে গেল কিশোর। বাচ্চাটাকে ডাকলো, এসে খাওয়ার জন্যে। টর্চ ধরে রইলো রবিন।

সবে এসে খেতে শুরু করেছে বাচ্চাটা, এই সময় দরজায় দেখা দিলো কালো কেশর। গম্ভীর একটা হাঁক ছেড়ে যেন সরে যেতে বললো দু'পেয়েদেরকে। তারপর এগিয়ে এসে বাচ্চাটার ঘাড় কামড়ে ধরে নিয়ে সোজা বেরিয়ে গেল, কারো দিকে না তাকিয়ে।

'গেল!' হাত নাড়লো রবিন। 'মানুষখেকোও গেল, তার বাচ্চাও! ধরা আর হলো না!'

একটুও হতাশ মনে হলো না কিশোরকে। শান্তকণ্ঠে বললো, 'আবার ফিরে আসবে। আসতেই হবে।'

'মাথাটা তোমার সত্যিই গেছে,' মুসা বললো। 'বেলুনে চড়েই নিশ্চয় এই অবস্থা হয়েছে।'

হাসলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'না, হয়নি। আমি বলছি আসবে। পেটে খিদে নিয়ে গেছে বাচ্চাটা। মিউ মিউ করতেই থাকবে। গোশত খেতে পারবে না, সময় হয়নি এখনও। দুধই লাগবে তার। দেবে কোত্থেকে ওর বাপ?'

আঠারো

আবার ঘুমিয়ে পড়লো কিশোর। রবিনও। মুসা জেগে রয়েছে। কান পেতে শুনছে আফ্রিকার রাতের শব্দ। এই শব্দ সব সময়ই অবাক করে তাকে। শিকারে বেরোয় নানারকম নিশাচর জানোয়ার, তাদের হাঁকডাকে সরব হয়ে থাকে বনভূমি, প্রান্তর। কখনও ঘুমায় না যেন আফ্রিকা, দিনেও না, রাতেও না, সব সময় জেগে থাকে।

প্রথম একটা ঘন্টা কিছুই ঘটলো না। দ্বিতীয় ঘন্টার অর্ধেক যেতে না যেতেই ভারি নিঃশ্বাসের শব্দ কানে এলো তার। খুব কাছে। তারপর চুক চুক আওয়াজ।

টর্চ জ্বাললো সে। দেখলো, দুধ খাচ্ছে বাচ্চাটা। কাছেই বসে রয়েছে কালো কেশর, পাহারা দিচ্ছে তার বাচ্চাকে কেউ যাতে বিরক্ত করতে না পারে।

'আলো নেভাও,' অন্য বিছানা থেকে নিচু গলায় বললো কিশোর।

ছোট্ট একটা ধমক দিলো কালো কেশর। যেন বলতে চাইলো, 'এই চুপ, দেখছো না আমার ছেলে খেতে বসেছে! বিরক্ত করবে না!'

আলো নিভিয়ে দিলো মুসা।

অন্ধকারেই হাসলো কিশোর। যাক, তার বুদ্ধি কাজে লাগতে চলেছে।

দুধ খাওয়া শেষ করে বার দুই মিউ মিউ করলো বাচ্চাটা। চাপা একটা গর্জন করলো কালো কেশর। তারপর বাচ্চার ঘাড় কামড়ে ধরে আবার বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

পরদিন সকালে নাস্তা খেতে বসে রবিন বললো, 'সিংহটা আর আসবে না।'

'আসতেই হবে তাকে,' জোর দিয়ে বললো কিশোর। 'বাচ্চাটা যতোক্ষণ দুধ না ছাড়বে, মানুষের ওপর নির্ভর না করে আর তার উপায় নেই। মুসা, দুপুরের জন্যে দুধ রেডি রেখো। তাঁবুতে রেখে বেরিয়ে যাবো আমরা।'

নাস্তা সেরে স্টেশনে চললো তিন গোয়েন্দা। ওখান থেকে কিতানি সাফারি লজে ফোন করলো কিশোর, ওয়ারডেন টমসনকে। বললো, 'একটা সিংহের খাঁচা পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। বড় আর শক্ত খাঁচা, নতুন দেখে আনতে বলবেন খামবুকে। সিংহটা অনেক বড়।'

'তোমার লোকজনকে পাঠাবো?'

'দরকার নেই। শুধু খামবুকে আসতে বলবেন। খাঁচাটা পেলেই চলবে আমার।'

ক্যাম্পের কাছে আর গেল না ওরা। দুপুর নাগাদ পাওয়ার ওয়াগনে করে মস্ত একটা খাঁচা নিয়ে পৌছলো খামবু।

বিকেলের দিকে ক্যাম্পে চললো ওরা। তাঁবুতে ঢুকে দেখা গেল, দুধের পাত্রটা খালি। হেসে বললো কিশোর, 'নিশ্চয় কালো কেশর বাচ্চাকে খাইয়ে নিয়ে গেছে। রাতের জন্যে দুধ রেডি রাখবে,' মুসাকে নির্দেশ দিলো সে।

সন্ধ্যাবেলা ফাঁদ পাতলো কিশোর। খাঁচাটা পাতা হলো ওদের তাঁবুর কাছে। অনেক ভেতরে রাখা হলো দুধের পাত্র। খাঁচার দরজায় একটা দড়ি বাঁধলো কিশোর। টেনে দরজাটা ওপরে তুলে দড়িটা নিয়ে এলো তাঁবুর ভেতর। মাথাটা বাঁধলো চারপায়ার কিনারায়। তারপর সকাল সকাল খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। খামবু গেল তার এক দেশোয়ালী ভাইয়ের তাঁবুতে ঘুমাতে।

'আসবে তো?' আরেকবার সন্দেহ প্রকাশ করলো মুসা।

'আসতেই হবে। সারা দিনে তিন-চারবার দুধ খাওয়া লাগে বাচ্চাটার,' জবাব দিলো কিশোর।

বিছানায় শুয়ে জেগে রয়েছে তিনজনেই। কালো কেশরের আসার অপেক্ষা করছে।

ন'টা নাগাদ এলো সে। বাচ্চাটার মিউ মিউ শুনেই বোঝা গেল। কানা আটকে রেখেছে কিশোর। তাঁবুর চারপাশে ঘুরতে লাগলো কালো কেশর, ঢোকার জায়গা খুঁজছে। বোঝা গেল সেটাও। বার দুই চক্কর দিয়েই বোধহয় দুধের গন্ধ পেলো, এগোলো খাঁচার দিকে। তাঁবুর ভেতরে থেকে আন্দাজ করলো তিন গোয়েন্দা।

উঠে পড়লো কিশোর। পা টিপে টিপে এগোলো খাঁচাটা যেদিকটায় রেখেছে সেদিকে। দরজার দিকটায় রেখেছে ওটা। দরজাও আটকে রেখেছে। একটা ফিতের বাঁধন খুলে সেই ফাঁক দিয়ে তাকালো। ক্যাম্পের আগুনের আলোয় বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সিংহটাকে।

বাচ্চাটাকে খাঁচার দরজার কাছে নামিয়ে দিয়ে নাক দিয়ে ঠেলছে কালো কেশর। একলা যেতে চাইছে না বাচ্চাটা। ঢোকে, আবার বেরিয়ে যায়, ঢোকে, আবার বেরিয়ে যায়। শেষে নাক দিয়ে গুঁতো মারতে লাগলো বাবাকে, ওকেও ঢুকতে বলছে।

তাঁবুর দিকে ফিরে তাকালো কালো কেশর। তাকিয়ে রইলো দীর্ঘ একটা মুহূর্ত, কোনো ফাঁদ আছে কিনা বুঝতে চাইছে হয়তো। তারপর খাঁচাটাকে ঘিরে চক্কর দিলো একবার, কয়েকটা শিক শুঁকে দেখলো। ফিরে এসে দাঁড়ালো দরজার কাছে। সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রয়েছে ওটার দিকে।

অস্থির হয়ে উঠেছে বাচ্চাটা। মিউ মিউ করে বাবাকে ঠেলতে লাগলো আবার। আরেকবার তাঁবুর দিকে তাকিয়ে আর দ্বিধা করলো না কালো কেশর। ঢুকে পড়লো খাঁচায়। বাচ্চাটা গিয়ে দুধ খেতে লাগলো চুক চুক করে। কাছে বসে দেখতে লাগলো বাবা।

এই সুযোগ। দড়িটা টেনে ধরে রাখতে বললো মুসাকে কিশোর। বাঁধন খুললো। তারপর আচমকা দড়ি ছেড়ে দিতে বললো।

দড়ি ছাড়তেই ঝপাৎ করে পড়ে গেল খাঁচার দরজা, কালো কেশরের বেরোনোর পথ রুদ্ধ করে দিলো।

বিকট গর্জন করে উঠলো কালো কেশর। ভীষণ রাগে জোরে জোরে থাবা মারতে লাগলো খাঁচার দরজায়। কিন্তু সব বৃথা। আর বেরোতে পারবে না সে।

এরকম করতে থাকলে নিজেরই ক্ষতি করে ফেলবে পশুরাজ। এতো সুন্দর একটা জীবকে ক্ষত করে মূল্য কমাতে চাইলো না কিশোর। তাড়াতাড়ি কিউরেয়ারগান নিয়ে বেরোলো। ওষুধ ভর্তি ডার্ট ছুঁড়ে মেরে বেহুঁশ করে দিলো সিংহটাকে।

বাবার হঠাৎ এই রেগে যাওয়া দেখে অবাক হয়েছিলো বাচ্চাটা। বাবা চুপ করে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে আদর করে তার গা একবার চেটে দিয়ে আবার গিয়ে দুধ খাওয়ায় মন দিলো।

তাঁবু থেকে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে শ্রমিকেরা। বিশাল সিংহটাকে খাঁচার ভেতরে দেখে রীতিমতো অবাক হয়েছে। খাঁচার চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

রাতেই কিতানি সাফারি লজে ফোন করে সিংহটাকে ধরার খবর জানালো টমসনকে কিশোর।

ভোর বেলা গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হলেন ওয়ারডেন। খাঁচায় বন্দি সিংহটাকে দেখে বিস্মিত হলেন। 'করলে কি করে কাজটা!'

সব কথা খুলে বললো কিশোর।

হাসতে হাসতে বললেন টমসন, 'তোমরা এক একটা জিনিয়াস, কিশোর পাশা। আই কংগ্রাচুলেট ইউ, মাই বয়।'

উনিশ

আরও একজন অতিথি এসে হাজির হলো সকাল বেলা। রাজা মাকুমা।

নাস্তা করতে বসেছিলো তিন গোয়েন্দা। দৈত্যাকার কালো মানুষটাকে এসময়ে দেখে অবাকই হলো। টেবিলের কাছাকাছি এসে বললো, 'আসবো?'

মাকুমার এই ব্যবহারে আরও অবাক হলো তিন গোয়েন্দা।

কিশোর বললো, 'আসুন, আসুন। বসুন। নাস্তা খান।'

'নাস্তা খেয়েই এসেছি,' হেসে বললো মাকুমা। 'তবে কফি খেতে পারি।' একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো সে। 'ইয়ে, মানে, তোমাদেরকে কংগ্রাচুলেশন জানাতে এলাম। মানুষ-খেকোটাকে ধরার জন্যে।'

ফস করে বলে ফেললো মুসা, 'কিন্তু আপনি তো চাননি, আমরা সফল হই।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করলো মাকুমা। 'সত্যিই বলি, আমি চেয়েছিলাম তোমরা দুর্ঘটনায় মারা যাও।'

'আরেকটু হলেই আশা পূরণ হয়ে যেতো আপনার,' কিশোর বললো। 'আমাদের বেলুনের দড়ি কেটে দিয়েছিলো কেউ।'

'কে হতে পারে, বল তো?'

'জন কক,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো মুসা।

'না,' হাসিটা চওড়া হলো মাকুমার।

'আপনি!' ভুরু কোঁচকালো কিশোর।

'হ্যাঁ।'

'আপনি কেটেছেন!' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন রবিন। 'একাজ করলেন কেন? কি ক্ষতি করেছি আমরা আপনার?'

'পুরো ব্যাপারটাই ছিলো একটা ভুল বোঝাবুঝি,' হাসি মিলিয়ে গেছে মাকুমার মুখ থেকে। 'মাউ মাউ বিদ্রোহের কথা নিশ্চয় শুনেছো তোমরা। শ্বেতাঙ্গদেরকে তখন খুন করতে আরম্ভ করেছে কিকুইউরা। অনেক ইংরেজকে তাদের বউ-বাচ্চাসহ অত্যাচার করে মেরেছে ওরা। রেগে গেল শ্বেতাঙ্গরা। পাল্টা আঘাত হানলো। অনেক আফ্রিকান নিহত হলো ওদের হাতে। আমার স্ত্রী আর বাচ্চাদেরকেও খুন করলো। আমার ধারণা ছিলো, শ্বেতাঙ্গরাই মেরেছে। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কিছু বেঈমান নিগ্রো আর অন্য দেশী লোক। তখন থেকেই ওই ধরনের লোকের ওপর প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মালো আমার। তোমাদের ওপরও রাগটা সে-জন্যেই ছিলো। একা তোমাদেরকে সিংহের কাছে পাঠাতে বাধ্য করলাম, যাতে তোমরা মারা পড়ো। যখন বেঁচে গেলে, গিয়ে কেটে দিলাম বেলুনের দড়ি। ভয়ানক অন্যায় কাজ করেছি।'

রাগ করলো না কিশোর। বরং সমবেদনা জাগছে লোকটার জন্যে। 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু পরে মত বদলালেন কেন? এখন তো দেখে মনে হচ্ছে না আমাদের ওপর রাগটা আছে আর আপনার।'

'নেই। ভুল করেছি আমি। জানতে পারলাম মাত্র গতকাল। শ্বেতাঙ্গরা খুন করেনি আমার পরিবারকে। মাউ মাউরাই করেছে। ওদের দলের একজন অনেক দিন পর ধরা পড়েছে পরশুদিন। পুলিশের কাছে সব কথা বলে দিয়েছে সে। আমার পরিবারকে যারা খুন করেছিলো, সে-ও তাদের একজন,' লোকটার কথা মনে করেই যেন জ্বলে উঠলো মাকুমার চোখ। চুপ করে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো নিজের হাতের দিকে। কফির কাপে চুমুক দিলো বার দুই। তারপর আবার মুখ তুললো। 'কেন করেছে জানো? রাগ ছিলো আমার ওপর। মাউ মাউদের দলে যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলো ওরা আমাকে। রাজি হইনি। সে-জন্যেই শোধটা নিয়েছে আমার বউ-বাচ্চার ওপর। আমাকে জানাতে তখন সাহস করেনি। আমি ওদের শত্রু হয়ে গেলে ভীষণ ক্ষতি করে দিতে পারতাম, সেই ভয়ে। বরং কায়দা করে আমার রাগ শ্বেতাঙ্গদের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলো। ইস্, কি ভুলটাই না করেছি! না জেনে কি অন্যায়টাই না করেছি, কতো নিরীহ মানুষকে মেরেছি! তোমাদের ওপরও ক্ষমার অযোগ্য অন্যায় করেছি আমি।'

টেবিলে রাখা মাকুমার হাতের ওপর হাত রাখলো কিশোর। 'এখন তো ভুল বুঝতে পেরেছেন। আমরা কিছু মনে রাখছি না। একা সিংহের মুখে ঠেলে দিয়ে আমাদের উপকারই করেছেন বরং আপনি। সাহস বাড়িয়েছেন। বড় শিকারী হওয়ার হাতেখড়ি দিয়েছেন।'

'আর বেলুনের দড়ি কেটে দিয়ে তো,' যোগ করলো মুসা, 'সাংঘাতিক এক অ্যাডভেঞ্চারের সুযোগ করে দিলেন। কি করে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা যায় শিখলাম। মস্ত উপকার করেছেন!'

'হ্যাঁ,' হাসতে হাসতে বললো রবিন। 'জুলভার্নের ফাইভ উইকস ইন আ বেলুন পড়েই বেলুনে চড়ে আকাশ ভ্রমণের শখ জেগেছিলো। আপনি আমাদের সে আশা পূর্ণ করেছেন। যদিও কাজটা ঠিক করেননি, তবু অনেক ধন্যবাদ।'

'সত্যি তোমরা ভালো ছেলে! তোমাদের তুলনা হয় না!' আবেগে চোখে পানি এসে গেল মাকুমার। একটা মুহূর্ত চুপ থেকে বললো, 'বলো, তোমাদের জন্যে কি করতে পারি? কিছু একটা করতে না পারলে শান্তি পাবো না আমি।'.

'একটা কাজই করতে পারেন,' কিশোর বললো। 'তাহলে সব চাইতে খুশি হবো আমরা। বংগার ইস্কুল চালানোয় যদি সাহায্য করেন।'

'করবো,' কথা দিলো মাকুমা।

কফি শেষ করে উঠতে গেল সে। হাত তুললো কিশোর, 'একটু বসুন। আর একটা প্রশ্ন। শ্বেতাঙ্গ আর বিদেশীদের ওপর আপনার রাগ ছিলো। জন ককও তো শ্বেতাঙ্গ। তাকে কিছু বলেন না কেন?'

'ওটাকে আর কি বলবো? মেরুদণ্ডহীন একটা লোক। পোকামাকড় মারতে কখনোই ভালো লাগে না আমার।'

'হুঁ,' বুঝলাম,' আনমনে মাথা দোলালো কিশোর।

'আজ তাহলে উঠি।' হাসলো মাকুমা। 'থ্যাংক ইউ ফর দা কফি।'

সেইদিনই সাভোর মানুষখেকোর অঞ্চল ছেড়ে কিতানি সাফারি লজে চলে এলো তিন গোয়েন্দা।

একজন মানুষকে ওদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন টমসন। তিনি ডক্টর হ্যারিসন ফোর্ড, ব্রংক্স চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর।

'জন্তুজানোয়ারের ওপর গবেষণা চালাতে এসেছেন ডক্টর হ্যারিসন,' ওয়ারডেন জানালেন। 'কিছু দিন থাকবেন কিতানিতে। কালো কেশর আর তার বাচ্চাটার কথা শুনে খুব আগ্রহী হয়েছেন।'

তিন গোয়েন্দার সাথে হাত মিলিয়ে কিশোরের দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, 'তাহলে তুমিই সেই ইয়াং ম্যান, শুধু বুদ্ধির জোরে এতো বড় একটা মানুষখেকো সিংহকে খাঁচায় আটকে ফেলেছো। তোমাকে আমার অ্যাসিসট্যান্ট

করতে পারলে খুব খুশি হতাম।'

'আমিও আপনার সঙ্গে কাজ করতে পারলে খুশি হতাম, স্যার,' সৌজন্য দেখিয়ে বললো কিশোর। 'কিন্তু আপাতত তো পারছি না।'

'পারবে না, জানি আমি, তবু বললাম। যাকগে, আসল কথায় আসি। কালো কেশরকে বাচ্চাসহ কিনতে চাই আমি। সাধারণ সিংহ হলে পাঁচের বেশি হতো না, কিন্তু এ দুটোর জন্যে পনেরো হাজার ডলার দিতে রাজি আছি আমি।'

'ভালো দাম।' মুসা আর রবিনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো কিশোর, 'তোমাদের কি মনে হয়?'

'ভালো,' একসঙ্গে জবাব দিলো মুসা আর রবিন।

'আমরা রাজি,' কিশোর বললো। 'আচ্ছা, একটা কথা, কালো কেশর আর তার বাচ্চাকে একসাথে রাখবেন তো? বাচ্চাটাকে না দেখলে খুব কষ্ট পাবে সিংহটা।'

'অবশ্যই রাখবো,' জোর দিয়ে বললেন ডক্টর। 'জন্তুজানোয়ার নিয়ে গবেষণা করি, সেটা কি আমি জানি না নাকি? বাবা আর বাচ্চা একসাথে একই খাঁচায় থাকবে, চিড়িয়াখানায় সেটাই তো হবে মূল আকর্ষণ। ওপরে লিখে রাখা হবে, কিভাবে ধরা হয়েছে ওদের। সিংহটা যে মানুষখেকো, সেকথাও বড় বড় করে লিখে রাখা হবে। এক কাজ করো না, তোমরাও গিয়ে দাঁড়াও খাঁচার সামনে, প্লীজ। একটা ছবি তুলবো। ছবিটা এনলার্জ করে খাঁচার পাশে ঝুলিয়ে রাখলে সেটাও হবে আরেকটা বড় আকর্ষণ।'

'সরি, স্যার, একাজটা করতে পারবো না,' বিনীত কণ্ঠে বললো কিশোর।

'কেন?' কিছুটা অবাকই হলেন ডক্টর। 'ও, বুঝেছি। ঠিক আছে, তোমাদের পোজ দেয়ার জন্যে দেবো আরেক হাজার ডলার।'

বুড়ো পাকা ব্যবসায়ী, ধড়িবাজ লোক, ভাবলো কিশোর। হেসে বললো, 'না, সেজন্যে না, স্যার। আমরা গোয়েন্দা। প্রতিদিন হাজার হাজার লোক এসে আমাদের ছবি দেখবে, আমাদেরকে চিনে রাখবে, তাতে আমাদের কাজের অসুবিধে হবে। আশা করি বুঝতে পারছেন।'

ওদের নতুন আরেকটা পরিচয় জেনে আরেকবার বিস্মিত হবার পালা ডক্টরের। এতোক্ষণ ধরে জেনে এসেছিলেন ওরা অ্যানিমেল ক্যাচার, জন্তুজানোয়ার ধরে ব্যবসা করে। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'পারছি।'

ছবি তোলার জন্যে আর ওদেরকে চাপাচাপি করলেন না তিনি।

সেদিন বিকেলে ডাকপিয়ন এসে হাজির হলো কিতানি লজে। একটু পরেই কিশোরের ডাক পড়লো ওয়ারডেনের অফিসে। তার হাতে একটা টেলিগ্রাম ধরিয়ে দিলেন টমসন।

পড়লো কিশোর। তার চাচা লিখেছেনঃ

কিশোর, তোমার চাচীর শরীর খুব খারাপ। এখন হাসপাতালে। তোমার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। জলদি চলে এসো।

রাশেদ পাশা।

কেবিনে ফিরতে জিজ্ঞেস করলো মুসা, 'কি ব্যাপার, কিশোর? মুখচোখ শুকনো কেন?'

নীরবে টেলিগ্রামটা বাড়িয়ে দিলো কিশোর।

মুসা আর রবিন দু'জনেই পড়লো।

রবিন বললো, 'তাহলে তো কালই রওনা হতে হয়।'

'হ্যাঁ,' বললো মুসা।

'চন্দ্রপাহাড়ে যাওয়া আর হলো না এবার,' কিশোর বললো।

'সুযোগ কি আর শেষ হয়ে গেছে?' অনেকটা সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতেই বললো মুসা। 'আরও কতো আসবো আফ্রিকায়। শ্বেত হস্তীর খোঁজ বের না করে ছাড়বো না আমি।'

'যদি থেকে থাকে,' রবিন বললো।

'থাকলে না ধরে ছাড়বো না,' দৃঢ়কণ্ঠে যেন আগাম ঘোষণা দিয়ে রাখলো কিশোর।

-ঃ শেষ ঃ-